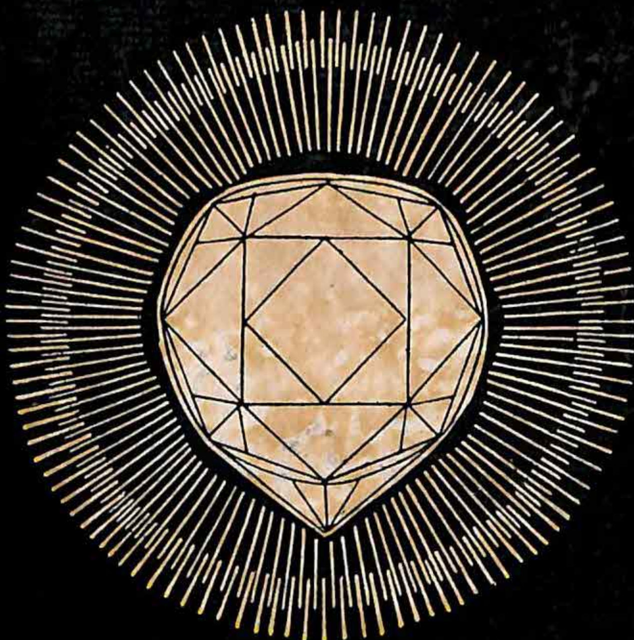
এই বিজ্ঞান



সাধন দাশগুপ্ত

এই বিজ্ঞান

সাধন দাশগুপ্ত

অমর ভারতী
৮/সি ট্যামার লেন কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ১৯৮৬

এই বিজ্ঞান
লেখক : সাধন দাশগুপ্ত

AI BIJNAN
—In Search of the Identity of Science
By SADHAN DASGUPTA

Frice Rupees Eighteen only

প্রকাশক : অধীর পাল
অমর ভারতী
৮ সি ট্যামার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ : মদন সরকার

মূল্য : ১৮·০০

মুদ্রাকর : প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

নিজের দেখা

এক

বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটি যে কি—এই নিয়ে যুগে যুগে তর্ক চলেছে। আমাদের শাস্ত্রে প্রথমেই বিজ্ঞানকে বলা হলো, বিশেষ জ্ঞান (শৌর্য বিভবার্য গুণৈঃ সমেতম্)। এরই রেশ ধরে কেউ বললেন, এটি বিষয়কার জ্ঞান যা চতুর্দশ বিদ্যাকে ধরে রেখেছে (চতুর্দশানাং বিদ্যানাং ধারণং হি যথার্থতঃ)। 'বি' উপসর্গের অন্য রূপকে মেনে অন্য কেউ বললেন, এটি বিরূপ জ্ঞান অথবা বিবিধ জ্ঞান। এই শব্দটি যখন ভর্তৃহরি এবং পাণিনি—ব্যাকরণ তত্ত্ব ও ভাষাবিদদের হাত এড়িয়ে সাহিত্য তাত্ত্বিকদের কাছে এল তখন তার অন্য ব্যাখ্যা দেখা যায়। শ্রীধর বললেন, এটি অনুভূতি ; নীলকণ্ঠ জানালেন, এ হলো আনন্দ ব্রহ্ম ; আর শংকরের কাছে বিজ্ঞান—বিশেষ আত্মানুভূতি। অর্থাৎ বিজ্ঞান যাকে আমরা সায়েন্সের পরিভাষা-শব্দ বলে ধরেছি, তা আনন্দ আর আনন্দানুভূতিকে ঘিরে তৈরি হয়েছিল। 'পদার্থ বিদ্যা বিষয়ক শাস্ত্র' বলতে বিজ্ঞানকে জানালেও ঐতিহ্যের ধারণা টেনে তাকে শাস্ত্রের শুষ্কতার মোড়কে ভরে রাখা যায় না।

অন্যদিকে Science শব্দটি লাতিন Scientia শব্দ থেকে তৈরি, যেখানে মূল শব্দের অর্থ হলো, যেখানে জ্ঞানের উপস্থিতি। পরে শব্দার্থের বিস্তৃতি ঘটিয়ে জানানো হলো, বিজ্ঞান হলো অজ্ঞানতার প্রতিরোধে জ্ঞান সংগ্রহ যা অভিজ্ঞতায় বা পাঠে পাওয়া যায়। আরো পরে বলা হলো, বিজ্ঞান হলো সুষম-সুঠাম প্রণালীতে জ্ঞান চর্চা,—যেখানে থাকে পারম্পর্যবোধ, থাকে ক্রম। এই সায়েন্স শব্দ পরে যে অর্থ পায় তা হলো সাধারণ সত্য ও নিয়মকে পরীক্ষার পথে প্রতিষ্ঠিত করে যে জ্ঞান—তাই বিজ্ঞান।…পাশ্চাত্যে Science শব্দটি কেজো শব্দে রূপান্তরিত হলেও, আমাদের নিজস্ব শব্দ বিজ্ঞান অনুভূতি নিয়ে গড়ে ওঠে বলে একে মনের কাছাকাছি ভাবা যেতে পারে।

এ সবই অর্থের ইতিহাস। বিজ্ঞানের ইতিহাস খোঁজার পথে সামান্য অংশটুকু বাদ দেওয়া চলে না ; কারণ মানুষের চিন্তার বিবর্তন ধারাটিও বিজ্ঞানের চলার পথে হাজির থাকে। অতীতে মানুষ কি ভাবে চিন্তা করে গেছে সেই বিচিত্র পরিবর্তনশীল স্রোতটিকে চিনতে চেয়েই বিজ্ঞানের অগ্রগতি। প্রচণ্ড যুক্তিবাদের মধ্যে কিছুটা

বিস্ময়-অনুভূতি ধরা না পড়লে এই অগ্রগতি যে মসৃণ হতে পারে না সেই সত্য বার্তাও রাসেল জানালেন। রাসেলের কথায়, a purely rational being is an abstraction—সম্পূর্ণ যুক্তিবোধে গড়া প্রাণী একটি অবাস্তব অস্তিত্ব। অনুভূতির আবির্ভাবটিকে বিজ্ঞানে রাসেল চাইলেন। এবং আশ্চর্য, এই অনুভূতির স্পর্শ ধীরে ধীরে নব বিজ্ঞানের শরীরে লাগে। আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়াণ্টাম গতিবিদ্যায় যান্ত্রিকতার মুক্তি ঘটে চলে! ধরা দেয়, আকস্মিকতা, অনির্দেশনা এবং উপলব্ধি। এই মুক্তি চিন্তার রাজ্যে ;—বোধিমননের মুকুরেও ঘটে চলে। রবীন্দ্রনাথ Religion of Man গ্রন্থে যাকে বললেন Surplus of man বা মানুষের উদ্বৃত্ত অংশ ; সেই মানবিক কল্যাণবোধ আর নীতি হলো আধুনিক বিজ্ঞানের অনুভূতির স্পন্দন। এই বিজ্ঞান মানুষকে জানায় তার সীমা। মানুষের তুচ্ছতা যত প্রকাশ পায়, তত তার জানার আকাঙ্ক্ষাটিও বেড়ে ওঠে। শূন্যতা থেকে সম্ভাব্য রূপান্তর বা সৃষ্টি যে ঘটে থাকে—বিজ্ঞান সেই সংবাদ জানায়। এই তত্ত্বটি তথ্য বা গণিতের ভাষায় গড়া। আধুনিক মানুষের সামনে যে অতল শূন্যতার গহ্বর দেখা যায়,—যা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় উদ্বৃত্তটুকু দিয়ে ভরে তোলা যায়,—মনে করা হয় সেই উদ্বৃত্তের সন্ধান নব বিজ্ঞানের কাছে আছে। এই মনে করাটি ধীরে ধীরে একটি প্রত্যয় হয়ে দেখা দেয়। রাসেল, কোয়াইন, উইতগেনস্টাইন সেই আবির্ভাবের গড়ে ওঠার কথা বললেন।—এটিও বিজ্ঞান ;—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এটমের সংসার থেকে মহাবিশ্বের বিশাল পটভূমিতে যার বিচরণ। এই বিজ্ঞানের অসীম রহস্যের মধ্যে থাকে অপার বিস্ময়। যুক্তি স্রোতের ভিতরে ভিতরে বয়ে চলে অন্য একটি স্রোত—সেটি তীব্র অনুভূতির। এই অনুভূতির স্পর্শে রহস্যের প্রকাশের রোমাঞ্চনায় নিষিক্ত হয়ে কেউ হন মিস্টিক, সংশয়ে অভিষিক্ত হয়ে কেউ বা হন স্কেপটিক। কেউ বুঝতে চান মানুষকে—বিজ্ঞানের সাধনায় যে ব্রতী। সব মিলিয়ে বিজ্ঞানের বহতা ধারা। সব মিলিয়ে বিজ্ঞান।

দুই

জানার রাজ্যে এনসাইক্লোপিডিয়া যেমন থাকে, অজানার রাজ্যেও হয়তো তা আছে। তবু যা জানা—তা জানা বলেই তাকে সীমানায় বাঁধা যায়। অজানাকে কেমন করে বাঁধা যাবে? তবু কেউ যদি বলেন, অজানা নিয়ে সব কিছু বলার মত এই বই (Everything you ever wanted to know about the

unknown) এবং বইটির নাম দেন এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইগ্‌নোরেন্স,—অজ্ঞতার কোষগ্রন্থ, তবে কৌতূহলকে এড়িয়ে রাখা যায় না। 1977 সালে PERGAMON PRESS সেই আশ্চর্য কাণ্ডটি করেন। জানার সম্পদ যদি গোষ্পদে ভরা যায়, তবে অজানা হলো সমুদ্র। আর বিজ্ঞানীরা জানেন, যা জেনেছেন তারপর কতটুকু জানার প্রচেষ্টা করতে হবে। কারণ জানার পরিধির বাইরে অজানার পরিধি নিত্য বর্ধমান। সেই অজানাকে চিনতে হলে, জানতে হলে অন্ধকার পথে ধীরে ধীরে চলাই নিয়ম।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে টেকনোলজির হাত ধরে, সেখানে সন্দেহ নেই। মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনা, রিলেটিভিটির প্রমাণ, ক্ষেত্রকণার উপস্থিতি—সবই প্রযুক্তি বিদ্যার আওতায়। এখানে, কোথাও বা হাইসেনবার্গের প্রিন্সিপল মেনে, তত্ত্বের কাঠামো গড়তে, দর্শক ও দৃশ্যজগতের রাগরূপের খরজ পরিবর্তন ঘটে চলে।—এ সবই হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে; কারণ অজ্ঞানতার পথে চলতে ফিরতে জ্ঞানের প্রদীপের আলোটুকু কত যে সামান্য!

একটি সন্দেহ ঘুরে ফিরে বারবার আসে—সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান কোনো দিন কি পাওয়া যাবে? ··এত সব এডহক সমাধানের অরণ্যে কোথায় যে সৃষ্টির বীজের সংবাদটি লুকিয়ে থাকে তার হদ্দ হদিশ স্পষ্ট নয়। এখানে কল্পনা হাজির হয়। টেকনোলজির সৃষ্টিও যেন এক কল্পনা; প্রশ্নের উত্তরেও যেন কল্পনা! 'যেন' শব্দটি বারবার আঘাত হানে। যদি সঠিক প্রশ্নটি জানা যেত তবে হয়তো এই 'যেন' কে সঙ্কুচিত করা যেতে পারে। কোন প্রশ্নটি সঠিক?···হয়তো এটিও অজানা!

অজানার খোঁজে 'যেন-হয়তো' এ জাতীয় শব্দ হাজির হওয়াতে বিজ্ঞানের স্বভাব চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে। সনাতন বিজ্ঞানের মত এখানে নির্দেশনার স্থিরতা নেই; সব সংজ্ঞাই দোলাচল; নির্দিষ্ট পরিসীমার বাঁধা; নির্দিষ্ট পরিবেশে যা সত্য। আবার সব সংজ্ঞা মিলিয়ে জুলিয়ে একটি সংজ্ঞাকেই যেন স্পষ্ট করতে চলেছে। যেমন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা!···এখানে অন্য আর একটি চিন্তার শুরু। বিজ্ঞানের আঙিনায় সব চিন্তাকে ধরা কি যায়? গোলাজাত করা যায় কি? ··এনসাই-ক্লোপিডিয়া অফ ইগনোরেন্স বইটি প্রকাশের কালে প্রাচীন চিন্তা আর নব বিজ্ঞান নিয়ে ঘষাঘষি করে আলো জ্বালাবার চেষ্টা চলে; 1974 সালে যার প্রকাশ, সেই 'তাও অফ ফিজিক্স' নিয়ে এর যাত্রা। এই চিন্তার পথ ধরে সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের ত্রিবেণী সংগমের কথা ভাবা হয়। নতুন এক সাহিত্যের ধারা হাজির হয়। এই ধারাটি বিচ্ছিন্ন ভাবে আগেও হাজির হয়েছে; যার প্রমাণ 1922 সালে প্রকাশিত

হের্মান হেসের সিদ্ধার্থ বইটি। তবু পিরসিগের লেখা জেন এণ্ড আর্ট মোটর সাইকেল মেনটিনেন্স (প্রকাশ কাল 1974) এবং বাক ও মনসানের লেখা 1970 সালে প্রকাশিত জোনাথন লিভিংস্টোন সিগ্যাল বই দুটি চিন্তার বিস্তৃতি প্রকাশ করে গেছে। নব বিজ্ঞানের সুর মিলিয়ে এই বইগুলির আবৃত্তি করা। পাশাপাশি পুরনো বিজ্ঞান সাহিত্যের ধারা, যা মাক্সবোর্ণ, এডিংটন, জর্জ গেমোর হাতে গড়া, তারও পরিবর্তন ঘটে এসিমভ-ক্লার্কদের হাতে। বিজ্ঞান সাহিত্যে বিস্ময় ও অনুভূতি সজোরে সদর্পে পা ফেলে।

—এ সবই ইতিহাস। মানুষের জ্ঞানের পথ হাতড়ানোর ইতিহাস, মানুষের মনের ইতিহাস, খোঁজার আনন্দ, পাবার—খুশির-খবর জানাবার ইতিহাস। সব নিয়ে বিজ্ঞানের ইতিহাস—তার চলা-বলার ইতিবৃত্ত !

তিন

সব ইতিহাসের এক শুরু থাকে ; থাকে ইতিহাস হয়ে ওঠার প্রস্তুতি ; যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর পালা। এই পালার প্রকাশ মনে হয় 1930 সালের 14 জুলাই কাপুথে, এক ছায়া ভরা অপরাহ্নে,—যেদিন রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইন তাঁদের দ্বিতীয় আলোচনাটি করলেন। সেদিন দুটি ভিন্ন ধর্মা, ভিন্ন মতের, ভিন্ন নেশা ও পেশার মানুষ যেন একমত হবেন না স্থির করে আলোচনায় বসেছিলেন। তবু সহসা দুজনে একটি বিষয়ে একমত হলেন। দুজনেই জানেন, যা সুন্দর—তা মানুষকে বাদ দিয়ে থাকে না। এই সুন্দরের প্রকাশ আছে শিল্প, সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানে। সৌন্দর্যবোধ গড়ে ওঠে সত্য আর মঙ্গলবোধের সাযুজ্যে। অনুভূতির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সৌন্দর্যবোধে! সত্য, শিব ও সুন্দর—এটিই প্রকাশের ধারা!

এইকালের পর রবীন্দ্রনাথ আরো এগারো বছর বেঁচে ছিলেন, আর আইনস্টাইন ছিলেন পঁচিশ বছর। এই শেষের বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজের গড়া ও পাওয়া পুরনো নাগপাশ ভাঙতে শুরু করেন। তাঁর ধর্মবোধ, মানব মূল্যবোধ ও মানবতাবাদ নব বিজ্ঞানের চেতনার রঙে রঙিন হয়ে উঠতে থাকে। বিজ্ঞানকে তিনি দেখলেন, আস্তিকালের মত যুক্তির পথের বাইরে অনুভূতির চৌকাঠে পা ফেলতে। বিশ্বাস ও বিস্ময় নিয়ে যাত্রা শুরু করে জীবন সায়াহ্নে তিনি সংশয়কে পেলেন ; এবং পেলেন মনের মুক্তির ইশারা।...অন্যদিকে কট্টর জড়বাদী আইনস্টাইন জীবনের

শেষ যামে দেখেন সব পাওয়া শেষ পাওয়া নয়; সব দেখা নয়—শেষ দেখা! দেখেন, একটি দূরগত বাঁশীর সুরে সবকিছু নেচে হেসে ভেসে চলেছে। সেই সুর কখনো শোনার, কখনো না-শোনার! কী বিস্ময়ে ভরে ওঠা এই প্রকৃতি! যুক্তিবাদী আইনস্টাইন বিস্ময়কে পেলেন, পেলেন অনুভূতিকে।—যে দুটি চিন্তাধারা ইউক্লিডের সমান্তর রেখার মত নিরন্তর পাশাপাশি চলে এসেছে তারা হঠাৎ যেন ভোল পালটে বোলাই-লোবোচিওস্কির ভেবে-নেওয়া সমান্তর রেখার মত একটি উৎস থেকে শুরু হয়ে অন্য একটি উৎসে মিলে যেতে যাত্রা করে। বুঝি, এই উৎস দুটি আছে মানুষেরই বোধিমননে, তার যুক্তি ও অনুভূতির পটে, তার যুক্তি আর অনুভূতির মুক্ত ধারার স্রোতে!

এই আশ্চর্য সংবাদটি নব বিজ্ঞানের বিজ্ঞানীরা ষাটের দশকের শেষভাগে জানলেন, যখন রিলেটিভিটির প্রমাণ পাওয়া শুরু হয়;—একীকৃত শক্তিক্ষেত্র চোখ মেলতে থাকে। বিজ্ঞানদর্শন নিয়ে চিন্তাভাবনার আরম্ভও এই কালে। বিজ্ঞানীরা দেখেন, শেষ পঁচিশ বছরে বিজ্ঞান জগতে যিনি বন্ধ্যা সেই আইনস্টাইনের উদ্বৃত্তটুকু নব বিজ্ঞানের পরিকাঠামো সৃষ্টিতে ব্যয় হয়েছে। এটিই তাঁর বিজ্ঞান জগতে শেষ দান; অশেষ দান এই বিস্ময়বোধ! এই দানটির দিকে চোখ রেখে নববিজ্ঞানে এক নতুন মানবদর্শনের আবির্ভাব ঘটে—নিও এন্থ্রোপিক প্রিন্সিপল। সত্তরের দশক থেকে এই ধারাটি তির তির করে বইতে শুরু করে। নানা বিজ্ঞানীর হাতে বিশ্লেষণে ভিন্নতা থাকলেও—একটি সত্যের রূপ নানা ভঙ্গীতে ধরা দেয়।

অথচ এই ধারায় রবীন্দ্রনাথ থাকতে যে পারেন! তাঁর শেষ দশ বছরের লেখায়, রেখায়, চিন্তায় এই বহতা ধারার খোঁজটি মাঝে মাঝে যে দেখা দিয়েছে, সেখানে তো সন্দেহ নেই।

চার

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের আলোচনাটি নিয়ে এই বই। এই বই ঐ দুই প্রতিভার চোখের আলোয় দেখা বিজ্ঞানের কথা—যে দেখা আজকের দিনের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের। এই নব চিন্তার আসরে নিজের অধিকারে রবীন্দ্রনাথ আসন নিতে পারেন সেই সংবাদটি আমাদের গর্বের আর আনন্দের।

এই সংবাদটি জানার আনন্দ অন্যের কাছে পৌঁছুনোর প্রচেষ্টায় 1975 সালে

লেখা শুরু ;—শুরু 'আলো আরও আলো' বইটি নিয়ে। তারপর দীর্ঘ দশ বছর কেটে গেল নব বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও চিন্তাকে বাংলা ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায়। রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'বাংলা ভঙ্গীওয়ালা ভাষা।' এই ভঙ্গীময় ভাষায় বিজ্ঞানের স্বভাব প্রকাশের দুরূহ বাসনার অন্তরালে আরো একটি রবীন্দ্র বাণী কাজ করে গেছে—'ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দ রূপ।'—জানি, বিজ্ঞানের সত্য এর ব্যতিক্রম নয়। এই জানাটুকুই সাহস জুগিয়ে এসেছে।

এই বইয়ের পশ্চাৎপটে তিনটি বই আছে। এরা যন্ত্র নিয়ে, দেশকাল ও আপেক্ষিকতা এবং এটমের সংসার (১ম ও ২য় খণ্ড)। তাছাড়া থাকে 'এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ' নামের বইটি।

নব বিজ্ঞানের চিন্তার প্রাথমিক আলোচনা কটি ঐ বইগুলিতে আছে ; যেমন থাকে অন্যান্য লেখা বই কটিতে। সব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—এই বিজ্ঞান। আলো আর আলোতে যার শুরু, তার শেষ ঘটে এই বিজ্ঞানে। কাজে ত্রুটি আছে, বারবার অপরাধও ঘটে গেছে। তবু রবীন্দ্রনাথের কথা তুলে আশ্বাস খুঁজে চলি, যদি 'মনের খুশির ভোগে তার খণ্ডন ঘটে চলে !'

আলোচ্য বইটিতে 'কবি বিজ্ঞানী সংবাদ' অধ্যায়ে কবি ও বিজ্ঞানীর আলাপচারীগুলি তাঁদের লেখা থেকে চয়ন করা ; তাঁদের ফোটানো ফুলে মালা গাঁথা (ব্যতিক্রম কো বেদঃ অংশে আইনস্টাইনের উক্তিটি—এটি পল ডেভিসের বক্তব্য)। শুধু সুতোটুকু আমার। এই সুতো জোগানোর দায়িত্ব দিলেন বন্ধুবর ডঃ বীরেন্দ্রবিজয় বিশ্বাস এবং অনুজপ্রতীম ডঃ সুভাষ সান্যাল। যদি অপরাধ ঘটে থাকে—তবে এঁরা সেই দোষের দায়ভাগী।

দশ বছরের দীর্ঘ সময়ের পর শেষ বইটি লেখায় যেমন মুক্তির আশ্বাস থাকে, তেমনি থাকে দীর্ঘ সময় আনন্দ ভ্রমণের শেষে হঠাৎ শূন্যতার আবির্ভাবে হতাশা ! —তবু কোথাও একটা দাঁড়ি টানা যে দরকার !

কলকাতা
১৪ই জুলাই, ১৯৮৬

সাধন দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

এই লেখকের অন্যান্য বই

বিজ্ঞানের কথকতা : আলো আরও আলো, রোমাঞ্চকর রসায়ন, ভাষাগণিত।

সনাতন বিজ্ঞান : থালীসের গাধা, ফিনিক্সের নবজন্ম, হাতিয়ার থেকে যন্ত্র, যন্ত্র নিয়ে।

কোয়াণ্টাম তত্ত্ব : এটমের সংসার (১ম পর্ব), এটমের সংসার (২য় পর্ব)।

আপেক্ষিকতা বাদ : এলবার্ট আইনস্টাইন : সঙ্গ ও নিঃসঙ্গ, দেশকাল ও আপেক্ষিকতা।

অন্যান্য বই : মির্জা গালিব, অন্য কুঠার (ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়)

সম্পাদিত বই : সমুদ্র ভাবনা (লেখক ডঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়)

ত্রুটি স্বীকার

বইটিতে দু-একটি মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেছে :

পৃষ্ঠা সংখ্যা	আছে	হবে
১৩ (১ম লাইন)	Eynar Hertysprung	Eynar Hertzprung
৪৮ (শেষ লাইন)	ইলেক্ট্রো উইল ফোর্স	ইলেক্ট্রো উইক ফোর্স

অনেক দেখা

ক. কেন এত কেন ?

জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের পাঁচটি ধারা—কে, কি, কেন, কবে, কোথায় ? এবং, যেমন পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আরো একটি ইন্দ্রিয়, যা মন, যোগ করা হয়, সেই কল্পনার সঙ্গে তুলনা করে আরেকটি প্রশ্নচিহ্ন জিজ্ঞাসুরা সহজে তোলে—কেমন করে। কেমন করে চেনা যায়, কেমন করে ঘটে, থাকে, হয় ইত্যাদি। এ জাতীয় নানা ক্রিয়াকলাপ ঘেঁটে কে-কি-কেন-কবে-কোথায় এর উত্তর বিজ্ঞান জিজ্ঞাসুরা খুঁজে চলেন।

খোঁজার উত্তর কি সবসময় সঠিক পাওয়া যায় ? যায় না। সেই যেমন পাঁচ অন্ধের হাতি দেখা। কেউ কান ছুঁয়ে বলেন, হাতি কুলোর মতো ; কেউ শুঁড় ছুঁয়ে বলেন, এ দেখি একজাতীয় সাপ ; অন্যে পা ছুঁয়ে বলেন, এযে দেখি থাম বা গাছের গুঁড়ি ; ল্যাজ কারো কাছে আনে হাতির দড়ি-আকৃতি আর পুরো শরীরের বোধ জাগায় হাতি যেন এক নিটোল বক্র দেওয়াল ! এঁদের কাছে হাতির শরীরের এক এক অংশ হাতি বলে প্রতিভাত হচ্ছে ; আর প্রতিভাত হচ্ছে চেনা-জানা বস্তুর আদলে। কুলোর মত কান বলতে ঠিক কুলো যেমন, তেমন কান বুঝি না ; কারণ বাক্যাংশের মধ্যে 'মত' কথাটি। রাজকন্যার বাঁশির মত নাক, পটলচেরা চোখ, মেঘের মত চুল, সঞ্চারিণী লতাটির মত দেহ—যে ছবিটি মনের মধ্যে টেনে আনে, তা' ঐ উপমাগুলির বিশিষ্টতা, গুণের তুলনা। ছোট ছেলে গল্প শুনতে শুনতে বলতে পারে, 'ওরকম ভাবে বলছ কেন ?'—এই 'কেন'র উত্তর ঠাকুমা-দিদিমা মা-বাবার জানা নেই। সৌন্দর্যের ঠিক বর্ণনা কথার কোনো বাগভঙ্গীতে কি সুস্পষ্ট ভাবে বোঝান যায় ? পারে কি কথা সৌন্দর্যের সঠিক অনুভূতি জাগাতে ?—তবু, আপন মনের মাধুরী মিলিয়ে আঁকা, বলা ছবিটি আবছা হলেও যেন চেনা, যেন জানা ; সে যেন অধরা নয়, অ-বোঝাও নয়।

বিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এই উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার এসেছে। কারণ মুখের ভাষায়, যে কোনো বস্তুকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাতে গেলে, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর বোঝাতে গেলে, খানিকটা অতিকথন আসে। গাণিতিক সংক্ষিপ্ততার আঁটসাঁট বোধ হারিয়ে যায়। কথা মানেই অনেক কথা, শব্দার্থ মানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা। আর

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি রীতি নজরে আসে, অন্ধের হাতি দেখার মত একটি প্রশ্নের হাজার উত্তর। দার্শনিক শোপেনহায়ার এই কেন প্রশ্নের উত্তরে যে কত ঝামেলার উত্তর পাওয়া যেতে পারে তার কথা তাঁর বিখ্যাত রচনা Die Vierfache Wurzel des Satzes Vom Grunde বা মূল সিদ্ধান্তগুলির বহুধা উৎস ভূমির সন্ধান-এ বলেছেন। শোপেনহায়ার শেষ পর্যন্ত সব প্রশ্নের শেষ কথায় টেনেছেন—এটাই 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'। বিজ্ঞানীরা এর পরেও প্রশ্ন তুলবেন, এরকম ইচ্ছা ঈশ্বরের হবে কেন?

এই কেন প্রশ্নের উত্তরে বেশ অদ্ভুত অদ্ভুত উত্তর শোনা যায়। যেমন—বুদ্ধিমান প্রাণীদের অস্তিত্বের কারণটা কি? তারা আছে কেন?

—এর উত্তরে আরেক বুদ্ধিমানের উত্তর, তারা না থাকলে এই প্রশ্নটা তুলতো কে হে?

কিংবা ধরা যাক মোটর গাড়ির স্পার্কপ্লাগ একটা নির্দিষ্ট সময়ে পেট্রলের মিশ্রণটাকে প্রজ্বলিত করে কেন?—এর উত্তর দুটো হতে পারে। এক নম্বর হলো, মেসিনের যন্ত্রাংশ এমনভাবে তৈরি যে ঠিক ঐ সময়ে স্পার্কটা ঘটবে। এবং দু নম্বর উত্তর হলো, ঐ সময়ে স্পার্কটা ঘটলে মেসিনটির এফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা বাড়ে।

প্রথম উত্তর পদার্থবিজ্ঞানীদের খুশি করবে। তবু তাঁরা প্রশ্ন তুলবেন, যন্ত্রাংশটা ঠিক এমনভাবে তৈরি হবে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর জানাচ্ছে দ্বিতীয় উত্তরটা। এ ধরনের উত্তরকে বলা হয় Teleological ব্যাখ্যা বা পরম কারণমূলক ব্যাখ্যা, যা তখনকার মত প্রশ্নের ধারাবাহিকতাকে থামিয়ে দেয়।

কিন্তু এই টেলিওলজিক্যাল ব্যাখ্যা সবসময় মানুষের কাছে পছন্দসই হয় না। যেমন, প্রশ্ন তোলা হলো, রামবাবু দৌড়ুচ্ছেন কেন?—এর সহজ উত্তর হলো, অফিসের বাসটা ধরতে হবে। দেরী হয়ে গেছে যে! আর পরম কারণমূলক উত্তর হবে, মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট আদেশ পায়ের মাংস পেশীতে পৌঁছে গেছে বলে। দ্বিতীয় উত্তর শুনলে যে কোন লোক বলবে, ইয়ার্কি হচ্ছে?—অথচ এই উত্তরে বিজ্ঞানীর অনুসন্ধিৎসতা নিবারিত হয়।

সেই ছেলে আর বাবার গল্প। ছেলে প্রতি মিনিটে বাবাকে প্রশ্ন করে; তার কাছে পরম কারণমূলক উত্তর বলে কিছু নেই। বাবা নাজেহাল হয়ে ছেলেকে টফি, লজেন্স, বই, ছবি ঘুষ দেন; তবু ছেলের প্রশ্নের প্রবাহ থামে না। অস্থির হয়ে বাবা ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেন, এবার থামতো বাপু! তোমার প্রশ্নের ঠেলায় আর

পারিনে। আমরা আমাদের বাবাদের এত প্রশ্ন ছেলেবেলায় কখনো করিনি।—কাঁদ-কাঁদ মুখে ছেলে বলে, করলে বোধহয় আমার একআধটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতে। একটাও তো ঠিকঠাক পারলে না।

এখানে প্রশ্নের ধারা থামায় ধমক। যাজ্ঞবল্ক্যের পরম কারণমূলক উত্তরের পরেও গার্গী প্রশ্ন তুললে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ধমকে বলেন, গার্গী অতিপ্রশ্ন করো না, মাথা ফেটে যাবে।

এই অতি প্রশ্নের বেড়া শিশুর জানা নেই, বিজ্ঞানীরাও মানেন না। এই জন্য, পরম কারণমূলক বা টেলিওলজিক্যাল উত্তর নিয়ে বিজ্ঞানীদের যন্ত্রণা! পরম কারণটা কি? এটা যে পরমকারণ কি করে বুঝলে? অসীমের গণিতের মত অসীমের শেষ যেমন জানা যায় না, তেমনি আজকে যাকে পরম বলি কাল সে যে অন্য এক পরমকে আসন ছেড়ে দেবে না, একি বলা যায়?

কয়েকটা প্রশ্ন নেয়া যাক:

—সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায় কেন?

—কারণ যেদিকে সূর্য অস্ত যায় সে দিকটাকে আমরা নাম দিয়েছি পশ্চিম।

—তাই বুঝি? তবে অস্ত যায় কেন?

—ঠিক অস্ত যায় না। পৃথিবী লাট্টুর মত পাক খায় বলে উলটো দিকে চলে যায়—দেখিনা।

—পৃথিবী পাক খায়? কেন পাক খায়?

এই জাতীয় প্রশ্নধারার উত্তর খোঁজার চেষ্টায় গড়ে ওঠে নিউটনের মহাকর্ষবাদ, আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্ব এবং গণিতভিত্তিক কোয়ান্টাম মেকানিক্স। তবু এতসব খেটেখুটেও পৃথিবী যে লাট্টুর মত পাক খাচ্ছে তার লেত্তিটির সঠিক নিশানা পাওয়া যায় না। কিছু কেন এখনো থেকে যাচ্ছে।

এই পরম কারণমূলক বা পরমকারণিক উত্তরের খোঁজে বিজ্ঞানীরা ঈশ্বরকে টেনে আনছেন না। তাঁরা প্রকৃতি বা নেচারের কথা তুলছেন। আর পরম-ব্যাখ্যাকে আপাতত মানা হচ্ছে না। অন্তত ন্যাচুরাল সায়েন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদার্থবিদ্যার শাখায় নয়। সেখানে এখন যাকে মানা হচ্ছে তা হলো সীমিত পরিমিতির মধ্যে আপেক্ষিক বা তুলনামূলক বিচার। এই তুলনা অবশ্যই উপমা-উৎপ্রেক্ষা নয়, এটি হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট আপাত ধ্রুবকের সাপেক্ষে গুণাগুণ বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনা।

পদার্থবিদ্যা ফিজিক্সে পরম বলে কিছু নেই। না থাকুক। বায়োলজি বা

প্রাণবিজ্ঞানে এখনো পরমকারণ খোঁজা হচ্ছে। যেমন, খাবার ব্যবহার হত্যার জন্য, পা থাকে চলে ফিরে বেড়াবে বলে আর ডানা হলো ওড়ার কারণে—এসব উত্তরে কারো কোনো আপত্তি নেই, এরা টেলিওলজিক্যাল ব্যাখ্যা। কিন্তু এরপর প্রশ্ন তোলা হলো, এসব হলো কি করে? হলো কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বিস্তর তর্ক-বিতর্কের কচকচানি চলছে-চলেছে-চলবে গোছের চলেছে। বর্তমানে বেশীরভাগ বিজ্ঞানীদের মত এসব হলো প্রকৃতির নির্বাচন বা Natural Selection; নানা পরীক্ষানিরীক্ষা বিচার করে এগুলিকে, এসব পদ্ধতিগুলিকে, প্রকৃতির কাছে টেকসই মনে হয়েছে। প্রকৃতি নিজে পেপারসেটার ও একজামিনার। সে ঝাড়াই বাছাই করে এদের বেছে নিয়েছে। এরা ভাল হতে পারে, মন্দ হতে পারে। পারে সুন্দর অসুন্দর, সহনীয় বা দুঃসহ হতে। এরা সকলেই প্রকৃতির নির্বাচিত।

এই ব্যাখ্যায় কিছুটা হাঁফটানা গেল। কিন্তু তারপর আবার প্রশ্ন, প্রকৃতিকে ঈশ্বর ভাবব কি? অথবা সামান্য চোখ বা প্রাণীজগতের প্রাথমিক চেতনার ইন্দ্রিয়টি শুধু কি প্রকৃতির নির্বাচন ক্রিয়ার ফলে উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে বর্তমান মানুষের জটিল চক্ষু-মস্তিষ্কের অবস্থা পেয়েছে। প্রকৃতিই কি সব?

সঙ্কর প্রাণী বা সঙ্কর গাছ বিজ্ঞানীরা করেছেন—এখানে বিজ্ঞানীদের নির্দেশনা দেখা বোঝা যায়। তারা গাইড। প্রকৃতি কি ভাবে নির্দেশ দিচ্ছে, গাইড করছে?

সরীসৃপ থেকে পাখির উদ্ভব—বেশ মানা গেল! সরীসৃপের আঁশ হঠাৎ কেন পালকের আকার পায়, যেখানে কোন পেশী নেই, যে কোন কাজের নয়, শুধু ফুলের পাপড়ির মত ছড়িয়ে থাকে? কেন? ঈলমাছ বিদ্যুৎ দিয়ে কাদার মধ্যে পথ খোঁজে—সে সামান্য শক্তির বিদ্যুৎ হলেই তো চলে। তবু সে কেন এত উচ্চ বিদ্যুৎ শক্তি তৈরি করে, যা মানুষকে অবশ করে দেয়? কেন? গরু কেন জাবর কাটে? জিরাফের কেন শ্রুতি-স্বর নেই?

ঘোড়ার চেহারার যে আদিরূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, তাহলো খরগোশের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ। কয়েক হাজার বছরের বিবর্তন ধারায় সেই আদিরূপ এখন অশ্বাকৃতি পেয়েছে, যে গাড়ি টানে, মাল বয় অথবা যার দৌড়ের উপর বাজিধরা হচ্ছে। বিবর্তন বা Evolution এর ধারায় কি পরম ব্যাখ্যা সম্ভব? প্রাকৃতিক নির্বাচন কি টেলিওলজিক্যাল মীমাংসা টেনে আনতে পারবে?

একদল বিজ্ঞানী ঐ বাজিধরার কথা তুললেন। রুলেট টেবিলে গুটির দান নির্দিষ্ট করে বলা যেতে পারে যদি সমস্ত সম্ভাব্য অস্থির পরিবর্তনশীল অবস্থা বা

কারণগুলিকে স্থির ভাবে জানা যায়। এটি গাণিতিক নিয়মে সম্ভব! কিন্তু সব সম্ভাব্য অবস্থা কি জানা যায়? কোনো কোনো বিশেষ টেবিলের ফলাফল হয়তো বলা যায়—সর্বত্র কি সম্ভব? জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী কোথাও কোথাও মিলে যায়, সর্বত্র কি মেলে? যাকে বলা হয় in principle বা মূলত, সেই ভাবে সব পাশার সব দান মূলত বলা সম্ভব নয়। মূলত না হলেও, সম্ভাব্য সমস্ত ঘটনা প্রবাহের কথা ভাবা যেতে পারে। পাঁচজন অন্ধের ভেবে-নেয়া হাতির চেহারার সবটা মিলিয়ে জুলিয়ে হাতির কাছাকাছি জন্তুর চেহারার আদল পাওয়া যাবে—এখানে বাদ থাকে—হাতির দাঁত আর ছোট চোখের চিহ্নগুলি। এদেরও খোঁজ পাওয়া যেতে পারে, যদি অন্ধেরা আরো হাতড়াতে পারত। ঠিক সেই ভাবে সম্ভাব্য ঘটনা প্রবাহদের কথা ভাবা যেতে পারে, তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায়; আর এইসব বিভিন্ন গোষ্ঠীর ক্রিয়াকলাপের আলোচনার ফলে কি ঘটছে বা ঘটতে পারে তা আপাতত, হাতির চেহারার মত জানা যেতে পারে। এখানেই আবির্ভাব হলো গণিত ভিত্তিক সম্ভাবনা তত্ত্ব। এ পথে প্রাকৃতিক বা প্রাণবিজ্ঞান উভয় শাখাতেই বহু কেনর উত্তর পাওয়া গেল অনেক কেনর উত্তরের সম্ভাবনার খোঁজ পাওয়া যায়। সম্ভাবনার ভাবনায় সত্যকে কিছুটা জানা যায়।

তবে এই সম্ভাবনার তত্ত্বে Chance বা দৈব অথবা সুযোগ কথাটি লুকিয়ে থাকে। প্রকৃতির ইন্টারভিউ পার হওয়া একটা Chance বই কি! অথবা কণাজগতের ভাঙচুর খেলায় কোন বিশিষ্ট কণাটি আগে ভাগে এগিয়ে আসে সেটিও সঠিক জানা যায় না; এখানেও যে চান্স নিতে পারে সে আসে। অগণিত উচ্চিংড়ের মধ্যে কোনটা কখন লাফাবে বলা যায় না, সবারই সমান সুযোগ। টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা অনেক পাখির কোনটা যে আগে উড়ে যাবে সে কি সঠিক বলা যায়? Lady Luck ভাগ্য দেবীর আশীর্বাদ কেন কেউ পায় আর কেনই বা কেউ পাবে না? জ্ঞানের সমুদ্রের পারটা কি শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনার অরণ্য দিয়ে ঘেরা থাকবে? কেন?

এই পরিস্থিতি কোনো কোনো বিজ্ঞানী সাময়িক ভাবে মেনে নিয়েছেন। কেউ বা মানতে পারেন নি। প্রাকৃতিক নির্বাচন বা অন্য যা কিছু বলি না কেন, সর্বত্র নিয়ম থাকবে। প্রকৃতির বাছাই এর মধ্যে সব বিপরীত, বিরোধাভাস আছে। আছে বিভিন্নতা, বৈপরীত্য, আপাত বিশৃঙ্খলা। তবু এইসব বিপরীতদের নিয়ে প্রকৃতি সমতার বোধ গড়ে তোলে, যেখানে সামান্য বিঘ্ন ঘটলে, নতুন করে সব কিছু সাজিয়ে নিয়ে নতুন সমতার বোধ গড়ে ওঠে; এক প্রাণী বিলুপ্ত হয়, অন্য প্রাণী আসে,

সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতির। অর্থাৎ এই নির্বাচনের সবটাই কারচুপি নয়, এখানে নিয়ম আছে ;—নিয়ম বুঝি সমতার বা সমন্বয়তার। সেই নিয়ম কি সম্ভাবনার পথে গড়ে ওঠে? অথবা সব তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণ জানা গেলে নিয়মটিকে জানা যাবে? নিয়মটি কি বর্তমান রাজনৈতিক জগতের মত সুযোগ অভিলাষী? অথবা সুযোগ সন্ধানী, যেখানে সকলে Chance নিয়ে লড়ে যাবে? না, এখানে থাকে সর্বার্থ সার্থক মূল্য বোধের উপর গড়ে ওঠা অম্লান সহাস পরিমিতিটির মত একটি বোধ, যাকে বলা যাবে তত্ত্ব? আইনস্টাইন সেই নিয়মটি খুঁজে গেলেন, কারণ তাঁর ধারণা ঈশ্বর এই বিশ্বজগৎ নিয়ে পাশা খেলছেন না। আজকের এই অজানা Chance শব্দটি পরবর্তী কালে অন্য অর্থ, অন্য রূপ পাবে ; প্রয়োজন বিশদ তথ্যানুসন্ধানের ; আরো অনেক কেনর উত্তর খুঁজে পাওয়া। Chance-এর নতুন অর্থ সম্ভাবনার সাপেক্ষে গড়া হবে না, হবে সুনির্দিষ্ট, সুনির্ধারিত অধিজ্ঞাত জ্ঞানের সাপেক্ষে। সে জ্ঞান তখন হয়তো আপেক্ষিক, তবু সে অনেক সুবোধ্য। এখানে পাশার দানের বাজি জেতা নেই, নেই একগোছা চাবি নিয়ে দরজার তালা খোলার চেষ্টা। বরং একে বলা যাবে জানলা দিয়ে বাইরের জগৎটিকে দেখা আর কি করে সেই জগতে পা দেয়া যাবে সে নিয়ে মনে মনে ডাকঘরের অমলের মতো চিন্তা করা। তারপর একদিন সে জগতে অমলকে পা দেতে হবে, কারণ তারপরেও থাকে ভিন্ন জগৎটিকে দেখার জন্য অন্য এক জানলা, আর তার পাশে পাতা খাটটি। কেমন করে অমল সেই জগৎটিতে পা দেবে, সে সম্ভাবনার বোধ এখন জানা নেই। তবু সেই অসম্ভব কাজটি হয়তো চিন্তার ফলে ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে করে ফেলা হবে। সম্ভাবনা কি জানাবে সেই অসম্ভব পথটির কথা অথবা অন্য কোন নতুন তত্ত্ব? সে কবে ঘটবে? আর এই জগৎটিকে চেনার শেষ কোথায়? শেষে আছে কে? আছে কি? অথবা শেষ পাওয়া যাবে কবে? কেন এই জানার আকাঙ্ক্ষা?

এই শেষ প্রশ্নটির উত্তরে সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। আকাঙ্ক্ষার 'কেন'টি বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ তার যাত্রানদের দুই পারটি লুকোনো বিবিধতা বা Hidden Variables দিয়ে অস্থিরতা দিয়ে ঘেরা। কেন দিয়ে আঘাত করে পার ভেঙে দুকূলপ্লাবী জ্ঞানের প্রবাহ বহাবার ইচ্ছা বিজ্ঞানীদের।

জ্ঞানের সীমারেখা টানা যায়। অজানার সীমারেখা কি আছে? কতটুকু জানা গেছে? বিংশশতাব্দীর শেষ পাদে অনেক জানার পর জানা গেল, এই জানা জ্ঞানটি হাজার কেনর কলরোল তুলে ধরেছে। তারা কি? তারা কে? তাদের জানা যাবে কখন? কবে? কেন তারা অজানা? কেন?

পরম কারুণিক ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী কি পরমকারণিক প্রকৃতি ?

এই জানার ইচ্ছার নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানকে ঢেকে রেখেছে এই 'কেন'রা অথবা কেমন করে'র দল। এরা রূপ পালটায়, ভাষা পালটায়, তবু প্রশ্ন চিহ্নটি পালটায় না।

তবু সবার আগে সবার বড় প্রশ্ন থাকে—মানুষের এই জানার ইচ্ছা কেন ?

—আর তখনই শুরু হয় সৃষ্টি তত্ত্ব নিয়ে মানুষের ভাবনা—যে ভাবনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে জানার আকাঙ্ক্ষা—যে ভাবনায় মানুষ নিজের স্থান খুঁজে পায়, অধিকারকে জানে—আর জানে তার চারপাশের পরিবেশকে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। —সৃষ্টি রহস্যের যবনিকা তুলে ধরার প্রচেষ্টাই—মানুষের বৃহত্তম প্রয়াস।

থ. ভবের হাটে হোতাহেতো

আদিতে অন্ধকার ছিল। গড্ চাইলেন, আলো হোক ; অমনি সব কিছু আলোয় ভরে ওঠে। স্পেসে কোথাও দেখা দেয় উজ্জ্বল আলো ; কোথাও আলো স্তিমিত ; কোথাও গভীর, কোথাও ঘন, কোথাও হালকা, কোথাও বা ছায়াঘেরা। কত রঙের আলো, কত আলোর ফুলঝুরি। চারদিক চেয়ে গডের ভারি ভাল লাগে। বলেন, এ বেশ হলো।

তবু আলোর স্রোতে হেসে ভেসে ওঠা স্পেসকে বড় শূন্য মনে হয়। সেই শূন্যতা আলোয় ভিজে ওঠায় আরো অসহ হয়ে ওঠে। গডের তা ভালো লাগে না। তাই তিনি স্পেসকে ভরিয়ে তোলেন নানা নক্ষত্রে, গ্রহ-উপগ্রহে। আসে ধূমকেতু, নীহারিকা, ছায়াপথ। সেই সমুজ্জ্বল আলো নিয়ে গড়ে ওঠা স্পেসকে দেখে গডের ভারি ভালো লাগে। বলেন, এ বেশ হলো !

ঐ নক্ষত্রভরা মহাকাশ দেখে গডের ইচ্ছে হলো সবচেয়ে সুন্দর এক দেশ গড়তে, —তিনি গড়লেন পৃথিবী। এটিকে তিনি মনের মত সাজালেন—পাহাড়ে, নদনদীতে, পাথরে, বালিতে, খোয়াইখন্দরে, হ্রদে গুহায় গহ্বরে। আর সবকিছুর মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলেন বৃক্ষ গুল্ম লতা—ফুল পাতা আর ফলের অলংকার। সেই বিচিত্র সবুজ শ্যামলিমায় ঢাকা, নানা রঙে ভরা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে গডের ভারি ভালো লাগে। কি যে সুন্দর ! বলেন, এ বেশ হলো !

সেই পৃথিবী বড় নীরব। এখানে বাতাসের শিরশিরিনি থাকে, থাকে নদীর, জলপ্রপাতের কলধ্বনি। তবু এখানে নেই চাঞ্চল্য, নেই অনেক গতি—বিচিত্র গতি। গড তাই গড়লেন প্রাণসাম্রাজ্য ; কীটপতঙ্গ, উভচর, জলচর, খেচর, তৃণভোজী, মাংসভূক প্রাণী। তারা এই পৃথিবীকে শব্দে গতিতে ভরিয়ে তোলে। সেই প্রাণের সজীবতায় মুগ্ধ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে গডের ভারি ভালো লাগে। বলেন, এ বেশ হলো !

তবু গডের তৃপ্তি নেই। মহাকাশের আলোভরা সৌন্দর্য, আর পৃথিবীর প্রাণভরা প্রাচুর্য দেখে তিনি মুগ্ধ হন—সেই মুগ্ধতার ভাগিদার হতে কেউ যে নেই ! তা ছাড়া নেই তার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলার প্রাণ, নেই আবদার-আবেদনের খুনসুটি তোলা কথা। বড় একা লাগে গডের। তাই সবার শেষে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—পৃথিবীর বুকে মুগ্ধ হবার জন্য গড়লেন—নিজের প্রতিকৃতিতে মানুষ। সেই মানুষের দিকে তাকিয়ে ভারি সুখ পান গড। বলেন, বেশ হলো !

এই মানুষই গডের শেষ সৃষ্টি, তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিও। নিজের প্রতিকৃতিতে গড়া বলে, সে মানুষ সব সৃষ্ট প্রাণের খবরদারীর হকদার। মানুষের অশেষ ক্ষমতা ; সেই ক্ষমতা সে পেয়েছে গডের কাছ থেকে।

ঈশ্বরের প্রতিকৃতিতে গড়া মানুষ—এই সৃষ্টিরহস্যের কথা বিশ্ব-চরাচরের সব মানুষের পুরাণ-কথায় আছে। আছে বাইবেলের জেনেসিসে, প্রাচীন মিশরের গাথায়, ফিলিস্টিনদের পুঁথিতে, ভারত চীনের পুরাণ গাথায়। পৃথিবীর ঠিক উপরে গড গড়লেন স্বর্গলোক। সেই স্বর্গলোক থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ এল পৃথিবীতে।

রামায়ণের সৃষ্টি কথায় বলা হলো, নানা প্রাণীর সৃষ্টির পর ব্রহ্মা গড়লেন হোতা আর হেতীকে। তাদের তিনি পাঠালেন সৃষ্টির রাখালিয়া কাজে। হোতাহেতী দেখে সারা প্রাণজগৎ জুড়ে খিদে মেটাবার জন্য, প্রাণবাঁচাবার জন্য চিৎকার আর প্রতিযোগিতা। ভয় পেয়ে সেই রাখালিয়া কাজ থেকে মুক্তি চায় হোতা আর হেতী। ক্ষুব্ধ ব্রহ্মা তাদের ভবের হাটে পাঠালেন ক্ষুৎখাম-রক্ষামের ডামাডোলে। খিদে নিয়ে, বেঁচে থাকতে হোতাহেতী প্রতিযোগিতায় নামে। আর দেখে, তারা সবচেয়ে ক্ষমতাবান। সৃষ্টি জগতে রাখালিয়ার কাজ ছেড়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারে নেমে পড়ে।—গডের প্রতিকৃতিতে গড়া যে মানুষ !

পুরাণ গল্পের সৃষ্টিরহস্য ছেড়ে গ্রীকরা এক নতুন তত্ত্ব খাড়া করে। সেই তত্ত্বের ঘোষক হলেন আরিস্তোতল। আরিস্তোতল বললেন, সৃষ্টির কেন্দ্রে আছে

এই পৃথিবী। তাকে ঘিরে পঞ্চাশটি বৃত্তপথে আকাশ বস্তুরা ঘুরে চলেছে। এই মহাবিশ্ব, পৃথিবী, তার প্রাণলোক, পাঁচটি মৌলিক উপাদানে গড়া ; এরা জল-মাটি-হাওয়া আর আগুন ; আর আছে ঈথার বা ব্যোম। যার মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়ায় আকাশ বস্তু। ব্যোমের পর আর কিছু নেই। এই পৃথিবীকেন্দ্রিক বিশ্বলোকের শ্রেষ্ঠ প্রাণী হলো—মানুষ। যার জন্য এই সৃষ্টির সমারোহ, এত ঘটাপটা। মানুষ দেবতাদের প্রতিভূ। দেবদেবীরা তাই সঙ্গে আলাপ করতে পৃথিবীতে আসতে পারে। বিশিষ্টতম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হলো মানুষ। এই পৃথিবী ঘিরে মহাকাশ-বস্তুর যে পরিভ্রমণ, পূজা আরতি চলে, তা উপভোগ করতে আছে মানুষ।

এই পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বলোক তত্ত্ব আরিস্ততলের কাল থেকে প্রায় দু হাজার বছর পাতি পেতে বসে থাকে। কোপার্নিকাস, একদমই হঠাৎ পৃথিবীর সেই মহান ক্ষমতার বিচ্যুতি ঘটান। তিনি জানান সৌরকেন্দ্রিক গ্রহলোকের তত্ত্ব ; পৃথিবী এই লোকের সামান্য এক গ্রহমাত্র ! পৃথিবীর ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও পদচ্যুতি ঘটে। এই বিশ্বলোকের বিশিষ্টতম স্থানটি মানুষ খুইয়ে ফেলে। এই অসম্মানের কাজটি আরো সাড়ম্বরে প্রতিষ্ঠা করলেন গালিলিও। পৃথিবী নিশ্চিত একটি সৌরগ্রহ। সূর্য একটি নক্ষত্র—যার পরিবারের একটি হলো পৃথিবী !

নৈর্ব্যক্তিক উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিজ্ঞানের চর্চায় শুরু এই সময় থেকে। আর এই সময়েই তৈরি হলো একটি নিরপেক্ষ উদাসীন ভাষা—যেটি গণিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী আর ভাষা নিয়ে নিউটন গতি বিজ্ঞানের ভিতে প্রথম বড়সড় প্রাসাদটি গড়লেন। তাঁর শোনানো কথা দিয়ে জানলাম, এ মহাবিশ্বে এবং পৃথিবীতে একই নিয়ম কাজ করে। সব কাজের পিছনে কারণ থাকে ; সেই কারণ হলো এই নিয়ম। নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা থেকে বিশ্বসংসার যন্ত্রের মতো কাজ করে চলে ; সুবিন্যস্ত নির্দেশিত আর নির্ধারিত সেই কাজের পটভূমি। নিয়মের রাজত্বে বেনিয়মের হাজির নেই। তাদের দেশের দহলানহলার দল এখানে ক্ষণে ক্ষণে হাঁক দেয়, চলো নিয়ম পথে !

এই নিয়মের বাইরে যদি কেউ থাকেন, তবে তিনি সেই নিয়মের স্রষ্টা—ঈশ্বর অথবা গড। কারণ নিউটনের পর আরেক ব্রিটিশ বিজ্ঞানী প্রাণতত্ত্বে বিবর্তনের ধারা জানালেন। মানুষ এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। সৃষ্টিকর্তা তাঁর আদলে মানুষ গড়েন নি—বিবর্তনের পথে মানুষের আবির্ভাব।—পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ ভাঙচুর ঘটে গেল। গালিলিও'র পর আরো একবার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয় ; তার আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছে আগমন ! —তবু নিয়মকে জেনেছে বলে মানুষ নিয়মের

পথে যন্ত্র তৈরি করতে পারে ;—তার হাতিয়ার নিয়ে প্রকৃতিকে পদদলিত করতে, যুদ্ধে নামতে পারে। সমস্ত প্রাণজগতে তারই একমাত্র এই ক্ষমতা আছে। সেই শ্রেষ্ঠ। জড়জগতে তার আর পর নেই ! —পশ্চিমের দার্শনিকরা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন মানুষকে কেন্দ্র করে। বাস্তুচ্যুত মানুষ তার নিজের গড়া দর্শনে, বিজ্ঞানের সাহায্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।—নিউটন তাকে মর্যাদা দিতে পারে।

অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কিছু সংশয় দেখা দেয়। তাপগতি বিজ্ঞানে বোল্টংসমান, গিবস ও ম্যাকসওয়েল স্ট্যাটিসটিকসের প্রয়োগ করলেন ;—একটির পরিবর্তে গুচ্ছের বা দলের গুণ চরিত্র বিচার শুরু হয়। এক কে নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না—যা জানা যায় তা একটি দলের গড়পরতা গুণাগুণ। নির্দেশনার জগতে নিয়মের তর্জনিটি সিধে না থেকে একটু যেন বেঁকে যায়। আর তার পরে হাজির হয় ম্যাকসওয়েলের ইথার—যার আছে বিপরীত গুণ ; যার কার্যকলাপে বৈপরীত্য আছে, আছে বিরোধ। একেক অবস্থায় তার একেক ধরনের কার্যকলাপ : কোথাও সে বাধা তোলে না, আবার অন্য কোথাও সে বাধা ; কোথাও সে কঠিন সুদৃঢ়, কোথাও আবার স্থিতিস্থাপক। এই ইথারকে মেনে নিয়ে ম্যাকসওয়েল বিদ্যুৎচুম্বক তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন ;—সেই তত্ত্বের পথে রেডিও রশ্মি পেলেন হের্ৎস।—তত্ত্ব সঠিক ; তবু এটি কি নির্ধারিত ? পরিবেশ নিরপেক্ষ ?—নিয়মের রাজত্বে একি বেনিয়মি হাজিরা !

এ সব আবিষ্কার বিরক্তিকর হলেও সংকটের নয়। সংকট দেখা দেয় উনিশ শতকের শেষ ভাগে। মাইকেলসন মরলের পরীক্ষায় নিউটনের তত্ত্ব ফেল করে ; ইথার নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাপগতি বিজ্ঞানের ধারায় নির্দেশনার সূত্র যেন ছেঁড়া মনে হয়। মসৃণ সুবিন্যস্ত নিটোল পথে উচ্চাবচ রূপ দেখা দেয় ;—পথে অনেক খানাখন্দ ; লাফিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় কি আছে ? তাছাড়া টমসনরা এটমের ভাঙন জানিয়েছেন—পাওয়া গেছে ইলেকট্রন। রোণ্টগেন আনলেন এক্সরে। বেকরেল-কুরীদের হাতে ধরা দেয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এরা নিউটন-ম্যাকসওয়েলের নিয়মের জালে ধরা দেয় না।—তাদের দেশে ভিনদেশের রাজপুত্রের আগমনে সংশয় সংকট দেখা দেয়।—এসব চিন্তা তথ্য তবে কি নতুন যৌবনের দূত ?

বিংশ শতাব্দীতে পাওয়া গেল দুটি তত্ত্ব—কোয়ান্টাম মেকানিকস আর রিলেটিভিটি। একটিতে—রিলেটিভিটিতে—নতুন পস্টুলেট বা সিদ্ধান্তকে টেনে আনা হলো। সনাতন ত্রিমাত্রিক জগৎ চতুর্মাত্রায় স্থান পায়। নিউটনের প্রতিষ্ঠিত সুমহান আর স্বাধীন স্পেস ও টাইম—তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে স্পেসটাইম নামের

জরাসন্ধের রূপে দাঁড়া'য়। যে নিয়ম পাওয়া যায়—সেই নিয়ম আপেক্ষিক, তুলনামূলক। এখানে পরমত্ব-চরমত্ব নেই। অথচ এই নিয়মের আঙিনায় নিউটনের তত্ত্ব ধরা পড়ে। ম্যাকসওয়েলের জানানো ইলেকট্রাম্যাগনেটিক তত্ত্বের একক রূপ আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পায়। পুরনো ঘরাণাকে বজায় রেখে তানতাল কর্তব—বন্দীশের কাঠামোয় পরিবর্তন এনে নতুন এক বিস্তৃত-পরিব্যাপ্ত গায়ন রীতি দেখা দেয়—আপেক্ষিকতাবাদ-রিলেটিভিটি।

অন্য তত্ত্বটি নির্দেশনা আর নির্ধারণের স্পষ্টতাকে তছনছ করে ভাঙে; স্টাটিসটিকসের রীতিকে টেনে এনে জানায় ক্ষুদ্র জগতে কোথাও সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। এখানে কাজ করে সম্ভাবনার শর্ত, অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত! জানা যায়, যে বিরোধ ইথারের গুণে ছিল—সেই বিরোধ আছে ক্ষুদ্র জগতে। এখানে বিপরীত কণা থাকে; মহাবিশ্বে বিপরীত বিশ্ব লোক থাকতে পারে। আলোর গতি এই বিশ্ব জগতে সর্বোচ্চ। এখানে আলোর চেয়েও কমগতিসম্পন্ন কণা থাকে। তবু—অন্য কণা—যার গতি আলোর চেয়েও বেশি—সেই টেকিয়ন কণার অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে নাকচ করা যায় না। গণিত নামক ভাষার সাহায্যে এদের উপস্থিতি জানানো হয়। তারা কেউ কেউ 'প্রেজেন্ট সার' বলে বিজ্ঞানের লেবরেটারিতে হাজির হয়েছে। তারা কেউ কেউ নানা কারণে এখনো অনুপস্থিত। হাজিরা খাতায় তাদের নামের পাশে ঢ্যাঁড়া চিহ্ন এখনো আঁকা!—হতভম্ব মানুষ ভাবে এসব বেহিসেবি নিয়মের রাজত্বে সে কেন আছে? কেন তার অস্তিত্ব? যে জড়বাদ তাকে ক্ষমতা দিয়েছিল—নতুন তত্ত্বের আবির্ভাবে জড় পদার্থের জড়ত্ব লোপ পায়। মেটার ও এনার্জি—স্থিতি ও গতি—রূপান্তরের দুটি প্রকাশ বলে জানা যায়।

আরো জানা যায়- এই মহাবিশ্বের একটি জন্মলগ্ন ছিল। তার সৃষ্টি বিন্দু ছিল। তারপর সে বিস্তৃত হয়েছে। প্রাণের বিবর্তনের মত সৃষ্টিরও নিত্য পরিবর্তন-পরিমার্জন ঘটে চলেছে। এদের দেখার পথে চেনা যায় না। চেনা যায় ফেলে রাখা চিহ্ন ধরে, গণিতের আলপনায়, চেতনার স্পর্শে। গণিত নামক ভাষাটি জানায়, যে সিদ্ধান্ত ধরে ইউক্লিডের জ্যামিতি গড়ে ওঠে—সেই সিদ্ধান্তকে নাকচ করে এক নতুন গণিত পাওয়া যায়—যা জানায় নতুন এক রীতিকে; সেখানেও নিয়ম থাকে, সত্য থাকে। জানা যায়, একটি কঠিন সত্যের বিপরীতটিও অন্য এক সত্য হতে পারে। পরিবেশের পরিবর্তনে নীতি রীতির পরিবর্তন ঘটে। একটি সত্য যে পরিবেশে পাওয়া যায়, ভিন্ন পথে, অন্য পরিবেশে, অন্য সত্য পাওয়া সম্ভব। এখানে বিরোধ নেই। গণিতের ভাষায় গড়া পথে তাদের জানা যায়।

অথচ সব সত্য একটি উৎসের দিকে যেন ইঙ্গিত করে। সব সত্য মিলে মিশে ধরা দেয় সুর সঙ্গতির আলপনা—হার্মনি।

মানুষ নতুন করে পুরাণের ইতিবৃত্ত ঘাঁটে। এরিস্তোতলের গুরু প্লাতো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রে কবি-দার্শনিকদের স্থান দিতে চাননি। এরা সোফিস্ট। এরা শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা করেছেন ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নির্দেশিত জ্ঞানকে—বাস্তব সত্যকে, শুধু মেনে নেন নি। এদের চর্চার বিষয় ছিল Arate—যার অনুবাদ প্লাতো করেছিলেন Virtue বা ধর্ম বলে। এটি Relegion নয়। এটি গুণ বা Quality—যা বস্তুর অভ্যন্তরে আছে ; যাকে বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা যায় না। যাকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পথ ধরা যায় না। যে আছে অনুভূতির আবেশে, চিন্তার মাধুর্যে। বস্তুর বাইরের অস্তিত্বে আছে সত্য—ভেতরে আছে ধর্ম। যাকে বলা যায় মঙ্গল ; তার গুণ ; তার শিবত্ব! সত্য বুদ্ধিগ্রাহ্য ; ধর্মকে জানা যায় বোধিমনের মুকুরে। —আরো জানা যায়, সব বস্তুতে বৈপরীত্য থাকে। জরাথুস্ত্র বললেন—এ জগতে আছেন আহুর মাজদা—যিনি বুদ্ধের সুমতি ; আর আছেন আহুর আহজা—যিনি বুদ্ধের কুমতি। নিত্য বিবাদ এদের। দেবদানবের লড়াইয়ে কখনো একজন জেতে কখনো অন্য জন। এদের পৃথক করে এই জগতে চেনা যায় না ;—যা বোঝা যায় তা এদের যুগ্মরূপের প্রতিফলন।—জানা গেল, এই জগতে আছে সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষের মত, চীনের তাও ধর্মে জানানো য়িন (Yin) এবং য়্যাঙ (Yang)। এই জগৎ সব কিছুর সমন্বয়ে সংহত হয়ে গড়ে উঠেছে। এই সংঘবদ্ধতাতে প্রকাশ পায় হার্মনি—সুন্দরতা।

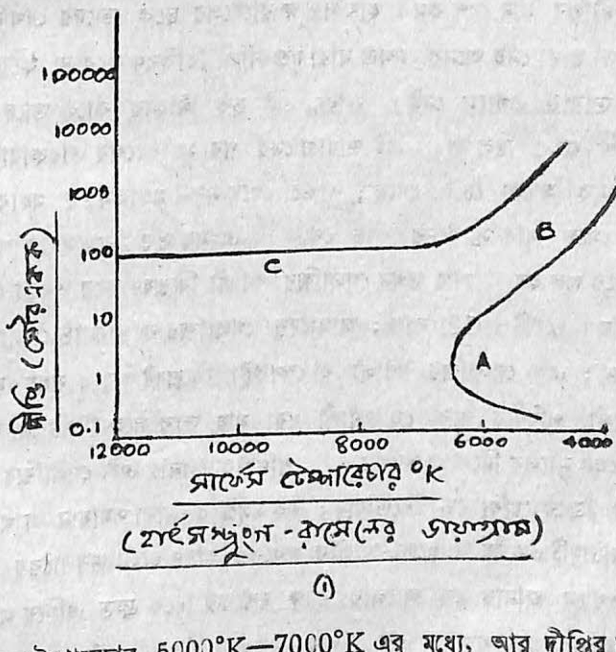
এই সৌন্দর্যের প্রকাশ মহাবিশ্ব লোকে—পৃথিবীতে। মানুষ তারই একটি অংশ। এই সৌন্দর্য সে খোঁজে—খোঁজার পথের যষ্টি হলো প্রাকৃতিক নিয়ম। এই নিয়ম না জানলে পথ খোঁজা—পথ চলা দুটিই দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। এই পথে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে আরো একবার মানুষ সৃষ্টিতত্ত্বের দিকে হাত বাড়ায়। 'কেন' এই সৃষ্টি না জেনে সে জানতে চায় 'কেমন করে' এই সৃষ্টি।—এই জানাতে তার আপনাকে জানা। অফুরন্ত এই জানার পথে সে নিজকে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। তার থামার উপায় নেই। বাস্তুচ্যুত যাযাবর মানুষকে সেই আদিকালের পর আরো একবার ঘর তৈরির কাজে নামতে হয়।

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তাই তার এত হাঁকডাক, এত উন্মাদনা, এত প্রয়াস।

ক. অন্তবিহীন পথ

এই শতাব্দীর প্রথমদিকে আইনার হার্ৎস্প্রুঙ্গ (Eynar Hertysprung) এবং হেনরি রাসেল (Henry Russel) একটি ডায়াগ্রামে চেনাজানা মহাজাগতিক নক্ষত্রদের সাজালেন,—সাজাবার রীতি হলো নক্ষত্রদের সার্ফেস টেম্পারেচার আর তাদের লুমিনোসিটি বা দীপ্তি। দুটি রেখায় তাঁরা নক্ষত্রদের পরিচয় জানালেন। প্রথম রেখাটির দুটি অংশ A আর B। A অংশে আছে অধিকাংশ নক্ষত্র যাদের



(হের্ৎস্প্রুং-রাসেলের ডায়াগ্রাম)

(১)

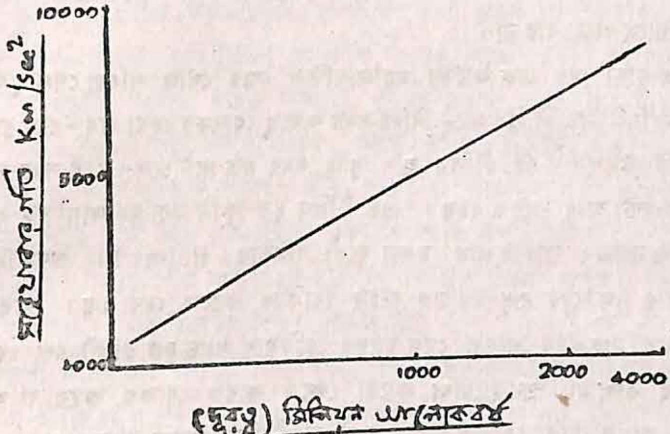
সার্ফেস টেম্পারেচার 5000°K—7000°K এর মধ্যে, আর দীপ্তির মান হলো সৌরদীপ্তির এক দশমাংশ থেকে দশগুণ। আমাদের সূর্য, যে একটি নক্ষত্র,—সেও এ অঞ্চলের সভ্য। এখানের সভ্য নক্ষত্রদের মাস বা ভর সৌরভরের এক দশমাংশ থেকে দশগুণ। এই নক্ষত্রদের জানানো হলো প্রধান ধারা বা main sequence-এর নক্ষত্র বলে। এই রেখার শেষ অংশে B অঞ্চলে আরো একদল নক্ষত্র আছে—যারা সংখ্যায় কম, যাদের সার্ফেস টেম্পারেচার মোটামুটি এক ; 5000°K এর কাছাকাছি অর্থাৎ সূর্যের সার্ফেস টেম্পারেচার যা 6000°K তার চেয়ে কম।

অথচ এই নক্ষত্রদের দীপ্তি সৌরদীপ্তির অনেক বেশী। এই অঞ্চলে আছে লাল-দানব বা Red Giant নক্ষত্ররা, অপেক্ষাকৃত শীতল সার্ফেসের জন্য এখান থেকে যে আলো বেরিয়ে আসে তা লালের দিক ঘেঁষা; সাদা নয়। আর দ্বিতীয় রেখা C অঞ্চলে আছে একদল নক্ষত্র যাদের দীপ্তি মোটামুটি এক হলেও, সার্ফেস টেম্পারেচারে বিভিন্নতা আছে।

হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ছকে ছোট্ট জায়গায় অনেক সংবাদ ঠাসা থাকলেও এখানে সেদিনের জানাশোনা সব নক্ষত্রের ঠাঁই হয়নি। যেমন একদল ছোট কিন্তু উত্তপ্ত তারকা—যাদের সাদা বামন (White Dwarf) নক্ষত্র বলা হয় তাদের হাজিরা এখানে নেই। কারণ এদের সার্ফেস টেম্পারেচার খুব বেশী হলেও দীপ্তির মান বেশ কম; হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ছকে তাদের দেখানো যায় না। তা ছাড়া নেই অনেক নক্ষত্র যারা দৃশ্যবর্ণালী বিকিরণ করে না, করে রেডিও তরঙ্গ; তারাও এখানে নেই। কারণ এই ছক আঁকার কালে তাদের সম্বন্ধে খুব বেশী জানা ছিল না। এই ডায়াগ্রামের পর মহাকাশের তারকারা পৃথিবীর বুকে অনেক আলো ঢেলে গেছে; পাওয়া গেছে নতুন মহাকর্ষতত্ত্ব, মহাকাশতত্ত্ব; পাওয়া গেছে আইনস্টাইনের কাছ থেকে। এইসব তত্ত্ব নিয়ে মহাকাশ গবেষণা নতুন করে শুরু হয়। আর তখন গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে একটা গোলমাল দেখা যায়। সেটি 1912 সাল; আমাদের গেলাক্সির কাছাকাছি গেলাক্সি হলো এণ্ড্রমিডা; এই গেলাক্সির বর্ণালী বা স্পেকট্রা বিশ্লেষণ করার সময় দেখা যায়, এই বর্ণালী, পৃথিবীর বুকে যে বর্ণালী ধরা যায়, তার সঙ্গে মিলটানে, শুধু সমস্ত বর্ণচ্ছত্র যেন নীলের দিকে হেলে থাকে। পৃথিবীর তুলনায় এই গেলাক্সির বর্ণালীর আলোর ফ্রিকোয়েন্সি যেন বেড়ে যায়; এই সমস্যার নানা সমাধান ব্যাখ্যার মধ্যে যেটি মোটামুটি গ্রহণীয় তা হলো বর্ণালীর সরণের কারণ হলো ডপলারের এফেক্ট—যেটি এখানে জানায় যে আলোর তরঙ্গ দর্শকের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসে বলে ফ্রিকোয়েন্সি বেড়ে যায়। এক কথায় আলোর উৎসটি দর্শকের কাছে এগিয়ে আসে—অর্থাৎ এণ্ড্রমিডা গেলাক্সি আমাদের গেলাক্সির কাছাকাছি আসার জন্য গতি নিয়ে ছোটে। এই গতিটিও মাপা হলো। জানা যায় এই গতি হলো 200 Km/Sec মাত্র; মহাকাশের পটভূমিতে এই গতি কিছুই নয়।

কয়েক বছরের মধ্যে কাছাকাছি গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হলো। দেখা যায় সব কটি গেলাক্সি, যারা কাছের, তারা আরো কাছে আসতে চায়, অথচ দূরের গেলাক্সি আরো দূরে সরে যেতে চায়। এখানে বর্ণালীর লালের দিকে হেলে পড়া।

দূরের গেলাক্সি প্রতি মুহূর্তে আরো দূরে হটে যায়—যা দেখে জানা যায় এই বিশ্বলোক বর্ধমান। 1929 সালে এডুইন হাবল (Edwin Hubble) গেলাক্সিদের লাল সরণটিকে গ্রাফে আঁকলেন—দেখা যায় সরে যাবার গতিটি দূরত্বের উপর



হাবেলের গ্যালাক্সির ছক
(২)

নির্ভর করে। যতদূরে গেলক্সির অবস্থান তত তার সরে যাবার বেগ। অন্যদিকে ওই গেলাক্সি যদি আবর্তনে নামে তবে এই লাল সরণ বা Red Shiftটি ভিন্ন হতে পারে; পরীক্ষায় সেই বিভিন্নতাও দেখা যায়। গেলাক্সিরা ঘুরতে ঘুরতে দূরে সরে যায়—এটি হাবলের পরীক্ষা থেকে জানা।

গেলাক্সির বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তার উপকরণের তত্ত্ব তালাস করা হয়—জানা যায় দূরের বা কাছের সব গেলাক্সি গ্যাসের মেঘে ভরা; এখানে আছে হাইড্রোক্সিল (OH) আয়ন। তা ছাড়া ফর্মালডিহাইড (HCHO) অথবা সাইনোএসিটিলিন (C_3H_3N)। গণিতের সাহায্যে জানা যায় গেলাক্সির মাসের একদশমাংশ আছে এই অন্তর্গেলক্সিয় অঞ্চলে। তাছাড়া আছে গ্যাসে গড়া নক্ষত্র। সব নিয়ে গেলাক্সি দূরে সরে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে রেডিও টেলিস্কোপের ব্যাপক ব্যবহার। এই সময়ে নানা নক্ষত্রের বর্ণালীর রেডিওতরঙ্গ অঞ্চলের এনাটোমিক ব্যবচ্ছেদ শুরু হলো। জানা যায় অনেক নক্ষত্র শুধু মাত্র রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করলেও, বহু নক্ষত্র আছে যারা সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্য আলোর বর্ণালীও বিকিরণ করে—সেই

নক্ষত্রের উপস্থিতি টেলিস্কোপের ফোটো প্লেটে বিন্দু মাত্রিক অবস্থানে দেখা যায়। এখানে দৃশ্য আলোর ভাগ সামান্য, বিকিরণের সিংহ ভাগ আছে রেডিও তরঙ্গ অঞ্চলে। এই স্তিমিত নক্ষত্রদের বলা হলো আপাত নাক্ষত্রিক বস্তু বা Quassi Steller Object; সংক্ষেপে কোয়াসার (Qusar)। এদের ঠাঁই রাসেলের ডায়াগ্রামে আনা যায় না।

এ ছাড়া অন্য এক জাতের মহাজাগতিক বস্তুর খোঁজ পাওয়া গেল—যাদের লুমিনোসিটি বা দীপ্তির মানে নির্দিষ্ট সময় অন্তরে হেরফের দেখা যায়—যেন বস্তুটির দীপ্তিটি কাঁপে। এই দীপ্তির হ্রাস বৃদ্ধি সময় মত ঘটে চলে—সেই সময় হয়তো কয়েক ঘণ্টা অথবা কয়েক বছর। এই দীপ্তির ধুকপুকুনি ভরা মহাজাগতিক বস্তু—তারাও নক্ষত্র; তাদের নাম দেওয়া হলো পালসার (Pulsar)। প্রথম দিকের পালসার নক্ষত্রদের শুধু রেডিও তরঙ্গ বিকিরণ করতে দেখা যায়। পরে অন্য পালসার নক্ষত্রদের পাওয়া গেল যাদের বিকিরণে আছে দৃশ্য বর্ণালী এবং এক্সরে। দীপ্তির কম্পনের ফ্রিকোয়েন্সি কারো ক্ষেত্রে কয়েক সেকেণ্ড, কারো বা আরও কম—কয়েক মিলি সেকেণ্ড মাত্র। এই বর্ণালী ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে কমে; এখানে নির্দিষ্ট সময়ের অন্তর পাওয়া যায়। তবু 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্র্যাবনেবুলা অঞ্চলে একটি পালসার যে হঠাৎ তার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়িয়ে তুলেছে তা পরীক্ষায় ধরা পড়ে। এই পালসারদেরও হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ডায়াগ্রামে আনা যায় না।

এ ছাড়া মহাকাশে অনেক তারকার উজ্জ্বলতা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া ধরা পড়ে। এই উজ্জ্বলতা কিছুদিন বজায় রেখে তারকাটি আবার স্তিমিত দীপ্ত হয়ে আসে। এদের বলা হয় নোভা (Nova)। তাছাড়া কোনো কোনো তারকার ঔজ্জ্বল্য সহসা সূর্যের দীপ্তির হাজার-লক্ষ গুণ বেড়ে যায়। তারপর হঠাৎ এই উজ্জ্বল তারকা মহাকাশে হারিয়ে যায়, পিছনে পড়ে থাকে উজ্জ্বল গ্যাসের মেঘের কুণ্ডলী। এদের বলা হয় সুপার নোভা (Super Nova)। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতে চীনের জ্যোতিবিজ্ঞানী এই সুপার নোভার বিস্ফোরণ দেখিয়েছিলেন—এই ইতিহাস তাঁরা পুঁথির পাতায় লিখে গেছেন। তাছাড়া যিশুর জন্মের সময় যে উজ্জ্বল তারকাটি প্রাচ্যের জ্ঞানিজনরা দেখেছিলেন, ধরা হয়, সেটি একটি নোভা অথবা সুপার নোভা। এদের ইতিবৃত্ত মহাকাশে লেখা থাকলেও হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ছকে নেই।

এই সব আছে গেলাক্সির জগতে। মাউন্ট পালোমারের বীক্ষণাগারের টেলিস্কোপের সাহায্যে জানা যায় মহাবিশ্বে বেশ কয়েক বিলিয়ন গেলাক্সি আছে; একটি গেলাক্সিতে থাকতে পারে 10^5 থেকে 10^9 নক্ষত্র। আমাদের সূর্য যে

গেলাক্সিতে আছে তার আকার স্পাইরেল: এর ব্যাস হলো 10^5 আলোকবর্ষ বা লাইট ইয়ার। একটি আলোক বর্ষ জানায় $9{\cdot}46 \times 10^{15}$ মিটার; এই গেলাক্সি তবু তত বড় নয়। 10^7 আলোকবর্ষ মাপের ব্যাসের গেলাক্সিরও খোঁজ পাওয়া যায়। একটি গেলাক্সির নক্ষত্রদের সম্মিলিত ভর 10^8 থেকে 10^{12} সৌরভরের সমান। বিরাট বিরাট গেলাক্সিদের আকারে প্রভেদ আছে—কেউ স্পাইরেল, কেউ ইলিপ্টিকেল আবার কারও আকারে শৃঙ্খলা নেই। এরা সবাই গ্যাসের মেঘে ভরা—সেখানে ডুবে আছে নক্ষত্র; আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। এই মেঘ, এই নক্ষত্রদল সবাই ঘুরপাক খাচ্ছে—আর সব নিয়ে আবর্তনে নেমে কুণ্ডলীতে পাক দিতে দিতে ছুটে চলে গেলাক্সিরা—যেখানে আছে নক্ষত্র, পালসার, নোভা, সুপার নোভা; আছে সৌর পরিবারের মত গ্রহ উপগ্রহে ঘেরা নক্ষত্র। আর আছে কোয়াসার। সব নিয়ে মহাবিশ্ব—ইউনিভার্স।

বৃক্ষলতা, কীটপতঙ্গ, স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পাখী, মানুষ সব নিয়ে পৃথিবীর প্রাণ জগৎ—যা বিবর্তনের ধারায় গড়ে ওঠে যেখানে থাকে কিছু মৌলিক উপকরণ বা Building Block। এখানে প্রাণীতে প্রাণীতে মিল নেই—তফাত আছে আকারে প্রকারে স্বভাবে গুণে এবং চরিত্রে। আদিম প্রাণ অণু থেকে তবু সবারই সৃষ্টি। এই মহাবিশ্ব—যেখানে আছে নানা মহাজাগতিক বস্তু, যাদের বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, সর্বত্রই আছে মৌল পরমাণু, গ্যাস, মৌলকণা বা বিকিরণ—এখানেও কি আছে বিবর্তন ধারা? আছে আদিম মহাজাগতিক সৃষ্ট অণু? প্রাণের যেমন একটি সৃষ্টিকাল আছে, মহাবিশ্বেরও আছে কি সৃষ্টি কাল? এইসব প্রশ্ন নিয়ে বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেন। আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্ব প্রকাশের পর এই চিন্তা অনেক বিজ্ঞানীর অনেক রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। তবে এই শতাব্দীর ষাট দশকে হঠাৎ যেন কোথাও একটা আলোর রেখা দেখা দেয়। এই সময়ে আবিষ্কার হয় কোয়াসার ও পালসার। আর ফিজিক্সের দিগন্তটি সহসা অনেক বেড়ে যায় যেন।

এই চিন্তার আরম্ভ মোটামুটি 1963 সাল থেকে। সে বছর আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী মার্টেন স্মিদ্ৎ (Marten Schmidt) আমাদের গেলাক্সির কাছাকাছি একটি কোয়াসার—যার কোড নাম্বার জানানো হয়েছে 3C273 বলে—তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করেন। স্মিদ্ৎ দেখেন এই বর্ণালীর ছয়টি রেখার প্রকৃতি আমাদের চেনাজানা পার্থিব হাইড্রোজেন রেখার সঙ্গে মিল টানে—শুধু রেখার লালের দিকে হেলে আছে। আর এই লাল সরণ বা রেড শিফট এর মান হলো 0·53। এই শিফট জানায় ডপলারের নীতি অনুযায়ী কোয়াসার নক্ষত্র আমাদের গেলাক্সি

ছেড়ে দ্রুত সরে যাচ্ছে। এই ছুটে যাবার গতিবেগ আলোর গতির শতকরা পনের ভাগ। এই গতি গেলাক্সিদের সরে যাবার গতির চেয়েও বেশী। স্মিদ্‌ং-এর পথ ধরে অন্য কোয়াসারদের গতি মাপা হয়েছে। জানা যায়, অনেক কোয়াসার আলোর শতকরা আশি ভাগ গতি নিয়ে ছুটে যায়। অন্য মাপ জোখও করা হয়। কোয়াসারের বিকিরণের তীব্রতা (Intensity) মাপা হয়েছে। এখানেও ধরা পড়ে কোনো কোনো কোয়াসারের বিকিরণের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি সময়ের সঙ্গে ছুটে চলে। এই সময়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, এক বছরের দশমাংশ। অথবা বছরে দশবার বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধি ধরা যায়। কোনো কোনোটির পরিবর্তন ধরা পড়ে কয়েকদিনের তফাতে। এখন পর্যন্ত কয়েক শ' কোয়াসারের খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে মহাবিশ্বে এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হতে পারে। ফোটো প্লেটে বিন্দুমাত্রিক আকৃতিতে এরা ধরা পড়ে। আকারে ছোট গতিতে বড় কোয়াসার! আর তাছাড়া এদের বিকিরণের শক্তি বেশি। বর্ণালী বিশ্লেষণে যে রেডশিফট পাওয়া যায়, সেটি জানায় এটি আছে সুদূর লোকে। 3C273 কোয়াসারটি মনে করা হয় 8-9 বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে আছে। অথচ ছোটখাট টেলিস্কোপেও এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। বিকিরণের এত শক্তি। এক কথায় একটি কোয়াসারের বিকিরণ শক্তি একটি গেলাক্সির বিকিরণ শক্তির চেয়ে বেশি। এই যে শক্তি—এটি ছোটখাট কোয়াসারটি কোথা থেকে পাচ্ছে? নক্ষত্রদের বিকিরণের বা তাপের রীতিতে খাটে আইনস্টাইনের শক্তি ভর রূপান্তরের তত্ত্ব: $E=mc^2$। মাসের রূপান্তরে শক্তি পাওয়া যায়, শক্তি ধরা দেয় তাপে, বিকিরণে। মাস শক্তি রূপান্তরের অবিচ্ছিন্ন ধারাটি বজায় রাখে তাপ; বজায় থাকে বিকিরণ প্রবাহ। কোয়াসার আছে বহুদূরে অথচ বিকিরণ ধারার পথে তাদের অস্তিত্ব সহজেই ধরা যায়। তার কারণ বহুদূর পথ পার হয়ে শক্তি ক্ষয় করেও তার থলেতে যে শক্তি থাকে সেটি তখনো যথেষ্ট বেশি; এত ব্যয়েও ঘাটতি নেই। 3C273 কোয়াসারটি যে বিকিরণের প্রবাহ মহাকাশে ঢেলে চলেছে, রূপান্তরের গণিতের ব্যাখ্যায় এটিকে পাওয়া যায় কয়েকদিনে একটি সৌরমাসের রূপান্তর। এই রূপান্তরী নৈপুণ্য বা এফিসিয়েন্সিকে এখানে ধরে নেওয়া হলো শতকরা এক শ ভাগ। অথচ তারকার ক্ষেত্রে এই শক্তি ভরের রূপান্তরের এফিসিয়েন্সি শতকরা একভাগ মাত্র। সেই এফিসিয়েন্সিটি কোয়াসারের জগতে খাটলে, বলা যায় পৌনে এক ঘণ্টায় একটি সৌরভর কোয়াসারের শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। এই জগতে একটি সূর্যের অবলুপ্তি ঘটে এক ঘণ্টারও কম সময়ে। কোয়াসারের জীবনকাল, হিসেবে পাওয়া গেছে এক

মিলিয়ন বা দশলক্ষ বছর। এই হিসেবে কোয়াসারের ভর হবে অন্তত 10^8 সৌরভর—যেটি একটি গেলাক্সির সম্মিলিত নক্ষত্রদের ভরের কাছাকাছি। কোয়াসারের ভর আর শক্তি দুটিই অসম্ভব বড় মাপের। আবার এদের বিকিরণের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে বছরে দশবার। একটি বস্তুর বিকিরণের সময়ের পরিবর্তন জানা যায় বস্তুটির একপ্রান্তের বিকিরণ অন্য প্রান্তে যেতে যেটুকু সময় নেয় তারই সাপেক্ষে। কাজেই বছরে দশবার বিকিরণে পরিবর্তন পাওয়া মানে কোয়াসারের ব্যাস হলো $\frac{1}{10}$ আলোকবর্ষ। অন্যদিকে আমাদের গেলাক্সির গড় ব্যাস হলো 10^5 আলোকবর্ষ। এক কথায় একটি কোয়াসার যার শক্তি আর ভর একটি গেলাক্সির সমান, তার আকার হলো সেই গেলাক্সির 10^{-6} অংশ মাত্র! কত ছোট, কত ভারি আর কত শক্তিশালী! আবার এর গতি আলোর গতির কাছাকাছি। এই অদ্ভুত কোয়াসারটি কি?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের পথ হাতড়ে বেড়ানো। কারো কারো অভিমত কোয়াসার অঞ্চলে শক্তির ধ্রুবকত্ব বা Conservation of energy ভেঙে যায়। কারো কারো মতে লাল সরণের যে ডপলারীয় ব্যাখ্যা দেওয়া হয় সেটি সঠিক নয়। কোয়াসার অতদূরে নেই, অত গতিতেও নেই। অথচ শক্তির ধ্রুবকত্ব আর ডপলারের নিয়ম মহাকাশে অন্যত্র দিব্যি খাটে। তাদের কোন যুবাদে নাকচ করা হবে? কোয়াসারের অনেক তথ্য সংগ্রহ হলেও প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। প্রশ্নরা থাকে কতদূরে থাকে কোয়াসার? কত তার বয়স? কত বড় আকার? কত তার গতি? এই রেডশিফট কেন? ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানীরা এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেন। যে তথ্য পাওয়া যায় তারা বর্তমানে প্রশ্নের উত্তর দিতে অক্ষম।

মহাবিশ্বের সব মেটার যে গেলাক্সিতে নেই তার প্রমাণ কোয়াসার। বিরাট গেলাক্সিদের মাঝের দূরত্বও বিরাট। তবুও গেলাক্সির অঞ্চল শূন্য নয়, এই অঞ্চলও মেটারে ভরা। 1969 সালের পরীক্ষায় জানা গেছে এইখানে হাইড্রোজেনের মেঘ দ্রুত ঘুরে বেড়ায়। এই মেঘ আমাদের গেলাক্সিতেও হাজির হয়; তারপর থেকেও যায়। প্রতিবছর এই অনুপ্রবেশের ফলে আমাদের গেলাক্সির মাস বেড়ে যায় হরে দরে বছরে তিন সৌরভর। এই মেঘের ডেনসিটি খুবই কম; আমাদের গেলাক্সির কাছে এই ডেনসিটি হলো মাত্র $3 \times 10^{-28} g/cm^3$; বিরাট কিছু নয়। তবু মহাবিশ্বের আকার আয়তনের সাপেক্ষে এই গ্যাস-মেঘের সম্মিলিত যে ভর পাওয়া যায় তাকে তুচ্ছ করা যায় না।

এ ছাড়া আছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রে। এই শতকে নিরীক্ষায় ধরা পড়ে বাইরে থেকে আমাদের পৃথিবীতে অতি উচ্চ শক্তিশালী চার্জযুক্ত এটমের নিউক্লিয়াস—প্রধানতঃ প্রোটন—অনবরত হাজির হচ্ছে। কোথা থেকে এরা আসে, কী যে উৎস—এটিও সঠিক জানা নেই। বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই কসমিক কণার শতকরা দশভাগ হলো সুপার নোভাজাতীয় তারকার ভস্মরেণু—যা লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাজগতে দিশেহারা হয়ে ভেসে বেড়ায়। কোনো কোনো কণা হয়তো আসে সূর্য থেকে, কোনো কোনোটা গেলাক্সি থেকে, কোনোটা আবার গেলাক্সির বাইরের। নানা ঠিকানার কণাদল অনবরত পৃথিবীর বুকে ভেসে আসে। তাদের যে মহাজাগতিক শূন্যতার অঞ্চলে দেখা যাবে না—এই কথা হলফ করে বলা যায় না। বরং মনে করা হয় আন্তর্গেলাক্সীয় অঞ্চলে এই কণারা আছে, আছে হাইড্রোজেন মেঘের সঙ্গে, একসাথে, পাশাপাশি—মিলেমিশে বা বিচ্ছিন্ন হয়ে। এরাও আছে।

তৃতীয় আরেক দলকে পাওয়া যায়। 1965 সালে বেল টেলিফোন কোম্পানির হোমডেল (Holmdel) লেবরেটারিতে একটি মাইক্রোওয়েভ রিসিভার পরীক্ষা করার সময় একটি বিকিরণ ধারা পাওয়া গেল—যা 2·7°K ব্ল্যাক বডি রেডিয়শন তরঙ্গের মত। রাতভর, দিনভর, অনবরত চারপাশ থেকে এই বিকিরণ ছুটে আসে। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা প্রথমে ভাবেন, এ বুঝি যন্ত্রের ত্রুটি—রিসিভারে গোলমাল আছে। তবু অন্যত্র, অন্য লেবরেটারিতেও এই তরঙ্গের চারপাশ থেকে অনবরত ছুটে হাজির দেবার উৎসাহ দেখা দেয়। এই বিকিরণ সত্য, এটিও আছে। আছে মহাবিশ্বের সব অঞ্চলে, সব সময়ে, সবখানে। এই যে বিকিরণ যা মোটামুটি ফোটনকণায় গড়া, তার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হলো এক মিলিমিটারের কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা এই বিকিরণের নাম দিলেন পশ্চাদ্‌পটের বিকিরণ অথবা Background Radiation। মহাবিশ্বের পটভূমির পশ্চাৎপটে সর্বত্র এই বিকিরণ আছে। কোথাও বুঝি শূন্যতা নেই। এই বিকিরণ নিয়েও প্রশ্ন, এটি কি? কী এর উৎস?

দুই

হাবলের পরীক্ষায় গেলাক্সিদের সরে যাওয়ার তথ্য থেকে বোঝা যায় এই বিশ্বলোক বর্ধমান। এটি স্থির নয়। আইনস্টাইনের সাধারণ তত্ত্বের সাপেক্ষে ফ্রীডমান বর্ধমান বিশ্বলোকের মডেল জানালেন। অন্যদিকে তত্ত্বটি থেকে জানা

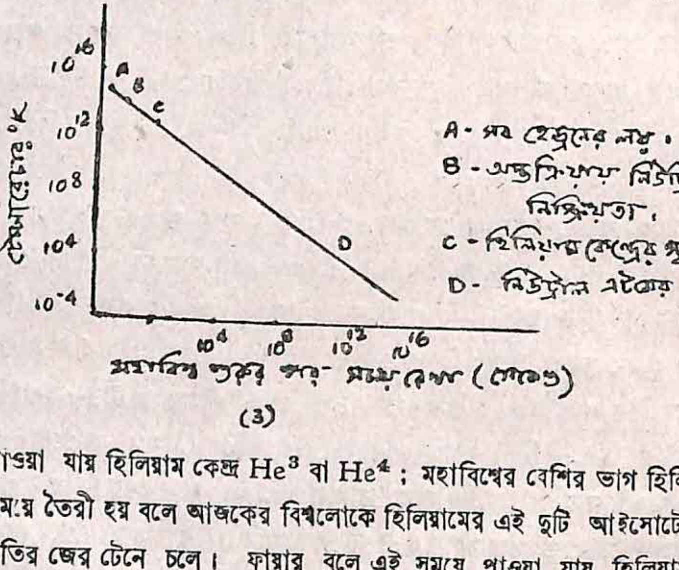
যায়, মহাবিশ্বের মেটারের ডেনসিটি বেশি হলে মহাকর্ষের সংকোচন ধারা এই বর্ধমান বিশ্বলোকের গতি থামাতে পারে; মহ বিশ্ব সঙ্কোচনের পথে যেতে পারে। ফ্রীডমানের মডেলে বিশ্বলোকের যে ডায়াগ্রাম—তাতে বর্তমানে শুধু বর্ধমানত্বই দেখা দেয়। যে ধারার পথে মহাবিশ্ব চলুক, বর্তমানের গতি সাপেক্ষে—তার একটি যাত্রা বিন্দু থাকবে। বিজ্ঞানীরা সেই আদিরূপটি পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। কী যে সেদিন ঘটেছিল তার কোনো হদিশ নেই। হয়তো তার স্মৃতি মহাকাশের খাতার পাতায় থাকতে পারে। থাকতে পারে আদিম সৃষ্টির ভাঙা কঙ্কাল অথবা ফসিলের মত কিছু চিহ্ন। এই ফিরে দেখা হয় সাধারণ তত্ত্ব আর কোয়ান্টাম ফিজিক্সের আলোক দিয়ে। এই দেখার জগতে অনেক থিয়োরির আবির্ভাব হয়। তার একটি, হট বিগ ব্যাঙ (Hot Big Bang) তত্ত্ব। নামটি বেশ ব্যঞ্জনাময় সন্দেহ নেই। আর এই থিয়োরিটি অনেক বিকল্পের প্রধানতম; এটি মোটামুটি গ্রহণীয়।

এই তত্ত্বের সাপেক্ষে ধরা হয় কোনো এক সময়ে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা—যাকে প্রাথমিক অগ্নিগোলক বা Primaeval fire ball বলা হয়—সেখান থেকে বিশ্বলোকের বর্ধমানত্ব শুরু। ঐ প্রাথমিক গোলকটি হল মৌলকণায় ভরা—ফোটন-লেপটন-হেড্রনরা তাদের বিপরীত কণাদের নিয়ে প্রচণ্ড আঁটি-সাঁট অবস্থায় ঐ গোলকটিতে জমা ছিল। ঐ কণারা ছিল বলে তাদের ইণ্টার-একশন বা অন্তর্ক্রিয়াটিও ছিল; ছিল কণায় কণায় ক্রিয়াকলাপ। ফলে অগ্নিগোলকটি বিস্ফোরণে ফেটে যায়। ফেটে ছড়িয়ে যায় বলে ঠাণ্ডা হতে শুরু করে। যত সময় যায়, যত বিস্তৃতি বাড়ে, তত মহাবিশ্ব শীতল হতে থাকে। প্রাথমিক অগ্নিগোলকের প্রচণ্ড তাপ কমে যেতে থাকে।

বিস্ফোরণের পর কী হয়? অনেক বিজ্ঞানী কী যে ঘটেছিল তার সময় ভিত্তিক বর্ণনা দিতে পারেন। সেই বর্ণনা পাওয়া যায় বিস্ফোরণের 10^{-43} Sec কাল অবধি। এই সময়ে কী যে ঘটে তার গাণিতিক গাথায় মন না দিয়ে যে অবস্থা থেকে চেনা-জানা ফিজিক্সের প্রয়োগ সম্ভব সেটি দেখা যাক—তা ঘটে 10^{-3} সেকেণ্ডে। ফায়ার বলে কণায় কণায়, বিপরীত কণায় ক্রিয়া ঘটে। হেড্রন আর মেসন, যাদের জীবনকাল সামান্য, তারা ক্ষয়ের ধারায় লোপ পায়। যাদের জীবনকাল স্থায়ী, যেমন ফোটন, প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন অথবা নিউট্রিনো আর তাদের বিপরীত কণারা টিঁকে যেতে পারে। এই সময়ে ফায়ার বলের টেম্পারেচার দাঁড়াতে পারে 10^{12} K-তে।

মোটামুটি 10^{-1} সেকেণ্ডে এই টেম্পারেচার কমে দাঁড়ায় 10^{11}K-তে, যখন ঐ তাপে নিউট্রিনো আর এন্টিনিউট্রিনো অন্ত কণার সঙ্গে ক্রিয়ার আর নামে না। তারা অবাধে ছড়িয়ে যেতে পারে। বিগব্যাঙ তত্ত্বের একটি প্রমাণ হলো মহাবিশ্বে এই স্বাধীন দুর্বার অবাধ নিউট্রিনোদের খুঁজে পাওয়া। তবু বর্তমানের টেকনোলজির সাহায্যে এই কাজটি সম্ভব হচ্ছে না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শক্তিতে ছড়িয়ে যাওয়া যেমন ঘটে, তেমনি ঘটে কণায় কণায় ক্রিয়া। ফায়ার বল ঠাণ্ডাও হতে থাকে। তিরিশ সেকেণ্ড পর টেম্পারেচার দাঁড়ায় 10^9K-তে। এই তাপে প্রোটন নিউট্রনের সংযোগ শুরু হয়।



(3)

পাওয়া যায় হিলিয়াম কেন্দ্র He^3 বা He^4 ; মহাবিশ্বের বেশির ভাগ হিলিয়াম এই সময়ে তৈরী হয় বলে আজকের বিশ্বলোকে হিলিয়ামের এই দুটি আইসোটোপ সেই স্মৃতির জের টেনে চলে। ফায়ার বলে এই সময়ে পাওয়া যায় হিলিয়াম কেন্দ্র, ইলেকট্রন, প্রোটন ও ফোটন কণা। নিউট্রিনোর উপস্থিতি থাকলেও তার কোনো ক্রিয়া নেই।

মৌলকণার ক্রিয়া কলাপে ফায়ার বলে আলোড়ন জেগে ওঠে। হাইড্রোজেনের কেন্দ্র মিলে-মিশে তৈরি করে ভারি মৌলের কেন্দ্র হিলিয়াম, লিথিয়াম, বেরিলিয়াম, বোরোন ইত্যাদি। চেনা-জানা ফিজিক্সের সাপেক্ষে জানা যায়, অন্তক্রিয়ার এই জগতে মৌলকণার সৃষ্টি আর তাদের সাম্য অবস্থাটি বজায় থাকে 5000°K টেম্পারেচার পর্যন্ত। এই শীতল অবস্থাটি আসতে পারে 10^{13} সেকেণ্ড পর অর্থাৎ হট বিগ ব্যাঙ-এর প্রায় এক লক্ষ বছর পর। প্রাথমিক বিস্ফোরণের তিরিশ সেকেণ্ড পর যার শুরু সেটি মোটামুটি স্থিতাবস্থার রূপ পায় 10^{13} সেকেণ্ড পর। এই সময়ে

প্লাজমা অবস্থার সূচনা। ভারি পরমাণুর কেন্দ্র তৈরী হতে থাকে ; বাদবাকি প্রোটন আর ইলেকট্রন মিলে তৈরী হয় চার্জহীন এটম। মহাবিশ্বের উপকরণের হিসেব-নিকেশ করে বর্তমানে জানা যায়, এখানে আছে প্রায় সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন, তিরিশ ভাগ হিলিয়াম আর অতি সামান্য অন্যান্য ভারি এটম। পিছনের হট বিগ ব্যাঙ বিস্ফোরণের পর 10^{13} সেকেণ্ড কাল পর্যন্ত যে হারে উপকরণ তৈরী হতে পারে তার সঙ্গে এই তালিকার মিল টানা যায়।

চার্জকণারা মিলে-মিশে এটম তৈরি করতে পারে বলে ফোটন কণারা অবাঞ্ছিত ও কিছুটা অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ে। 10^{-1} সেকেণ্ডে নিউট্রিনো কণারা যেমন অবাধে ছড়িয়ে গেছে, এই ফোটন কণাদেরও সেই অবস্থা ঘটে। তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। যতদিন যায় তাদের তাপ কমে, শক্তি কমে। 3000°K-তে যে-ফোটন কণা ছন্নছাড়া হয়ে বেড়িয়ে পরে সেই যাযাবর ফোটন বিকিরণ আজকেও টিকে থাকতে পারে ; তারা থাকবে অতি শীতল বিকিরণ ধারায়। যদি ধরা যায় বিগ ব্যাঙ ঘটে দশ থেকে বিশ বিলিয়ন বছর আগে অথবা প্রায় 10^{18} সেকেণ্ড আগে, তবে এই ফোটন কণার টেম্পারেচার হবে 3°K-এর মত। 196 সালে যে ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন পাওয়া গিয়েছিল সেটি 2·7K ব্ল্যাকবডি রেডিয়েশনের মত।

বিগ ব্যাঙ থিয়োরি সাপেক্ষে ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন-এর ব্যাখ্যা খোঁজা যায়। ব্যাখ্যা পাওয়া যায় মহাবিশ্বের বর্ধমানত্বের এবং মহাজগতে নানা এলিমেন্টের আনুপাতিক উপস্থিতির। আর জানা যায়, বিগ ব্যাঙের কাল আজ থেকে দশ বিশ বিলিয়ন বছর আগে ; এর আগে নয়। এটিই মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন। বিগ ব্যাঙের 10^5 বছর পরের স্মৃতি বয়ে নিয়ে বেড়ায় ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। তার আগে যা ঘটেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ফোটন কণা দিতে পারে না। মহাবিশ্ব তার আগে আলোর কাছে অস্বচ্ছ ছিল, ওপেক ছিল। এর আগের ঘটনার প্রমাণ পরোক্ষে পাওয়া যাবে। জানাতে পারে নিউট্রিনো।

মহাবিশ্বে মেটাররা সর্বত্র সুছাঁদে ছড়িয়ে আছে। এই বিশ্ব আইসোট্রোপিক— হোমোজিনাস, বুনোটে অবস্থানে সমান। এই ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন চারদিক থেকে অনবরত হাজির হয়। তাদের এই সমাবস্থানিক উপস্থিতিটি জানায় 10^5 বছরে মহাবিশ্বটির আইসোট্রোপিকত্বে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা শতকরা 0·1 ভাগ মাত্র। প্রাথমিক বুনটটিতে সমানত্ব থাকায় নকশা ফোটানোতে সমানত্ব বোধ জাগে। তবু প্রশ্ন তোলা যায় মহাবিশ্বের সব মেটার, যা সেই সময়ে মোটামুটি সমান ভাবে ছড়িয়ে ছিল, তারা কি করে এদিকে-সেদিকে গেলাক্সির নক্সা তৈরী করে?

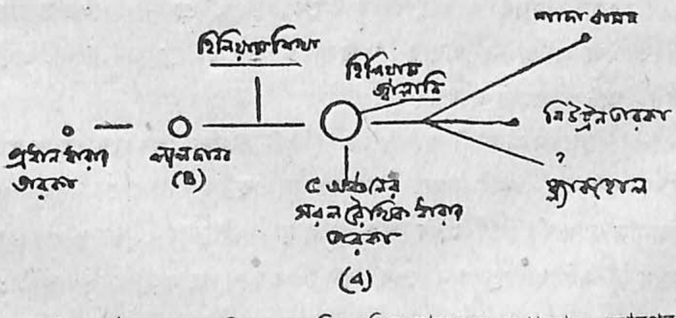
প্লাজমা অবস্থায় মেটারের বণ্টন, পরিবেশন অথবা ডিষ্ট্রিবিউশন মোটামুটি সুবিন্যস্ত ছিল। এই অবস্থায় চার্জযুক্ত কণার সঙ্গে ছিল ফোটন। স্বাভাবিকভাবে ফোটন আর মৌলকণায় ইন্টারএকশন ঘটে গেছে। গণিতের ছকে জানা যায় ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশনটি সেদিনের ফায়ার বলে ডালের কাঁটার মত ঘাঁটাঘুঁটির কাজ করে গেছে—আর মেটার বা পার্টিকলরা সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে থেকেছে। ফায়ার বল শীতল হয়ে 3000°K-তে নামলে এটমের সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়ে যায় আর ঘোঁটার কাঁটাটির কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে। ফোটন কাজপাট শেষ করে ভবঘুরের মত বেড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে শুরু হয় এটমের এলোমেলো ছুটোছুটি। এই অবস্থায় কোথাও একগুচ্ছ এটম ঘন হয়ে দাঁড়াতে পারে। গণিতের ধারায় জানা যায় যে, এই ঘন অবস্থাটি চারপাশের অঞ্চলের ডেনসিটি থেকে শতকরা মাত্র এক ভাগ যদি বেশি হয়, তবে মহাকর্ষশক্তি অন্যান্য অঞ্চলের কণাদের এইখানে টেনে আনতে পারে; জমাটি অবস্থার সূচনা ঘটে। অন্যদিকে ফায়ার বলের নিজস্ব নড়াচড়া, আলোড়ন ইত্যাদি এটমের জমাট হয়ে দাঁড়ানোর বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ফায়ার বলের প্রচণ্ড বর্ধমান গতির প্রবাহে এটমে গড়া জমাট ছোট ছোট দ্বীপ ঘূর্ণি জাগিয়ে তোলে; চারপাশের গ্যাসে ভাঙনের ঢেউ জাগে; এদের ক্রিয়ায় প্রাথমিক ঘন অবস্থানগুলি বার বার ভেঙে যায়। আবার গ্যাস যেহেতু ভিসকাস, তাই ভাঙনের ঢেউয়ে সব এটম ভেসে যায় না। কোথাও ছোট-খাট বেশি ডেনসিটির সুনির্দিষ্ট আকারের অঞ্চল উঁকি দিতে পারে। এরা সংখ্যায় হয়তো সামান্য; তবু বাধা পেরিয়ে টিকে যায়। এদেরই কেন্দ্র করে মহাকর্ষ ক্রিয়ায় মহাজাগতিক প্রাথমিক বস্তু গড়ে ওঠে। এইসব প্রাথমিক অঞ্চলগুলি ঝাড়াই-বাছাই ভাঙনের ফলে নির্দিষ্ট আকারের হয় বলে, এখানে যে বস্তু গড়ে ওঠে তাদের আকারেও মোটামুটি নির্দিষ্টতা থাকে। গণিতের নিয়মে সামান্য তথ্যের সাহায্যে এখানে যে সব আকারের সম্ভাবনা দেখা দেয়, তার একটি হলো 10^{12} সৌরভরের। বিশাল গেলাক্সির যে মাস জানা যায় তার মাসও 10^{12} সৌরভরের সমান। আরো বড় ভরের আকার সম্ভাবনা সূত্রে পাওয়া যায়। হয়তো এদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে গেলাক্সির গুচ্ছ আর ছোট ভর থেকে হয়তো তারকা গুচ্ছ (Star cluster)।

গেলাক্সির সৃষ্টি মহাবিশ্ব সৃষ্টির কাছাকাছি সময়ে। সব গেলাক্সির বিবর্তনের ধারা একটি জায়গায় শেষ হয়—সেটি মহাবিশ্বের বিরাট গ্যাসের মেঘে। এই গ্যাস মেঘ এখনও আছে। যদি গেলাক্সির সৃষ্টি আগের বর্ণনামত হয়েছে বলে ধরা হয়, তবে ঐ মেঘ থেকে বর্তমানেও গেলাক্সি সৃষ্টি হতে পারে। এই সৃষ্টি কেউ

আটকাতে পারে না। তবু এরা কেন ঘুরপাক খায়, এদের বিবর্তনের সম্পূর্ণ পথটি কি, কেন তারা নির্দিষ্ট আকারের—সেই সব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। সৃষ্টির প্রাথমিকতার হদিশটুকু শুধু তথ্যতত্ত্বের আলোকের ইশারায় জানানো যায়। সামান্য ক্লু, হলো ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন।

ফিজিক্সের তত্ত্ব জানায় যে, মহাবিশ্বলোকে মহাজাগতিক বস্তুদের বিন্যাসের জটিলতার কারণের কর্তৃকারকে থাকে, কণাদের মধ্যে যে অন্তর্ক্রিয়া শক্তি কাজ করে—তারা। 10^{-3} সেকেণ্ড পর্যন্ত যে ফোর্স কাজ করে তা নিউক্লিয়ার ফোর্স। আর তারপর উইক ফোর্স এক সেকেণ্ড পর্যন্ত কাজে নামে যেমন হেড্রনদের ক্ষয় হয়। তারপর 10^{13} সেকেণ্ড কাল পর্যন্ত কাজ করে কুলম্ব ফোর্স, তৈরী হয় চার্জহীন এটম। তারপর থেকে কাজে নামে মহাকর্ষ। প্লাজমা অবস্থার পর থেকে মহাজগতে যে ফোর্সটি প্রাধান্য বজায় রেখে এসেছে—সেটিই মহাকর্ষ। অতএব জটিলতার মুখ্য দায়-দায়িত্ব এই ফোর্সের। তার আগে মেটারের বিন্যাসে যে সুষম ছিল, তার প্রমাণ ব্যাক গ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। মহাকর্ষ শক্তি মহাবিশ্বলোকের নাটকের মুখ্য ভূমিকায় নামার পর ফোটনকণা আর অন্তক্রিয়ায় বিশেষ অংশ নেয়নি। নিজেদের সমবন্টন রীতিটি বজায় রেখে সর্বত্র সমানভাবে ছুটে চলেছে সে।

তিন



(৪)

গেলাক্সির সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিগ ব্যাঙ থিয়োরির সাপেক্ষে দেখা যায়। তারপর প্রশ্ন ওঠে গেলাক্সির মধ্যেকার তারকার সৃষ্টি কোন্ পথে হলো? গ্যাসের মেঘের যে ধারায় গেলাক্সির সৃষ্টি সেইখানে কয়েক কোটি মিলিয়ন এটমের নিউক্লিয়াস সহসা কেন জমাট বেঁধে তারকা সৃষ্টি করে? এখানেও বিজ্ঞানীরা একটি অনুমিতি মোটামুটি গ্রহণ করেছেন। যে নিউক্লিয়াসটি তারকার সৃষ্টিতে নামে সেটি একটি ভারি পরমাণু অথবা অণু। টেম্পারেচার কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

সিলিকন আর অক্সিজেন এটম সংযোগী হয়ে এবং হয়তো-বা অন্য এটমদের টেনে নিয়েও, সিলিকেট অণু তৈরী হয়। এই জাতীয় অণুর চারিদিকে হাইড্রোজেন-হিলিয়াম মেঘ জমাট বাঁধতে থাকে। একবার যদি একটি ঘনসন্নিবদ্ধ অঞ্চল বা নিউক্লিয়াস তৈরী হয়, তারপর মহাকর্ষ কাজে নামে। অন্য এটমদের টেনে নিউক্লিয়াসের চারিপাশে হাজির করে মহাকর্ষ। এটি সম্ভব—কারণ, এটমরা চার্জহীন। তাদের টেনে এনে জমাট করতে মহাকর্ষ পারে। এরপর থেকে মহাজাগতিক বস্তু জগতে যে ফোর্স কাজ করে তা মূলতঃ মহাকর্ষ।

এই প্রাথমিক তারকা হলো গ্যাসের ঘন সন্নিবদ্ধ অঞ্চল। এই এটমের গ্যাসের জগতে মহাকর্ষ কাজ করে। তার টানে সব এটম কেন্দ্রমুখী হয়। এইখানে প্রচণ্ড আকর্ষণে গ্যাসের অণু যখন সঙ্কুচিত হতে থাকে তখন মহাকর্ষ শক্তির বদলে পাওয়া যায় রূপান্তরিত তাপশক্তি। গ্যাসের মেঘ উত্তপ্ত হতে থাকে—সেই তাপ বাড়তে বাড়তে দাঁড়ায় 10^7 Kতে। এই টেম্পারেচার ও প্রয়োজনীয় ডেনসিটিতে হাইড্রোজেন গ্যাসের ফিউসন ঘটে। কেন্দ্রের দহন (Nuclear Burning) পদ্ধতির ফলে হাইড্রোজেন থেকে পাওয়া যায় হিলিয়াম। তারকার প্রাথমিক অবস্থায় গ্যাসে, নিদেন পক্ষে সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন ছিল। এরাই ফিউসানে নামে। ফিউসানে পাওয়া তাপের ফলে গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে বাইরে যেতে চায়—আর মহাকর্ষ চায় তাকে ধরে বেঁধে কেন্দ্রমুখী করতে। দুটি ক্রিয়া শেষমেশ একটি সমতা মেনে নেয়। তারকাটি একটি নির্দিষ্ট আকার বজায় রাখে। হার্টস্প্রুঙ-রাসেলের ডায়াগ্রামে মেন সিকোয়েন্স বা প্রধান ধারার তারকাতে এই হাইড্রোজেন দহনক্রিয়া ঘটে চলেছে। ঘটে আমাদের সূর্যেও।

এই হাইড্রোজেন জ্বালানী অফুরন্ত নয়। এটি একদিন শেষ হয়ে যেতে পারে। আমাদের সূর্য যে একটি নক্ষত্র—ধরা হয় তার সৃষ্টির কাল থেকে বর্তমান সময়ে তার জ্বালানীর অর্ধেক সে নিঃশেষ করে ফেলেছে—হাইড্রোজেন রূপান্তরিত হয়েছে হিলিয়ামে। সব হাইড্রোজেন শেষ হলে কি হয়? জ্বালানী নেই নিউক্লিয়ার বার্নিং বা কেন্দ্রদহন নেই, অতএব তাপ নেই বলে মহাকর্ষের বিপরীত শক্তি নেই। মহাকর্ষ বাধাহীন আকর্ষণে হিলিয়াম গ্যাসকে কেন্দ্রে টেনে নিতে চাইবে। যদি মূল তারকাটির মাস বেশি হয় তবে মাসের সঙ্কোচনের ফলে আবার তাপ পাওয়া যাবে। গ্যাস উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। যখন তাপ দাঁড়ায় 10^8K টেম্পারেচারে তখন হিলিয়াম নিউক্লিয়াস ফিউসনে নামে। হিলিয়ামের দহনে উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে যেতে চাইবে। আগের মত আবার তারকাটির একটি স্থিতি দেখা দেয়। তারকা তার একটি নতুন

আকার বজায় রাখে। রাখে হিলিয়ামকে জ্বালানী ধরে। হিলিয়ামও নিঃশেষ হবে একদিন। সেদিন যদি তারকাটির ভর বেশি হয়, তবে সঙ্কোচনের ধারায়, তাপের আবির্ভাবে আবার নতুন একটি জ্বালানী ফিউসনে নামে—সেটি কার্বন! এইভাবে মূল তারকাটি বিরাট ভরের হলে তারকাটি তার জ্বালানী বদলে নিয়ে দহন ক্রিয়ায় নেমে একটি আকার বজায় রেখে চলতে পারে। শেষমেশ আইরন আইসোটোপ Fe^{56} কে পুড়িয়ে তারকাটি কেন্দ্র দহনে ক্ষান্ত হয়। কারণ Fe^{56} হলো সব চেয়ে ভারি কেন্দ্র, যে ফিউসনে নেমে তাপ ঢালতে পারে। সব ঘটনাই এই শৃঙ্খল ধারায় ঘটতে পারে যদি মূল তারকাটির ভর সৌরভরের চেয়ে অনেক বেশি হয়।

যদি ভর বেশি না হয়? ধরা যাক, মূল তারকার ভর হলো সূর্যের ভরের এক দশমাংশ। এই তারকার হাইড্রোজেন জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে মহাকর্ষের টানে সঙ্কোচনের পথে গ্যাস চলবে। তবে তারকাটির মাস বা ভর বেশি নয় বলে, মহাকর্ষ টান প্রচণ্ড হতে পারে না। সঙ্কোচনের পথে যেতে যেতে তারকাটি এক জায়গায় থমকে দাঁড়ায়। কারণ, ইলেকট্রনের বিকর্ষণ ফোর্স -যেটি বৈদ্যুতিক— সেটি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি ছোট তারকা, অতএব জ্বালানীর শেষে আরো ছোট আকারে স্থায়ী হয়ে ধীরে ধীরে জমানো তাপ হারিয়ে শীতল হতে থাকে। সবশেষে একটি ঠাণ্ডা কঠিন বস্তুর রূপ নিয়ে মহাকাশে থেকে যায়। তার তাপ নেই, বিকিরণ নেই বলে মৃত তারকা অদৃশ্য থেকে যাবে। তারকাটি যদি আরো ছোট হতো, ভর যদি সৌরভরের এক দশমাংশেরও কম হতো— তবে মহাকর্ষ শক্তির রূপান্তরে যে তাপ এখানে পাওয়া যেত, তা ফিউসন পদ্ধতির পক্ষে যথেষ্ট নয় বলে জ্বালানী নিয়েও তারকাটি দহনে নামে না। সে তারকা গ্যাসের পিণ্ড হয়ে থাকবে। গ্যাসের মেঘ যেহেতু উজ্জ্বল নয়, সেই তারকা আমাদের কাছে অদৃশ্য হয়ে থাকবে।

ছোট বা বড় তারকার শেষ কী হতে পারে তার হিসেব টানা যায়। যে তারা মাঝারি, তার ভাগ্য বিচারের চেষ্টা চলে। তারকাটির ভর যদি সৌরভরের সমান হয় তবে তার জ্বলন দহন ক্রিয়াটি জটিল। এখানে জ্বালানীর অত ধাপ নেই। ভর বেশি নয় বলে হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে গেলে সঙ্কোচনের ধারায় যে তাপ পাওয়া যায়, তা হিলিয়ামকে সোজাসুজি জ্বালানীরূপে ব্যবহার করতে পারে না। সঙ্কোচনের পথে কেন্দ্রে 10^8K তাপ হয় না। ধরা যাক, কেন্দ্রে হাইড্রোজেন দহন নিঃশেষ হয়ে গেছে অথচ কেন্দ্র বা core এর চারপাশের খোলে

(Shell) তখনো ঐ হাইড্রোজেন পুড়ছে। এর ফলে কেন্দ্রে 10^8K তাপ তৈরি হতে পারে। ফলে এখানে হিলিয়াম ফিউসন শুরু হবে। অথচ এই তাপ যেহেতু সর্বত্র সমান নেই, দহনটি সহজ সরল প্রক্রিয়া নয় ; এই অবস্থায় হিলিয়ামের দহন বিস্ফোরক অবস্থার সৃষ্টি করে—তারকাটি বিস্ফোরণে ফেটে গিয়ে গেলাক্সিতে গ্যাসের মেঘ ছুঁড়ে ফেলে। লালদানব বা Red Giant তারকাতে এই হিলিয়াম-ঝলক বা Helium flash দেখা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ভাবে দহন ক্রিয়া হয় বলে এই তারকার সার্ফেস টেম্পারেচার কম, অথচ হিলিয়াম দহনের জন্য লুমিনোসিটি বা দীপ্তি বেশি। হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ডায়াগ্রামে এই তারকারা আছে B অঞ্চলে। এরা লালদানব তারকা। মূল ধারার তারকায় যেখানে কেন্দ্রে বা কোরে (core) হাইড্রোজেন দহন চলে, এই তারকার অন্দরে অথবা কোরে মাঝে মাঝে হিলিয়ামের দহন আর কোরের চারপাশে শেলে হাইড্রোজেন তখনো পুড়ে চলেছে আর দানব তারকা ড্রাগনের জিভের লেলিহান কম্পন দিয়ে গেলাক্সিতে উজ্জ্বল হিলিয়াম গ্যাস ঢেলে যায়। হার্ৎসপ্রুঙ্গ-রাসেলের ছকের A-B অঞ্চলের তারকাদের পরিচয় জানা যায়। লালদানব নক্ষত্রে যত দহন চলে, হিলিয়াম গ্যাস যত বেরিয়ে আসে, তখন মোটামুটি তাপের সমতা দেখা দেয়, কেন্দ্রে-কোরে হিলিয়াম দহন শুরু হয়। এই জাতীয় তারকারা আছে হার্ৎসপ্রুঙ্গ রাসেলের ছকের ‘C’ অঞ্চলে। সেখানে জ্বালানী হিসেবে হিলিয়ামের ব্যবহার। দহন যত চলে তারকার মাস তত কমে আসে, তবু হিলিয়ামের দহনের জন্য তাপ থাকে 10^8K। এই প্রচণ্ড তাপের জন্য আপেক্ষিক ভাবে মনে হয় দীপ্তি যেন বেড়ে যায় ; আর বাড়ে তাপের চাপে তারকার স্ফীতি। তারকাটি ফুলে ফেঁপে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। হিলিয়াম জ্বালানী দহনের গরবে গরবিনী এই তারকার দল!

সব হিলিয়াম নিঃশেষ হলে তারকাটির কি অবস্থা হতে পারে সেটি নির্ভর করে তারকাটির মাসের উপর। যেমন সোজাসুজি হাইড্রোজেন থেকে হিলিয়ামকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহারটিও মূল তারকাটির ভরের উপর নির্ভরশীল। হিলিয়ামের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেলে তার ভবিষ্যৎটিও ঐ ভর বা মাস ঠিক করে দেয়। এখানে তিনটি সম্ভাবনা। তারকাটির ভর যদি সৌরভরের চারগুণের চেয়ে কম হয় তবে দহন ক্রিয়া শেষ হলে বৈদ্যুতিক বিকর্ষণকে মেনে নিয়ে মহাকর্ষের আকর্ষণ তারকাটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারে দাঁড় করাবে। ছোট আকারে ধীরে ধীরে ঘটবে তারকাটির শীতল মৃত্যু। শাদা বামন তারকা বা White Dwarf তারকার ক্ষেত্রে এই ভবিষ্যৎই লেখা।

যদি মূল তারকাটির ভর চার থেকে আট সৌরভরের সমান হয়, তবে মহাকর্ষের সঙ্কোচনে কার্বনের জ্বালানী হয়ে ফিউসনে নামা সম্ভব। এখানেও মেটারের ডেনসিটি বা ভরের সাপেক্ষে হিলিয়াম বিস্ফোরণের মত অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। তাই যদি হয় তবে তারকাটি সম্পূর্ণ ফেটে বিরাট অঞ্চলে গ্যাসের কুণ্ডলী ছড়িয়ে রয়ে যায়। অর্থাৎ সুপার নোভার ক্ষেত্রে যা দেখা যায় তার উৎস হলো অনিয়ন্ত্রিত কার্বন জ্বালানীর দহন। আবার রেড জায়েন্ট তারকার মত এই তারকাও আংশিকভাবে তার কনটেণ্ট (content), তার আধেয়দের হারাতে পারে, তবু তার কেন্দ্র, তার কোরটি বহাল থাকতে পারে। এই কোরটি যদি যথেষ্ট বড় আর ভারী হয় তবে মহাকর্ষের সঙ্কোচনের ধারা বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তিকে টপকে সব গ্যাসকে কেন্দ্রে এমন টেনে আনে যে, সব পদার্থ ঘেঁতো হয়ে জমা হয়। এখানে কোরে ইলেকট্রন প্রোটন সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে নিউট্রন। এই বিক্রিয়ার আখেরি ফল হলো তারকাটি সম্পূর্ণ নিউট্রনে তৈরী হতে পারে। নিউট্রন তারকা একটি অদ্ভুত অথবা অস্বাভাবিক নক্ষত্র। আকারে এটি ছোট; মাত্র 10 কিলোমিটার ব্যাসের তারকা। অথচ এর ভর হবে পার্থিব ভরের কয়েক হাজার গুণ বেশি। শুধু নিউট্রনে তৈরি বলে নিউক্লিয়াসে ডেনসিটি পাওয়া যায় $10^5 kgm^{-3}$। 1930 সালে জ্যোতিবিজ্ঞানীরা এই তারার ভবিষ্যদ্বক্তি করেছিলেন। তারপর 1968 সালে পালসার নক্ষত্রের আবিষ্কার হলো। এই ছোট্ট তারা, ভারি ভরের তারকা, এটি কি নিউট্রন তারকা? যেটি ঘুরছে, চার পাশের প্লাজমা ক্ষেত্রে তার নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে, ফলে পাওয়া যায় তড়িৎ চুম্বক বিকিরণ। দূরের দর্শকের কাছে, তার অর্ধ-আবর্তনের সময়ের সাপেক্ষে বিকিরণের ধুকপুকুনি ধরা দেয়; মনে হয় তারকাটির বিকিরণ নিরবচ্ছিন্ন নয়, এখানে নির্দিষ্ট সময় অন্তর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পালসার তারকা যে নিউট্রন নক্ষত্র হতে পারে—সেটি বিজ্ঞান জগতের সম্মতি পায়। গণিতের ছকে গড়ে তোলা একটি বস্তুর প্রাগুক্তি মহাকাশে খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় বিজ্ঞানীর হাতে গড়া মহাকর্ষতত্ত্বের একটি প্রমাণ।

চার থেকে আট সৌরভরের তারকার ক্ষেত্রে জ্বালানীদহনের পথে মূল তারকার নিউট্রন তারকা হবার সম্ভাবনা থাকে। যদি মূল তারকাটি আরো ভারি হয়? যদি হয় আট সৌরভর বা তার চেয়েও ভারি? এ জাতীয় ভারি তারা মহাকাশে আছে। তাদের দহন শৃঙ্খলের পারম্পর্য বজায় রেখে শেষ জ্বালানী Fe^{56} পুড়িয়ে তারা দহন ক্রিয়া শেষ করে। তারপর শুরু হয় মহাকর্ষ শক্তির আকর্ষণ। এইখানে

কী যে ঘটে তা সঠিকভাবে বলা যায় না। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণ শক্তি—যা এখানে পাওয়া যেতে পারে, সেটি মহাকর্ষের সঙ্কোচন ধারাকে ব্যাহত করতে পারে না। চেনা-জানা ফিজিক্সের নিয়মকানুন এখানে খাটে না। এমন কোনো ফিজিকেল এফেক্ট জানা নেই, যা এই সর্বাত্মক ধ্বংসকে থামাতে পারে। সঙ্কোচনের পথে যেতে যেতে তারকাটি একটি বিন্দুমাত্রিক অবস্থানে শেষ হয়। একটি ব্ল্যাক হোল পাওয়া যায়। ব্লাক হোল নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন এবং করছেন। তাঁর স্বভাব-চরিত্র-গুণ-ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। ব্লাকহোল এক অদ্ভুত-কিম্ভূত জাতীয় বস্তু। এর অস্তিত্ব কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তর সহজে দেয়া যায় না। ব্লাকহোলের অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই; প্রমাণ থাকতেও পারে না। কারণ ব্ল্যাকহোলের গুণধর্ম বিশ্লেষণ করে জানা যায় এটির মহাকর্ষশক্তি এতো প্রচণ্ড যে, কোনো কিছু এর কাছে এলে সেটিকে এটি আকর্ষণের লম্বা হাতে গহ্বরে টেনে নেয়; সেই বস্তু চিরকালের মত অদৃশ্য হয়। অন্যদিকে ব্লাকহোলের আকর্ষণ ছেড়ে কোনো কিছু বেরুতে পারে না বলে তার খবর এজেন্ট মারফতও জানা যায় না। এমন কি ফোটনকণা—আলোক—এটির টানে আটকা পড়ে। আলোর ফোটনকণা বেরুতে পারে না বলে ব্লাকহোল থেকে বিকিরণ পাওয়া যায় না। কোনো ফোটন-কণার বিকিরণ সেখানে পাঠালে তার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ব্লাকহোলে আলোর প্রতিফলন নেই। সব মিলিয়ে বোঝা যায় দিশারী আলোর সাহায্যে ব্ল্যাকহোলের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবু এর প্রচণ্ড মহাকর্ষক্ষেত্র কাছাকাছি বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে—তাদের মহাকর্ষক্ষেত্রের স্বাভাবিকতা ভেঙে দিতে পারে। কাছাকাছি নক্ষত্রের দৈনন্দিন শৃঙ্খলিত ব্যবহারে ব্ল্যাকহোলের প্রভাব বিশৃঙ্খলা আনতে পারে, বিন্যাসের সুষমাটি ভেঙে দিতে পারে। গণিতের রীতিতে দেখা যায় ঐ অসাধারণ মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবটি কাছের নক্ষত্রের আচার ব্যবহারের অস্থিরতা থেকে ধরা যায়। নক্ষত্র জগতের অস্থিরতা খুঁজে ব্ল্যাকহোলের কূলভাঙা আকর্ষণের প্রভাব চিনতে চেষ্টা করেন বিজ্ঞানীরা।

চার

মহাকাশে আছে নক্ষত্র, যাদের গোত্র আলাদা। তারা কেউ প্রধানধারার তারকা, কেউ বা লালদানব, কেউ শাদা বামন এবং অন্য কেউ পালসার। বিভিন্ন গোত্রের নক্ষত্ররা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে তৈরী করে গেলাক্সি। গেলাক্সিরাও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে

তৈরি করে সুপার গেলাক্সি। সুপার গেলাক্সিরাও এককেটি অঞ্চলে কায়েমি হয়ে থাকে ; তৈরী হয় মহাসভার মত সুপার গেলাক্সিগুচ্ছ। যেন এই পৃথিবীর রাষ্ট্র সম্মেলনের আদরাটি মহাবিশ্বে থেকে গেছে। সারা মহাজগতে—গেলাক্সির মধ্যে বা বাইরে আছে গ্যাসের মেঘ। আর আছে কসমিক বিকিরণ এবং ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। সব নিয়ে মহাবিশ্ব।

এরা আছে—পরীক্ষায় নিরীক্ষায় জানা যায়। তবু এদের বুঝতে গেলে অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়।—সেই অনুমানটি মহাকাশ তথ্যের সাহায্যে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে প্রমাণিত করার চেষ্টা বিজ্ঞানীদের। ফিজিক্সের যে আইনকানুন আমাদের জগতের সামান্য টেম্পারেচার ও ডেনসিটির সাহায্যে জানা গেছে, অনুমান করা হচ্ছে তারা মহাকাশের বিরাট টেম্পারেচার আর ডেনসিটির জগতে, মহাজাগতিক বস্তুতে খাটে। এই অনুমানের ভিত্তি হলো পালসার, শাদা বামন

ভর (সৌর একক)	প্রাথমিক অবস্থা	পরবর্তী অবস্থা (১)	পরবর্তী অবস্থা (২)	পরবর্তী অবস্থা (3)
8/100 এর ছোট	গ্যাসের ভরা অদৃশ্য	-	-	-
1/10	প্রধান ধারার নক্ষত্র	শীতল মৃত্যু	-	-
1	ঐ	হিলিয়াম শিখা	শীতল মৃত্যু	-
4 এর ছোট	ঐ	লালদানব B-অঞ্চলের তারকা	শীতল মৃত্যু অথবা	C-অঞ্চলের তারকা শাদা বামন তারকা
4~8	ঐ	C অঞ্চলের তারকা	(i) নোভা (ii) সুপারনোভা (iii)	নিউট্রন তারকা ব্ল্যাক হোল
8 এর বেশি	ঐ			ঐ

নক্ষত্রের জীবনশৃঙ্খল

(৩)

লালদানব নক্ষত্র সম্বন্ধে প্রাগুক্তি পরবর্তী কালে পরীক্ষায়-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। হয়তো এই প্রমাণ আংশিক, কারণ এদের কাছাকাছি গিয়ে লেবরেটারিতে এদের নিয়ে পরীক্ষা সম্ভব নয়। তবু আংশিক প্রমাণ জানায়, এই জগতের ফিজিক্সের আইন মহাজগতেও খাটে। তবুও প্রশ্ন থাকে—এখানে এই আইনকানুনের কি সীমানা আছে? সীমাবদ্ধতা আছে? কাছাকাছি মহাজাগতিক বস্তুর পরীক্ষায়

বিজ্ঞানের তত্ত্ব সপ্রতিভভাবে এগিয়ে আসতে পারে। দূরের জগতে—বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে—এই তত্ত্ব যে সম্পূর্ণ সেখানে সন্দেহ থাকে। দূরের জগতের বর্ণনায় বিজ্ঞান যেন বর্ণনামূলক, গাণিতিক। যা দেখা যায়, যে তথ্য সংগৃহীত হয় তাদের তাত্ত্বিক ছকে আনা হয়, আর বলা হয় কী পাওয়া যেতে পারে। পরীক্ষার ফলাফল বলা হয় না। বলা হয় অনুসন্ধানের কথা, তথ্য সংগ্রহের কথা।

বিরাট মহাবিশ্ব জানাটি একটি বিরাট সমস্যা। অথচ মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সীমাবদ্ধতা আছে। আছে যন্ত্রের দক্ষতা। তবু মহাজগতের সৃষ্টির প্রাথমিকত্বটুকু বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে প্রকাশ পায়; তার প্রমাণ ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। ফায়ার বল থেকে মৌলকণার আবির্ভাবটির প্রমাণ বর্তমানে থাকতে পারে না। সেই কালের স্মৃতি-শ্রুতি সবই হারিয়ে গেছে। শুধু জানা যায় এই মৌলকণা থেকে এটমের সৃষ্টি। আর এটম হাজির হলে দেখা দেয় মহাকর্ষ শক্তি—গ্রেভিটেশন। মহাকর্ষ শক্তির ফলে গেলাক্সি বা নক্ষত্রের সৃষ্টি। এই নক্ষত্রের জীবনশৃঙ্খল বর্ণনা করা যায়। এখানে কাজ করে তাদের ভর, তাদের মাস; যেটি নির্দেশ করে তারকার অন্ত্য রূপান্তর—শাদা বামন, লালদানব অথবা পালসার এবং হয়তো ব্ল্যাকহোল। অনুমিতির সাহায্যে পার্থিব ফিজিক্সের নিয়মে এদের বর্ণনা করা যায়। এরা অবর্ণনীয় নয়।

তবু মহাজগতের যেটুকু বর্ণনা দেওয়া যায়, যেটুকু প্রমাণভিত্তিক তথ্য প্রতিষ্ঠা করা যায় তারা যৎসামান্য। মহাজগতের অতি সামান্য অঞ্চলে বিজ্ঞানী দৃষ্টি দিতে পেরেছেন, অতি সামান্য অঞ্চলে সুনির্দিষ্টভাবে পা ফেলেছেন। আর পেয়েছেন প্রশ্ন, অজস্র প্রশ্ন। একটি সংশয়—যা লেবরেটারিতে পাওয়া যায়, সেই একই ধাপ মহাজগতে ঘটে চলে কি? যেমন হাইড্রোজেনের ফিউসন ধরায় যখন হিলিয়াম পাওয়া যায়, তখন হাজির হয় নিউট্রিনো। সূর্যের বুকে কেন্দ্র দহনের কালে নিউট্রিনোর উদয় হয়। তাদের কিছু অংশ বিকিরণের পথে এই পৃথিবীতে হাজির হওয়ার কথা। অথচ যতটা নিউট্রিনো পাবার কথা, ততটা পাওয়া যায় না। অতি নিখুঁত অনুসন্ধানের পরও গণিতে পাওয়া প্রাগুক্তি আর ফলাফলে ত্রুটি থেকে যায়। কেন এই ত্রুটি? ভুল কি গণিতে, যন্ত্রে, অথবা তত্ত্বে?…জানা নেই।

পালসারের বিকিরণের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ জানা যায়, সময়ের অন্তরটি তত্ত্বের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তবু 1969 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ক্র্যাব নেবুলার পালসারের পালসের ফ্রিকোয়েন্সি সহসা কেন বেড়ে যায়?…জানা নেই।

তা ছাড়া কোয়াসার কি? রেডশিফট যেভাবে ব্যাখ্যা দেয়া হয়, সেকি সঠিক?

তারা কি সত্যি অত ছোট, অত ভারি আর এত দূরে? প্রবল গতি নিয়ে তারা কি আমাদের ছেড়ে যেতে চলেছে? কোথা থেকে তাদের বিকিরণে আসে এত শক্তি? ···না, কোয়াসার এখনও অবোধ্য।

মহাকাশের সব বস্তুর না বোঝার কারণ হয়তো মহাকর্ষ-শক্তি। মহাবিশ্বের জটিল গঠনের কারণ এবং বস্তুর গঠনের কারণ যে, সেই হয়তো জটিল গুণধর্মের কারণ। মহাকর্ষ কি সুস্পষ্টভাবে বোঝা গেছে? জানা গেছে?···এর উত্তরও জানা নেই।

মহাবিশ্বের শুরুতে হট বিগ ব্যাঙ তত্ত্বে বর্ণিত ঘটনার মত কিছু একটা ঘটে গেছে। অন্তত হট বিগ ব্যাঙ ঘটনার এক লক্ষ বছর পর যে ফসিল বিকিরণ বিশ্ব-জগতে ছড়িয়ে গেছে, তাদের ধরা গেছে। এই ফসিল থেকে বিজ্ঞানীরা পিছনের খবরের খোঁজ করেন। নানা বিকল্প তত্ত্বের অভিনয়ে একটি সত্য মোটামুটি স্পষ্ট—মহাবিশ্ব সৃষ্টির 10^{-3} সেকেণ্ড কাল পরে চেনা-জানা ফিজিক্সের আবির্ভাব হতে পারে। তারপর থেকে ফিজিক্সের ধারায় সৃষ্টি ভেসে চলে, নিয়ম দেখা দেয়, শৃঙ্খলা হাজির হয়। প্রকৃতির জগতে বিশৃঙ্খলা যদি থাকে, তবে তারও সম্ভাবনাটি নিয়মের গঠনে আছে; কোয়ান্টা ফিজিক্সের অনির্দেশ-অনিশ্চিতি-সম্ভাবনা সেই ইশারাটা জানিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের সূচনায় স্পেসটাইমের বুনটে কোয়ান্টায়িত অবস্থা ছিল কি?···এখানেও উত্তর জানা নেই। তবু কোয়ান্টারীতিতে মহাবিশ্বের জন্মলগ্নের একটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। সেখানে আদিম ফায়ার বলের পরিবর্তে থাকে একটি কোয়ান্টা—যার মধ্যে সঞ্চিত থাকে বিপরীত মহাকর্ষ-শক্তি। যেটি কোয়ান্টাকে কাটিয়ে বিস্ফোরণের ধারায় নিয়ে যায়—প্রচণ্ড শক্তি থেকে সৃষ্টি হতে থাকে কণা; আপনা থেকে, দেশকালের সঙ্কোচনের পথে। তারপর 10^{-3} সেকেণ্ড কালের পর আবার চেনা-জানা ফিজিক্সের ফোর্স কাজে নামে। সৃষ্টির কোন পথটি সঠিক? ····এর উত্তর জানা নেই।

মহাবিশ্বের জন্মলগ্ন আছে; তার শেষ কোথায়? তারকার মৃত্যু আছে; গেলাক্সির সৃষ্টি আছে। তারপর?···এই বিশ্ব বর্ধমান। এই বর্ধমানধারা কি চিরকাল চলতে পারে? গেলাক্সিরা দূরে দূরে সরে যায়—আন্তর্গেলাক্সির অঞ্চলে বিস্তৃতি ঘটে, তাপ কমে যায়। এই বিস্তার, এই বর্ধনত্ব—এও যে শীতল মৃত্যুকে ডেকে নিয়ে আসে—যেমন তারকার মৃত্যু। মহাবিশ্বের শেষ কি শীতল মৃত্যুতে? ···জানা নেই।

অথবা আইনস্টাইনের সাধারণতত্ত্ব অথবা কোয়ান্টাম ফিজিক্সে যেমন জানা যায়

স্পেসটাইম মেটার সৃষ্টি করতে পারে—সেই পথে মেটারের বৃদ্ধি ঘটে বলে মহাকাশের মেটারের ডেনসিটি বেড়ে যায়; মহাকর্ষশক্তি বৃদ্ধিরশক্তিকে সংহত করতে পারে। অন্তত দেখা যায় প্রাথমিক বৃদ্ধির হারের তুলনায় বর্তমানে মহাবিশ্বের বৃদ্ধির হার কম। ডেনসিটির বৃদ্ধি ঘটলে মহাবিশ্ব স্থিতিশীল রূপ পেতে পারে। অথবা মহাকর্ষের টানে নক্ষত্রভরা গেলাক্সিরা আবার এক জায়গায় জমাট হয়ে সেই সৃষ্টির প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। তখন অন্য একটি হট বিগ ব্যাঙ ক্রিয়া ঘটে। নতুন মহাবিশ্ব জন্ম নেয়; যেখানে পুরনো বিশ্বের কোনো স্মৃতি, কোনো চিহ্ন থাকে না। এমনটিও যে ঘটে সেটি বিজ্ঞানীরা বলেছেন। বলেছেন, আজ থেকে আশি বিলিয়ন বর্ষ পরে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। একি সত্যি?…জানা নেই!

সমস্ত জিজ্ঞাসার পথে একটি যষ্টি—সেটি মহাকর্ষতত্ত্ব এই তত্ত্বটি যদি সঠিক হয়! মহাবিশ্বে এটিকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলে। তত্ত্বটি হোক পূর্ণ থেকে পূর্ণতর। তবে অনেক প্রশ্নের, অনেক ‘কে-কি-কেন’র উত্তর পাওয়া সম্ভব।

থ. প্রাণের আরাম

পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম যে কেন, তার খোঁজ করতে গিয়ে পাওয়া যায় পৃথিবীর কয়েকটি সুবিধাজনক অবস্থা। যেমন (1) এখানে প্রাণের মৌল উপাদান, যথা—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং কেলসিয়াম ও ফসফোরাস—পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। (2) আবহাওয়ায় এমন কোনো বিষাক্ত গ্যাস নেই যা প্রাণকে ধ্বংস করতে পারে। অন্য গ্রহে এমোনিয়া বা মিথেন গ্যাস আবহাওয়া মণ্ডলে পাওয়া গেছে। পৃথিবী এদিক দিয়ে সৌভাগ্যবতী। (3) এখানে তাপের পরিবর্তন হার এমন হয় না যা প্রাণের পরিপন্থী। যেমন সাধারণভাবে বলতে গেলে, মানুষের সহনীয় তাপমাত্রা $5^{o}c$—$40^{o}c$; পৃথিবীর অধিকাংশ অঞ্চলে এই তাপমাত্রা বজায় যে থাকে তাতে সন্দেহ নেই। (4) পৃথিবীর বুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন শক্তি-ধারা নেমে আসছে সেখানেও মোটামুটি সমানত্ব বজায় থাকে। এই শক্তি জোগায় সূর্য। আর পৃথিবীর কক্ষপথ মোটামুটি বৃত্তাকার বলে শক্তি তারতম্যটিও কম। (5) পৃথিবীর মহাকর্ষটি এমন যে তার আবহমণ্ডল ভেসে যায় না। অন্যদিকে এখানে প্রাণজগৎ এই আকর্ষণের বাধা কাটিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে। এবং (6) পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ওজন স্তর আর নিজস্ব চুম্বক ক্ষেত্র বাইরের

আলট্রাভায়োলেট রে ও কসমিক রশ্মির আগমনে বাধা তোলে ; প্রাণের প্রবাহে নিরাপত্তা বজায় রাখে।

বিচার করে দেখলে, প্রাণের আবির্ভাব ও স্থিতির জন্য যে শর্ত প্রয়োজন, তা পৃথিবীতে আছে। তবু ধরা যায় মহাকর্ষ একটি শর্ত হলেও, অন্য মহাকর্ষ শক্তিতেও প্রাণ থাকতে পারে। পৃথিবীর মহাকর্ষ সামান্য বেশি হলে, এখানে প্রাণীরা হত বেঁটে, চেপ্টা, হাড় মোটা। তাপ বেশি হলে হয়তো ঠাণ্ডা রাখার অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ, যন্ত্রের cooling fin জাতীয় কিছু প্রাণী জগতে দেখা যেত। প্রাণের জন্য কার্বনের উপকরণটি নিশ্চয় প্রধান। তবু সিলিকন ও টিন থেকে বড় অণু তৈরী হয়। —সেখানেও প্রাণ জাতীয় কিছুর সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন করা যায়, প্রাণ কি ? মেটার ও শক্তির জটিলতম শৃঙ্খলার প্রকাশ প্রাণে। এই প্রাণ নিজস্ব উপকরণ পেলে, আপনা থেকে নির্দিষ্ট পরিবেশে, নিজের অনুরূপ তৈরি করতে পারে। বিজ্ঞান জানিয়েছে, ক্রিস্টালের গঠনে জটিল শৃঙ্খলা আছে, এটিও সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে উপকরণ পেলে অন্য ক্রিস্টাল তৈরি করতে পারে। তবু ক্রিস্টাল প্রাণ নয়। আবার নক্ষত্রজগৎ একটি জটিল সুশৃঙ্খল সিস্টেম। তবু নক্ষত্র প্রাণ নয়। এই মহাজগতের অন্যত্র এমন কোনো জটিল সিস্টেম থাকতে পারে যা আমাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়। হয়তো তাকে প্রাণ বলা যাবে। অন্যদিকে আমাদের পার্থিব প্রাণ—সেটি রসায়ন ভিত্তিক। এখানে যে ফোর্স কাজ করে তা ইলেক্ট্রো-মেগনেটিক বা কুলম্ব ফোর্স যা এটমে এটমে বিক্রিয়া ঘটিয়ে শৃঙ্খলার ধারা তৈরি করে। মহাকর্ষ ফোর্স এটমকে টেনে এনে বস্তু তৈরি করতে পারে—পারে নক্ষত্র, ছায়াপথ গেলাক্সি তৈরি করতে। একটি গেলাক্সির এক প্রান্তের খবর অন্যপ্রান্তে হাজির হতে আলোর গতিতেও কয়েক মিলিয়ন বর্ষ লাগে। মহাজাগতিক বস্তু যা মহাকর্ষে গড়া, তার চেতনা যদি থাকে—তবে সে অতি ধীর। সেখানে শৃঙ্খলিত ধারার প্রকাশ এত ধীরে ঘটে, যে তাকে আমাদের ধারণার সাপেক্ষে জড়-অচেতন বলা যায়। অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ও উইকফোর্স অতি ক্ষুদ্র জায়গায়, অতি সামান্য সময়ে কাজে নামে। কেন্দ্রকে সুস্থির রাখে অথবা কণার ক্ষয় আনে। এখানে নিউক্লিয়ার ফোর্সের জগতে, প্রোটন-নিউট্রন কেন্দ্র তৈরী করে—তবে সেখানে প্রোটন-নিউট্রন সংখ্যার সীমাবদ্ধতা আছে। এই সীমাবদ্ধতাটুকু প্রকাশ পায় নিউক্লিয়ার ফোর্স আর উইকফোর্সের ক্রিয়াকলাপে। অথচ প্রাণ অণুর জটিলতায় অসংখ্য এটম হাজির হয়। মহাকর্ষের মত বিরাট বিশাল বস্তু তৈরি করতে না পারলেও এটমের কেন্দ্র থেকে প্রাণঅণু অনেক বড়। অনেক জটিল, অনেক শৃঙ্খলিত

এই শৃঙ্খলিত জটিল সংহত সংবদ্ধ প্রাণবস্তুকে তৈরি করতে পারে কুলম্ব ফোর্স। যে প্রাণ আমাদের চারপাশে দেখা দেয়, তা কুলম্ব শক্তির শৃঙ্খলধারায় গড়া, হয়তো রাসায়নিক সুবদ্ধ শক্তির বন্ধনে বাঁধা। এই পৃথিবীতে একমাত্র এই প্রাণের উদ্ভবই সম্ভব। আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র; সে একটি গেলাক্সির সভ্য—যার নক্ষত্র সংখ্যা এক মিলিয়নের কাছাকাছি। মহাজগতে বেশ কয়েক বিলিয়ন গেলাক্সি আছে; প্রতি গেলাক্সিতে আছে 10^5 থেকে 10^6টি নক্ষত্র। তাদের গ্রহ উপগ্রহ থাকতে পারে। যে পরিবেশে যে শর্তে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, প্রাণের স্থিতি, সেই পরিবেশ ও শর্তে এই অসংখ্য অগণিত তারকার সাম্রাজ্যে কোথাও প্রাণের দেখা যেতে পারে। আমাদের চেনা-জানা প্রাণ মহাজগতে অন্য কোথাও থাকতে পারে। সুতরাং মহাজাগতিক বিশালতায় পৃথিবী অনন্যতার দাবী করতে পারে না।

তবু প্রাণের আবির্ভাবের একটি শর্ত যে বাইরে থেকে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় সমান হারে শক্তির প্রয়োগ প্রাণাঞ্চলে ঘটবে। পৃথিবীতে এই শক্তি জোগায় সূর্য। হার্ৎস-প্রুংগ-রাসেলের ডায়াগ্রামে দেখা যায় একমাত্র মেন সিকোয়েন্স বা প্রধান ধারায় নক্ষত্র কটিতে তাপ ও দীপ্তির মোটামুটি সমতা আছে। এখানে নেই হিলিয়াম ফ্ল্যাশের মত বিপর্যয়কর অবস্থা, নেই শীতলতার দিকে ছুটে চলা। এই এই নক্ষত্রদেরই গ্রহ সংসারে প্রাণ দেখা দিতে পারে।

এই নক্ষত্রে হাইড্রোজেন যার একটি প্রোটনিক কেন্দ্র আছে, সে তৈরি কিরে দুটি নিউট্রন কেন্দ্রের হিলিয়াম। উইকফোর্সের ধারায় জানা যায়, একটি নিউট্রন একাকী থাকলে সাড়ে পনের মিনিট সময়ে ভেঙে যায় প্রোটন ইলেকট্রন ও নিউট্রিনো কণায়। অন্যদিকে নক্ষত্রে প্রোটন রূপান্তরিত হয় নিউট্রনে। প্রোটনের চার্জটি বেরিয়ে আসে পজিট্রনে, যে কাছাকাছি ইলেকট্রনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করে গামা রে, আর পাওয়া যায় নিউট্রিনো—যার কোনো কাজ নেই বলে ঘর ছেড়ে মহাবিশ্বে ভেসে যায়। নতুন সৃষ্টি হওয়া নিউট্রন অন্য একটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন নিয়ে হিলিয়ম কেন্দ্র তৈরী করে,—পাওয়া যায় আবার গামা রে। এই গামা রে-কণারা নক্ষত্রের অভ্যন্তরে ঠাঁই খুঁজতে মাথা ঠোকা-ঠুকি করে শেষমেশ তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তারকার সঙ্কোচনের ধারাকে জব্দ করে; তারকার আকার বজায় থাকে।—হাইড্রোজেন জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তারকা সঙ্কোচনের পথে আবার যায় এবং মূল তারকার ভরের সাপেক্ষে হিলিয়ামকে জ্বালানী হিসেবে পরবর্তী পর্যায়টি বেছে নিতে পারে। যদি মূল নক্ষত্রে হিলিয়াম দহনের পদ্ধতিটি প্রাথমিক হতো, তবে তারকার মাস হতো বেশি, তার ফিউসনের তাপও বেশি।

অন্যদিকে অনেক নক্ষত্র, যার মাস সৌরভরের সমান বা তার কাছাকাছি—তারা দীপ্ত হতে পারত না। হিলিয়ামের দহনক্রিয়া এইসব নক্ষত্রে হতো না। মহাবিশ্বে হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের আনুপাতিক স্থিতি হলো যথাক্রমে শতকরা সত্তর ভাগ আর ত্রিশ ভাগ। হাইড্রোজেনের পরিমাণ বেশি। তাই দহনক্রিয়ায় তাকেই আগে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবু অন্যভাবে অনেক সহজে হিলিয়াম কেন্দ্র তৈরি করা যায়। একই নিউ-ক্লিয়ার ফোর্স এখানেও কাজ করে। উপকরণ হাইড্রোজেন নয়। ডিউটোরিয়াম অথবা ভারি হাইড্রোজেন, যার কেন্দ্রে আছে একটি প্রোটন, একটি নিউট্রন। কোয়ান্টাম জিরো অবস্থানের শক্তিটি সাধারণত নিউট্রনকে গ্রেপ্তার করতে চায় না; অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউট্রনকে টেনে নেবার জন্য আগ্রহী। দেখা যায়, ডিউটেরিয়ামে এই দুটি ফোর্সের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্স সামান্য একটু বেশি বলে প্রোটন-নিউট্রন সংযোগ সম্ভব। তবে এই বাঁধন খুবই আলগা। একটি হাইড্রোজেনে দুটি প্রোটন ঢুকে কষ্টে সৃষ্টে এই ডাই প্রোটন তৈরি করার সম্ভাবনা থাকে। তবে এই ডাইপ্রোটনের স্থিতিকাল অতি সামান্য। অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ফোর্সটি কুলম্ব ফোর্সের চেয়ে সামান্য আরেকটু যদি বেশি হতো, তবে ডাইপ্রোটনটি সম্ভাবনার স্তরে আসে, সেখান থেকে উইকফোর্সের প্রভাবে একটি প্রোটনের ক্ষয়ের ধারায় নিউট্রন পাওয়া যেত এবং পাওয়া যেত একটি ডিউটেরিয়াম কেন্দ্র। এটি সম্ভব হতো—যদি নিউক্লিয়ার ফোর্সের মান কুলম্ব ফোর্স থেকে আরো একটু সামান্য বেশি হতো। যদি হতো তবে হাইড্রোজেন না পেয়ে পাওয়া যেত ডাই-প্রোটন বা ডিউটেরিয়াম —যেটি সব উপাদানের মূলে থাকতো। নক্ষত্রের ফারনেসে ডিউটেরিয়ামের দহন হতো। অনেক দ্রুত, অনেক কম তাপে পাওয়া যেত হিলিয়াম। এত দ্রুত দহন ক্রিয়া ঘটতো, যে মহাজগতে এতদিনে শতকরা একশ ভাগই হিলিয়াম পাওয়া যেত। নীরবে স্থস্থির হয়ে হাইড্রোজেন দহনের ক্রিয়ায় কোনো নক্ষত্র নামত না। যে তাপের সমতা বর্তমানে দেখা যায়, সেটি ভিন্ন হতো, জল পাওয়া যেত না; প্রাণের সাক্ষাৎ ঘটতো না। তবু সব কিছু ঘটে, কারণ নিউক্লিয়ার ফোর্সের একটি ধ্রুবমান আছে; এটির মান এমন যে ডাইপ্রোটন পাওয়া যায় না। হাইড্রোজেনই সৃষ্টি হয়।

অন্য ফোর্সটি যা এটমের সংসারে কাজ করে—সেই উইকফোর্সও প্রাণের সৃষ্টিতে কাজে নামে। এই মহাবিশ্বে দেখা যায় হাইড্রোজেন-হিলিয়ামের ভাগ একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় আছে। পিছনে ফিরে তাকালে বোঝা যায়, আদি মৌলকণা থেকে এটমের কেন্দ্র সৃষ্টি হবার সময় যতগুলি নিউট্রন ছিল, তা নিয়ে প্রোটন

তৈরি করেছিল হিলিয়াম। আর বাদবাকি প্রোটন দিয়ে তৈরি হাইড্রোজেন। এক কথায় আদিম মৌলকণার সৃষ্টির কালে নিউট্রন থেকে প্রোটন অনেক বেশি সৃষ্টি হয়। শক্তির রূপান্তরে কণার সৃষ্টি। নিউট্রনের মাস প্রোটনের চেয়ে বেশি বলে, নিউট্রন সৃষ্টিতে বেশি শক্তির প্রয়োজন। যে তাপ ক্রিয়ার ফলে শক্তির মেটারে রূপান্তর ঘটেছে—সেখানে তাপের সামান্য হেরফেরে নিউট্রন সৃষ্টি হ্রাস পাবে—কারণ স্বাভাবিকভাবে বেশি শক্তি খরচ না করে অল্প শক্তি খরচ করে প্রোটন সৃষ্টিই সহজ। এতে তাপের সাম্য সুস্থির ভাব বজায় থাকে। কণা সৃষ্টিকালে প্রোটন-নিউট্রনের সমতাটি বজায় রাখে উইকফোর্স। কণার জগতে সৃষ্টির সময়ে এই ফোর্স যেন সার্ভো মেকানিজম। বাইরে থেকে কোনো উৎপাত না ঘটলে অদ্ভুত নৈপুণ্যে এই ফোর্স নিউট্রন-প্রোটনের সৃষ্টির সমতা বজায় রাখে; শক্তির অযথা অপচয় বন্ধ করে। প্রাথমিক কণারা অত্যন্ত বিস্ফোরক বর্ধমান বিশ্বলোকে প্রোথিত ছিল বলে ধরা হয়। প্রাথমিক বৃদ্ধির জগতে প্রোটন আর নিউট্রনকণা অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে বলে সমতার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। বৃদ্ধির জগতে এক সেকেণ্ড পরে ডেনসিটি কমে যায়, তাপও কমে যায়; এই অবস্থায় সমতা বজায় রাখাটি সহজ হয় না। যেটুকু নিউট্রন প্রোটন তৈরি হয়েছিল সেটি তখনও বজায় থাকে। প্রাথমিক তাপ ও বৃদ্ধির জগতে উইকফোর্স পূর্ণ দক্ষতায় কাজে নামে; পরবর্তী পর্যায়েও সমতাটি সে বজায় রাখতে কিছুটা সাহায্য করে। এক সেকেণ্ড পরে নিউট্রন প্রোটনের যা ভাগ থাকতে পারে, তা গণিতের পথে হিসেব করা যায়—এটি শতকরা পনের ভাগ। এই ভাগটিই পরে বজায় থাকে, যার ফলে পাওয়া যায় সত্তর ভাগ হাইড্রোজেন আর ত্রিশ ভাগ হিলিয়াম।

প্রাথমিক অবস্থায় সমতার ধারায় ভাঙন দেখা দিলে উইকফোর্স কাজে নামে। যদি এই ফোর্সের মান আরো কম হতো তবে দ্রুত বর্ধমান জগতে এই ফোর্স সার্ভো মেকানিজমের কাজটি করতে পারতো না। এক সেকেণ্ডের আগে-নিউট্রনের উৎপত্তি ছিল। সেই সময় তাপশক্তি বেশি ছিল বলে, প্রয়োজনাতিরিক্ত ছিল বলে, নিউট্রন-প্রোটন সৃষ্টিতে বাছবিচার ঘটেনি, তাদের মাসের সামান্য তফাতটি ধর্তব্যের মধ্যেই আসেনি। প্রোটন-নিউট্রনের সৃষ্টি ছিল হরে দরে সমান সমান। অথচ এক সেকেণ্ড পর প্রোটন নিউট্রনের সংখ্যায় দেখা যায় 85% প্রোটন আর 15% নিউট্রন। এই অনুপাত না থেকে, যদি সম সংখ্যায় প্রোটন নিউট্রন পাওয়া যেত তবে শতকরা একশ ভাগ হিলিয়াম সৃষ্টি হতো—হাইড্রোজেন পাওয়া যেত না। দীর্ঘজীবি স্থায়ী নক্ষত্র পাওয়া যেতনা। প্রাণের সৃষ্টি হতো না। সৃষ্টি হয়,

তার কারণ নিউট্রনের ক্ষয়ের ধারায় উইকফোর্স প্রোটনের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। শক্তির রূপান্তরী ক্ষমতায় সমতা আনে।

এই নিউক্লিয়ার ও উইক ফোর্স প্রাণের সৃষ্টির উপাদানের মূল স্রোতে হাজির থাকে। হিলিয়াম দহনের পর, যে এলিমেণ্টটিকে পরবর্তী পর্যায়ে নক্ষত্র জালানী হিসাবে বেছে নেয়—তা কার্বণ। তিনটি হিলিয়াম কেন্দ্র মিলিয়ে পাওয়া যায় একটি কার্বণ কেন্দ্র। নক্ষত্রের উত্তপ্ত কেন্দ্রে কণায় কণায় ঠোকাঠুকি চলে। সেখানে দুটি কণা ঠোকাঠুকিতে একটি কণা সহজে তৈরি হতে পারে। তিনটি কণার মিলনে একটি কণা সৃষ্টির সম্ভাবনা যথেষ্ট কম। অতএব তিনটি হিলিয়াম কেন্দ্রের একত্রিত হয়ে একটি কার্বণ কেন্দ্র তৈরি করার পদ্ধতিটি খুবই ধীর; অন্যদিকে হিলিয়াম দহনে কার্বণ পাওয়া যায় এটি পরীক্ষিত। সহজ পথে দুটি হিলিয়াম কেন্দ্র ফিউসন পদ্ধতিতে তৈরি করে বেরিলিয়াম কেন্দ্র। তবে এই সংযোগটি দীর্ঘস্থায়ী নয়। অন্যদিকে আরো একটি হিলিয়াম কেন্দ্রকে গ্রেফতার করতে পারলে স্থায়ী কার্বণ কেন্দ্র তৈরি হতে পারে। এই গ্রেফতারটি নির্ভর করে নক্ষত্রের কেন্দ্রের তাপ শক্তির উপর। ফ্রেড হয়েল দেখিয়েছেন বেরিলিয়াম ও হিলিয়ামের সংযোগে যে এনার্জি লেভেল পাওয়া যায়, তা নক্ষত্রটির গড় শক্তির সঙ্গে মিল টানে। সহজে সাবলীলভাবে হিলিয়াম দহন প্রক্রিয়ায় নক্ষত্রের অভ্যন্তরে কার্বণ সৃষ্টি ঘটে চলে। এই কার্বণটি কিন্তু সহজে অন্য আরেকটি হিলিয়াম গ্রেফতার করে অক্সিজেনে রূপান্তরিত হয় না। এই রূপান্তরের ধারায় যে ফোর্সটি কাজ করে— সেটি নিউক্লিয়ার ফোর্স। এই ফোর্সের মানে যৎসামান্য বৃদ্ধি ঘটলে কার্বণের স্থায়িত্ব থাকত না। প্রাণ সৃষ্টি হতো না। আবার এই ফোর্সের মান কম হলেও তারকার অভ্যন্তরে কার্বন সৃষ্টিও হয় না।···নিউক্লিয়ার ফোর্সের ধ্রুবকত্বর উপর নির্ভর করে কার্বনের সৃষ্টি।

তারকার অভ্যন্তরে কার্বন দহনের কালে কার্বন-হিলিয়াম মিলে অক্সিজেনও পাওয়া যেতে পারে। এই অবস্থায় জালানীর ঘাটতি দেখা দেয়। কোর বা কেন্দ্রে যে তাপ সৃষ্টি সেটি যথেষ্ট নয় বলে মহাকর্ষ শক্তি চুপিসারে সঙ্কোচনের ক্রিয়ায় নামে। ফলে সঙ্কোচনের পথে সহসা বিস্ফোরণ দেখা দেয়—অসম্ভব শক্তি বাইরে বেরিয়ে আসে। এটি সেই সুপার নোভা। এই বিস্ফোরণ কিভাবে ঘটে?— কেন্দ্র যখন ফিউসন ক্রিয়ায় নামে, তখন অগনিত নিউট্রিনো কণার সৃষ্টি হয়; এরা ভাঙনধরা কেন্দ্রের বাইরে জমা হয়—তারকার কেন্দ্রের ডেনসিটি নিউট্রিনোর চলে যাবার পথে বাধা তুলে দাঁড়ায়। কারণ নিউট্রিনো ও অন্যান্য বস্তুর অন্তক্রিয়া ও

নিয়ন্ত্রিত করে উইক কোর্স। এই ফোর্সটি নিউট্রিনোর ছেড়ে যাবার বাধা। এটি যদি সামান্য বেশি হত, নিউট্রিনো নক্ষত্রে আটকা থাকতো। এটির মান নির্দিষ্ট বলে নিউট্রিনো কেন্দ্র ছেড়ে পরিসীমায় হাজির হয়। আর সম্মিলিত নিউট্রিনো শক্তি উপরের স্তরকে ফাটিয়ে, প্রচণ্ড দীপ্তি জাগিয়ে বাইরের গেলাক্সিতে নক্ষত্রের শক্তি ছুঁড়ে দেয়। এই ছুঁড়ে ফেলা ভস্মে থাকে কার্বন—যা অন্য তারকা বা মহাজাগতিক বস্তুতে হাজির হয়। প্রাণ সৃষ্টি হয়। ফ্রেড হয়েল বললেন, আমাদের প্রাণ মৃত নক্ষত্রের দেহাবশেষে সৃষ্টি। যদি উইকফোর্স বেশি শক্তিশালী হতো, নিউট্রিনো কেন্দ্র ছেড়ে বেরুতে পারতো না। সুপারনোভা বিস্ফোরণ ঘটতো না। অন্যদিকে উইকফোর্স আরো উইক বা দুর্বল হলে, নিউট্রিনোর জমাট শক্তি তারকার উপরের স্তরকে আঁকড়ে ছুঁড়ে ফেলতে পারতো না। এক কথায় ফোর্সের উনিশ-বিশ ঘটলে সুপারনোভা পাওয়া যেত না। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে গড়ে ওঠা কার্বন বাইরে আসতো না। প্রাণ সৃষ্টি হতো না। সৃষ্টি হয়, কারণ উইকফোর্সের মানটি ধ্রুব।...আবার এটমের অভ্যন্তরের কণারা নির্দিষ্ট মাসের। এই মাসের উনিশ-বিশ ঘটলে এটমের সৃষ্টিতে গোলযোগ দেখা দেয়। ইলেকট্রনের মাস যদি আরো দশ হাজার গুণ ছোট হতো, তবে ইলেকট্রনের কক্ষপথ কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘর্ষে নামতো —এটমের ক্রিয়া বিক্রিয়া ভিন্ন হতো। নিশ্চিত কুলম্ব ফোর্সের সাপেক্ষে ইলেকট্রনের মাসটি যেন স্থিরীকৃত। প্রাণের সৃষ্টিতে যেমন নিউক্লিয়ার ও উইকফোর্সের ধ্রুবকত্ব থাকে, তেমনি থাকে মাসের নির্দিষ্টতা। এই মাস নির্দিষ্ট বলে চার্জহীন এটম পাওয়া সম্ভব। সব ক্রিয়া বিক্রিয়া ও সৃষ্টি ঘটেছে তাপে। এই তাপটিও বোঝা দরকার। বিগ ব্যাঙ সৃষ্টির এক লক্ষ বছর পরের স্মৃতি পৃথিবীর বুকে ধরা পরেছে। তার আগের সংবাদটি ফোটনের সাপেক্ষে জানা যায় না—কারণ ফোটন কণা তখনো অন্তক্রিয়ার জগতে কণা সৃষ্টিতে কাজে নেমেছিল। 10^{13} সেকেণ্ড পর ফোটন বেকার হয়ে ভব-ঘুরে হয়ে পড়ে। তার আগেও মহাবিশ্বের বর্ধমানত্ব ছিল। ধরা যাক সেই সময়কার বৃদ্ধির হারটি হলো আলোরগতির সমান অর্থাৎ সেকেণ্ডে 3×10^{8} মিটার। তাহলে এক সেকেণ্ড পর মহাবিশ্বের দিগন্ত থেকে দিগন্তের দূরত্ব হলো 3×10^{8} মিটার। এক mano Second বা 10^{-6} সেকেণ্ডে আগে এই দৈর্ঘ্য ছিল 0·3 মিটার—মানে এক ফুটেরও কম। তার কম সময়ে মহাবিশ্ব যে কি আকারে ছিল, সেটি বোঝা যায় না। এটি অবিশ্বাস্য রকমের ছোট। আবার দেখা যায়, লাল সরণের কারণ হলো বহুদূর থেকে আলোর আসা ; আলোর শক্তি ক্ষয়। যদি দূরত্ব অনেক বেশি হয়, তবে আলো তার শক্তি হারায় বলে আমাদের জগতে হাজির হয় না।

সেটিই আমাদের দিগন্ত বলে দেখা দিত। যা আমাদের দিগন্ত, অন্য গেলাক্সি থেকে দেখলে, সেটি দিগন্ত না হতে পারে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের সূত্র প্রয়োগ করে জানা যায়, মেটারের এনার্জি ও প্রেসারের মান পজিটিভ থাকলে বৃদ্ধির হার কমে আসে। বিগ ব্যাঙের বিস্ফোরণে পাওয়া বৃদ্ধিগতি, দেখা যায়, বর্তমানে অনেক ধীর হয়ে গেছে। এটি কেন ঘটেছে জানা যায় না। হয়তো আমাদের বিশ্বজগৎ দিগন্তহীন নয়।

এই বিশ্বজগত হোমোজিনাস ও আইসোট্রোপিক। অন্তত আমাদের জগতে দাঁড়িয়ে এই মনে হয়। এই দৃশ্য মহাজগতের আইসোট্রোপিকত্বে ত্রুটি শতকরা 0·1 ভাগ মাত্র। অথচ বিগব্যাঙ ক্রিয়ার সময় এই বৃদ্ধি সর্বত্র সমানভাবে যে ঘটে তা বলা যায় না—কারণ ঐ বিস্ফোরণের কোনো নিয়ন্ত্রণ শক্তির ধারনা নাই। অন্যদিকে ভাবা হয়, প্রাথমিক বিশ্বলোকে বৃদ্ধির হার বিভিন্নদিকে যেমন তেমন ছিল, কোথাও বেশি, কোথাও কম ; শেষমেশ এই বিশৃঙ্খল আলোড়ন কোনো প্রক্রিয়ার বাধা পেয়ে গতি কমিয়ে বাড়িয়ে সমতার জগতের রূপ নিয়েছে। এই বাধার মেকানিজম কী যে হতে পারে সেটি নিয়ে চিন্তা হয়। একটি হলো ভিসকসিটি—যা গতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। আর দ্বিতীয়টি হলো গতিশক্তি রূপান্তর হয় কণা সৃষ্টিতে। স্পেসে এই কণার উপস্থিতি বৃদ্ধি-শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কাছাকাছি ও প্রতিবেশী বৃদ্ধির ধারার সঙ্গে মিল এনে দেয়। এই গতিশক্তি থেকে সব ধরনের কণা—ইলেক্ট্রন প্রোটন নিউট্রিনো থেকে মেসন বেরিয়ন কণা এমনকি গ্রেভিটন কণাও সৃষ্টি হতে পারে। আরো দেখা যায়—যেখানে গতিশক্তি বা বৃদ্ধিশক্তি বেশি, সেখানে কণাসৃষ্টিও বেশি। প্রাথমিক বিশ্বে গতিশক্তি বেশি বলে কণাসৃষ্টি বেশি হয়। গতিতে বাধা জাগে। প্রাথমিক বিশ্বের উথাল-পাথাল অবস্থাটি টেঁকে না। কণার উপস্থিতিতে গতিতে সমতা দেখা যায়।

মেকানিজম যাই হোক, শক্তির রূপান্তরে তাপ পাওয়া যাবে। এই তাপের খোঁজ 10^{13} সেকেণ্ডের পিছনে করা যায়। প্রাথমিক বিস্ফোরণের পর এক সেকেণ্ডের মধ্যে কি যে ঘটতে পারে তার হদিশ করা যায় না—জানা যায় না ফিজিক্সের কোন পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের ধারায় কাজ করছে। কিছু প্রাথমিক নিয়মের ভিত্তিতে গাণিতিক প্রকারণ সেই অবস্থার ধারনার ইঙ্গিত দিতে পারে। যেমন—বর্তমানের 3k তাপাঙ্কের সাপেক্ষে পিছুলে 10^{-1} সময়ে কি বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা মোটামুটি বলা যায়। উথাল-পাথাল আলোড়নের কোনো মুহূর্তে গতিশক্তিটি তাপশক্তিতে রূপান্তর হচ্ছে। আবার শক্তির রূপান্তর ঘটে যখন বিশ্বজগতের

বৃদ্ধি ঘটে। এই বৃদ্ধি আবার তাপ কমিয়ে দেয়, আলোড়নে বাধা তোলে। গণিতের নিয়মে জানা যায়, বৃদ্ধির জগতে আলোড়নের শক্তির হ্রাস তাপ শক্তির তুলনায় অনেক বেশি। অতএব আলোড়নের জগতেই রূপান্তরের ক্রিয়া বেশি দেখা দিয়েছিল। এরই সাপেক্ষে হিসেব নিকেশ করে জানা যায়, যদি আইসোট্রেপির ভগ্নদশা সে অবস্থায় থাকে, তবে এই গতি থামানোর যান্ত্রিক পদ্ধতির ফলে হীট অনেক বেশি পাওয়া যেত—3k'র সাপেক্ষে যে হীট পাওয়া যায় তার চেয়েও বেশি।

অথচ আলোড়ন প্রাথমিক অবস্থাতে থাকে। এমনি কি 10^{-1}সেকেণ্ড অবস্থার আগেও আলোড়ন ছিল—সে আলোড়ন কোয়াণ্টা স্পেসে। মোটামুটি কোয়াণ্টা স্পেসে আলোড়ন বা ফ্লাকচুয়েশনের ফলে কতটা হীট তৈরি হতে পারত, সেই হিসেব কষা গেছে। এখানেও বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যায় তার সাপেক্ষে উত্তর মেলে। অর্থাৎ বিগ ব্যাঙ এর পরে যে ছড়িয়ে যাওয়া—যে আলোড়ন—সেখানে শৃঙ্খলা ছিল। নন আইসোট্রোপিকত্ব গুণের বিরাট ভগ্নদশা ছিল না।

আবার গণিতের অন্য ধারাতেও দেখা য'য় প্রাথমিক অবস্থায় অত্যধিক আলোড়ন বা টার্বুলেন্স পাওয়া যায় না। এই মহাবিশ্বে মাস এনার্জির খাতে এই আলোড়ন-টার্বুলেন্স এনার্জির দান কতটা সেটি হিসেব করা যায়; তার ফলে সামগ্রিক বৃদ্ধিতে এর যে কি প্রভাব ঘটে সেটিও গণিতের মাধ্যমে জানা যায়। অনুমান করা যায় যে, যে অবস্থায় আলোড়নের শক্তিটি মোটামুটি একনম্বরী ছিল, তখন বৃদ্ধিহার কমে, যেন মহাবিশ্ব প্রবলবেগে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে না। এই যে বৃদ্ধির পথে বিলম্বের দেখা, তার ফলে যে কোয়াণ্টা-হীট তৈরি হয় সেটি শীতল হতে দেরী হয়। অন্যদিকে অতি দ্রুত বিস্তৃতি ঘটে, এবং শীতলতা বাড়ে। এই অতিদ্রুত শীতলতা ঘটে—আলোড়ন যদি কম থাকে, আলোড়ন শক্তি প্রধান না হয়, বৃদ্ধি যদি মোটামুটি মসৃণ ধারায় হয়। এই পথে যে হিট পাওয়া যায়, তা পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের সঙ্গে মিল টানে। এক কথায় ধরা যেতে পারে 0^{13} সেকেণ্ডে কসমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন যেমন জানায় সেই অবস্থায় মহাবিশ্ব ছিল আইসোট্রোপিক, তারই সাপেক্ষে এবং বর্তমান মহাবিশ্বের টেম্পারেচার 3k এর পরিপ্রেক্ষিতে জানা যায় অন্তত 10^{-51} সেকেণ্ড বয়সেও মহাবিশ্বের গতি বা বৃদ্ধিতে অশোভন উচ্ছৃঙ্খলতা ছিল না। কসমিক হীট রেডিয়েশন এবং প্রাথমিক আলোড়ন টার্বুলেন্সের সম্পর্ক—যা গণিতে পাওয়া গেছে—সেটি ভুল না হলে, মহাবিশ্বের বৃদ্ধিতে হটকারিতা নেই; এই বৃদ্ধি মসৃণ—Smooth; মহাকাশ বিজ্ঞানী এই মসৃণতা দেখে বিস্মিত হন। কেন এই মসৃণতা?

কেন সব ফোর্সের মান এত ধ্রুব। কেন কণার মাস নির্দিষ্ট? প্রাথমিক হীট যদি বেশি হতো, বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যায় মহাবিশ্বে তার চেয়েও বেশি তাপ পাওয়া যেত। তাপ একশগুণ বেশি হলে বর্তমানে যে তাপ পাওয়া যেত, তাতে হয়তো জল বাষ্প হয়ে দাঁড়াতো। তাপ হাজার গুণ বেশি হলে নক্ষত্রের সৃষ্টি এখনে সম্ভব হতো না। তাছাড়া নক্ষত্র অথবা এমন কি গেলাক্সিও এই অত্যধিক রেডিয়েশনের পশ্চাদ্‌পটে তৈরি হতো কিনা—সেই সন্দেহ থাকে। দেখা যায়, প্রাথমিক মহাবিশ্বে যৎসামান্য নন্ আইসোট্রোপিকত্ব প্রাথমিক তাপকে লক্ষ-কোটি গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে। মহাবিশ্বের বৃদ্ধিতে তাপ কমে ঠিকই। এক বিলিয়ন বছরে ইউনিভার্সের তাপ কমে দাঁড়ায় অর্ধেকে; সব নক্ষত্র যেদিন পুড়ে শেষ হবে তখন দেখা যাবে তাপ কমেছে মোটামুটি এক পার্সেন্ট মাত্র। যদি সেই উচ্চতাপের পরিপেক্ষিতে প্রাণ সৃষ্টি হতো—তবে সে প্রাণের তারকা দেখা সম্ভব হতো না—তারকার থেকে শক্তি সংগ্রহ করাও অবাস্তব হতো। প্রাণের উৎপত্তির জন্য এই মহাবিশ্বে সর্বত্র ব্যালেন্স দেখা যায়। এ কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে দুটি থিয়োরী পাওয়া যায়; এভারেট (Everett) জানান, বহু বিশ্বলোকে গড়া সুপারপেস তত্ত্ব। অগণিত বিশ্বলোকের মধ্যে সম্ভাবনা ও বাছাই এর পথে আমাদের এই বিশ্বলোক পাওয়া যেতে পারে। এই বিশ্বে ছিল একমাত্র প্রাথমিক হীটের অসামান্যতা—যার ফলে এখানে, একটি গ্রহে—প্রাণের বিকাশ সম্ভব। অন্য বিশ্বে এই প্রাণ এখনো নেই। অথবা সামান্য কয়েকটি বিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী থাকতে পারে। আর অবশিষ্ট সব কটি বিশ্ব উত্তপ্ত যন্ত্রণা নিয়ে ইতিহাসের পথে প্রাণহীন, উচ্ছৃঙ্খল অহেতুকতায় ছুটে চলেছে।

দ্বিতীয় তত্ত্ব নিও এরিস্টোটোলিয়ান এন্থ্রোপিক প্রিন্সিপল (Anthropic Principle)। এখানে জানা যায়, এই প্রাণ না থাকলে সৃষ্টি মিথ্যে, সৃষ্টি অকারণ। তাই অবিশ্বাস্য অসম্ভাবনার মধ্যদিয়ে, নানা বিশ্বলোকের ছাঁচ থেকে আমাদের এই বিশ্বলোকটি বাছা হয়েছে; এখানে আছে শৃঙ্খলা; মেটার ও এনার্জির বণ্টনে সুষমা, যা মহাবিশ্বকে শীতল রেখেছে বলে সেই সৃষ্টিতে মুগ্ধ হতে আছে প্রাণ।

মহাবিশ্বের প্রাথমিক রূপে কী ঘটেছে তা বোঝার জন্য উপযুক্ত ফিজিক্স এখনো নেই। যে হিসেব করা হয়েছে—সেটি মোটা দাগের। নতুন ফিজিক্স থেকে এই বিশ্বের কি তথ্য অথবা তালাস পাওয়া যাবে তা আজকে অজানা। সেদিনের বিশ্বলোক, নতুন ফিজিক্সের আঙ্গিনায়, এত সুশৃঙ্খল সুষমা নিয়ে কি দাঁড়াতে পারবে?—নিজের অস্তিত্বের কারণ মানুষ খুঁজে যায়। অনেক সময় মনে করা হয়,

সৃষ্টিকর্তার বিশেষ কৃপায় এই মানব শরীর, এই মানব জন্ম। অথচ বিবর্তনের পথে সম্ভাবনা ও চান্স, পছন্দ ও বাছাই, এই রীতিতে মানুষের আবির্ভাব—আবির্ভাব বিরাট মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঞ্চলের একটেরে। এই মানুষ জানতে চায় তার সৃষ্টি রহস্য, মহাবিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্ক। নববিজ্ঞান এই সম্পর্ক খোঁজার পথে অন্য মাত্রা আনে। মানুষ এই মহাবিশ্বের মুগ্ধ দর্শক শুধু নয়। মহাবিশ্বের নাটকে ঘটনার স্রোতে মানুষ কুশীলব হয়ে দেখা দেয় ; সে ঐ নাটকের অংশ। এই নাটকে তার অভিনয়াংশ আছে।

মহাবিশ্ব সৃষ্টির প্রাথমিকতম সংবাদ কবে সঠিক জানা যাবে, জানা নেই। তবু প্রাণ বা মানুষের জন্য যেন এই বিশ্বলোক জটিল শৃঙ্খলের ধারাপাত গেঁথে গেছে। বিশ্বসৃষ্টিতে প্রাণ অপ্রাসঙ্গিক নয়, অভাবণীয় নয়। বিশ্বসৃষ্টির প্রবাহ পথে প্রাণ থাকে। মানুষ থাকে।

—বড় সুখের, বড় আনন্দের, গর্বের এই জানা।

(গ) মহাশূন্যের পার হতে

সেই আদিকাল থেকে শক্তি নিয়ে চিন্তা হয়েছে—যার প্রাথমিকতার শেষ ঘটে ঊনবিংশ শতাব্দীতে, জুলসের হাতে। জানা যায়, শক্তির রূপান্তর ঘটানো যায়। শক্তির অবলুপ্তি নেই, সে অন্যরূপে অন্য প্রকরণে ধরা দেয়। রূপান্তরিত শক্তির ব্যাখ্যার পথে থাকে তাপগতি বিজ্ঞান—থার্মোডায়নামিকস। আর এখানেই প্রথম প্রয়োগ হল স্ট্যাটিসটিকসের। এই তাপগতি বিজ্ঞানের ফলে পাওয়া বিকিরণকে বুঝতে গিয়ে বিশ শতকের প্রথমেই ম্যাক্সপ্লাঙ্ক সনাতনী বিজ্ঞানের প্রাসাদে ফাটল ধরান। আনেন কোয়ান্টা। তারই রেশ ধরে ১৯৩০ সালের মধ্যে h ধ্রুবকটি হাতে নিয়ে বিজ্ঞানীরা সনাতন জগতের নির্দেশনা-নিমিত্তবাদ, নিরবচ্ছিন্ন গতির ধারণা ভেঙে ফেলেন। কোয়ান্টা জগতে, মাইক্রোওয়ার্ল্ডে আলোর গতিকে অনতিক্রম্য ও ধ্রুব ধরে আইনস্টাইন আনলেন আপেক্ষিকতা বাদ—রিলেটিভিটি। এই জগতের সনাতন বিজ্ঞানের স্পেস ও টাইমের পরমত্ব লোপ পায়, তাদের নিজস্ব স্বকীয় রূপ বজায় থাকে না। এখানে আছে চতুর্মাত্রিক স্পেসটাইম। এবং জানা যায় মেটার ও এনার্জি এ দুটির সম্পর্ক আছে। রেস্টমাস রূপান্তরিত হয় এনার্জিতে। আইস্টাইন জানালেন $E = mc^2$। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে দুটি ঘরানা—ম্যাক্রোওয়ার্ল্ডে—তার আলোর গতির অনতিক্রম্যতা নিয়ে আছে আপেক্ষিকতাবাদ এবং

মাইক্রোওয়র্ ান্ডে আছে কোয়ান্টাম গতিবাদ—যেখানে কাজ করে প্লাঙ্কের ধ্রুবক h ; মাঝখানে আছে সনাতন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিউটন-ম্যাক্সওয়েলের জগৎ—যে জগতে h এর মান শূন্য অথবা আলোর গতি অসীম ধরলে কোয়ান্টা জগতের আর বিশাল জগতের আইন-কানুন সরে পড়ে। এক কথায়—ফিজিক্সের আইনের মধ্যে নিয়মের অসুরূপত্ব না থাকুক—আছে পরিপূরকত্ব অথবা সম্পূরকত্ব। এই যে নিয়মের শৃঙ্খলের ইশারা—সে কি সব নিয়মের একটি উৎস যে থাকতে পারে তা জানায় না ?

নিয়ম আর নিয়মের মেলবন্ধন ঘটাবার চেষ্টা অনেক হয়েছে। মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্রের পথ পরিক্রমার গতিবিজ্ঞান আর পৃথিবীর বুকে জড় পদার্থের গতি বিজ্ঞান—যা গালিলিওর হাতে গড়া—দুটিকে এক নিয়মের সূত্রে বাঁধেন নিউটন। পাওয়া যায় ক্লাসিকেল মেকানিকস—সনাতন গতিবিজ্ঞান। আর উনিশ শতকে ফ্যারাডে প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য নিয়ে জেমস্ ক্লার্ক ম্যাকওয়েল জানালেন ইলেকট্রিসিটি ও ম্যাগনেটিজম হলো একটি শক্তির দুটি প্রকাশ—দুটিকে পাওয়া যায় ইলেট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকে। ম্যাক্সওয়েল ফিল্ডের ধারণা আনলেন। দূরে অথবা নিকটে শক্তি কি ভাবে বন্টিত হয়ে থাকে তার মডেল পাওয়া গেল ফিল্ডে। এলবার্ট আইনস্টাইনের পাঠগৃহে দেয়ালে নিউটন-ম্যাক্সওয়েলের ফটো টানানো ছিল। তিনি দুজনের ধারণাকে যেন এক করে জানালেন মহাকর্ষ-ক্ষেত্র-গ্রেভিটেশন ফিল্ডের ছবি। তাঁর জানান মহাকর্ষ শক্তি ফিল্ডের মডেলে জানা যায়। আর সাধারণতত্ত্ব প্রকাশের পর তাঁর একমাত্র চেষ্টা হলো মহাকর্ষ ও ইলেকট্রোম্যোগনটিক ক্ষেত্র দুটি একটি আরো সাধারণ তত্ত্বের আঙিনায় প্রতিষ্টা করা; তাঁর ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরী বা একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বে সবশক্তিকে টেনে আনা;—সব শক্তির একটি মাত্র উৎসকে খোঁজা। তিনি সে কাজে অসফল হলেন। কারণ কোয়ান্টাতত্ত্বটিকে এড়িয়ে তাঁর স্বপ্নের ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রচেষ্ট হলেন। কোয়ান্টা তত্ত্বের অনিশ্চিতি-অনির্দেশনাকে তিনি মানতে পারলেন না—অথচ সেই তত্ত্বটির অন্যতম পথিকৃত তিনি। এটিও যেন একটি অঘটন। একটি বিস্ময়। যার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কোয়ান্টাতত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো—মেটার এনার্জি এবং ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি কোনটিই নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আসে না—তারা আসে ঝলকে ঝলকে কোয়ান্টার পক্ষে। এই জগৎ যেন টেলিভিসনের পর্দা। দূর থেকে চোখে দেখলে দেখা যায় পরিচ্ছন্ন ছবি; অথচ সে ছবি অজস্র ছোট ছোট বিন্দুতে গড়া—তারা যেন কোয়ান্টা। —প্রফেসর জন হুইলার বললেন স্পেস যেন উপর থেকে পাইলটের চোখে দেখা

সমুদ্র—যাকে মনে হয় সমতল। অথচ সেই সাগরে ডুবে যাওয়া প্রজাপতিটি উথাল-পাথাল ঢেউএর দোলায় ডিগবাজি খায়, ছটফট করে। যত নিচে নামা যায় দেখা যায় তরঙ্গ বিক্ষুব্ধতা। আরো নিচে যেন আছে ঢেউয়ের সূত্রে গাঁথা পিঁপড়ের বাসা। হিজিবিজি টানেল।—স্পেসটাইমকে আইনস্টাইন বলেছিলেন জ্যামিতি। সেই জ্যামিতিক গতিবিদ্যা বা জিওমেট্রি-ডাইনামিক্‌সের শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র কোয়ান্টা জগতে স্পেস যেন সাবানের ফেনার বুদবুদে ভরা।—এই কোয়ান্টা স্পেস আর সেই জগতের মহাকর্ষ ক্ষেত্রটিকে চিনে একীভূত ক্ষেত্রতত্বে পৌছুনো যাবে—এটি হলো বর্তমান বিজ্ঞানীদের মত।

তিনটি শক্তিক্ষেত্রকে কোয়ান্টা তত্ত্বের আঙিনায় ধরা যায়। এরা হল এটমের কেন্দ্রকে যে সুস্থির করে রাখে—সেই নিউক্লিয়ার ফোর্স; এটমের কেন্দ্রে যে ফোর্স ভাঙন ধরায়, যার ফলে ধরা যায় রেডিও একটিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তা, যে পথে পাওয়া যায় আলফা, বিটা বা গামা কণাদের—সেই উইক বা দুর্বল ফোর্স। এবং ম্যাক্সওয়েলের ইলেকেট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স। এই ফোর্সের প্রসারণে অথবা ছড়িয়ে যাওয়া নির্ভর করে ফিল্ডকণার গতির উপর। প্রতিটি ফোর্সের আছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রকণা। ইলেকট্রোম্যানেগটিক ফিল্ডে আছে ফোটনকণা। নিউক্লিয়ার ফিল্ডে সমচার্জকণাদের বিকষণ ধারাকে জব্দ করে আকর্ষণের আংটায় বেঁধে রাখতে আছে মেসনকণা পায়ন। আর দুর্বল ক্ষেত্রের জন্য আছে এখনো অধরাডব্লিউ কণা (W)। ফোর্সের শক্তির তারতম্য কথা হয়। সবচেয়ে শক্তিশালী হলো নিউক্লিয়ার ফোর্স—এটি তড়িৎচুম্বক ফোর্স থেকে প্রায় 137 গুণ বেশি জোড়ালো। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্সকে ইউনিট ধরলে মোটামুটি বলা যায় নিউক্লিয়ার ফোর্সের মান 10^2, উইকফোর্স ইলেকট্রোমেগনেটিক ফোর্স থেকে 10^{13} গুণ দুর্বল। আর মহাকর্ষ শক্তি সবচেয়ে দুর্বল—তাড়ৎচুম্বক শক্তি থেকে 10^{36} গুণ দুর্বল। সাজিয়ে দাঁড় করালে সবার আগে দাঁড়ায় নিউক্লিয়ার ফোর্স, যার মান 10^2, তারপর তড়িৎচুম্বক ফোর্স বা কুলম্ব ফোর্স (একে ধরা হয় ওয়ান), তারপর উইকফোর্স (10^{-13}) ও সবার শেষে মহাকর্ষ (10^{-36})। এদের মধ্যে দুটি ফোর্স,—কুলম্ব ও মহাকর্ষ—কাজ করতে পারে অসীম দূরত্বে। অন্যদিকে নিউক্লিয়ার ও উইকফোর্সের কাজের চৌহদ্দি হলো এটমের কেন্দ্রটি মাত্র। এরা কাজ করে প্রায় 10^{-15} মিটার দূরত্বের জগতে।

ক্ষুদ্র দূরত্বে ক্ষুদ্র কণার জগতে মহাকর্ষের হাঁক-ডাক, ঘটা-পটা নেই। তার হাজিরা বিশাল জগতে—যেখানে মাস বা ভর অনেক বেশি। অন্যভাবে ভাবা

যেতে পারে ছোট জগতে যদি অনেক মাস হাজির হয়—যেমন পালসার, কোয়াসার, ব্ল্যাকহোল জাতীয় মহাজাগতিক বস্তু—সেখানে মহাকর্ষশক্তি অন্য সব-শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাজিরা দেয়। অল্প দূরত্বে বেশি মাসের সংবদ্ধতায় মহাকর্ষশক্তিকে হেলাফেলা করা যায় না। সেখানে চারটি শক্তি সমমর্যাদায় থাকতে পারে।

হাবেলের বর্ধমান বিশ্বলোকের ইঙ্গিতে ভাবা হয় বিশ্বজগতের একটি জন্মবিন্দু আছে— যার সাপেক্ষে বিগ ব্যাঙ থিয়োরির আবির্ভাব। জন্মের কাছাকাছি সময়ে, যেখানে সব মেটার ও এনার্জি এক সঙ্গে একটি ছোট বিন্দুমাত্রিক বীজে থেঁতো হয়ে থাকে—সেখানে সেই বিরাট ভরের সাপেক্ষে মহাকর্ষ ও অন্যান্য শক্তিরা জোট বেঁধে থাকে; সেই অঞ্চলে ধরা দেয়,—হয়তো বা মেটারের উৎসের মত—শক্তি বা এনার্জির উৎস;—মেটার এনার্জি বা ফিল্ড-চারটি একটি অন্যান্য অসাধারণ ক্ষেত্রে প্রোথিত; সেটি হয়তো ইউনিফায়েড ফিল্ড। মহাকাশ গবেষণার পথে এই চিন্তার ছাপ উঁকি মারে। তবে সেই উৎস অঞ্চলে, প্রচণ্ড শক্তির জগতে, কী যে ঘটতে পারে তার কোনো মডেল এই জগতের কোনো লেবরেটারিতে করা সম্ভব নয়। এখানে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব নয়। যা সম্ভব—তা পরোক্ষ প্রমাণ।

অন্যদিকে মহাকর্ষের ক্ষেত্রকণা যার নাম গ্রেভিটন—তাকেও ধরা যায় না। ধরা যায় না মহাকর্ষতরঙ্গ। হয়তো প্রবল মহাকর্ষ অঞ্চলে এই কণা, এ তরঙ্গ ধরা যাবে। তবে সেই মহা আকর্ষণের কবল থেকে খবর নিয়ে হরকরা কি ফিরে আসতে পারে? সেখানে আলো যে তার অনেক আগে গতি হারা!

আরো প্রশ্ন তোলা হয়। ধরা যাক, একটি নিয়মে একটি ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রদের বাঁধা হলো। এই একমাত্র নিয়ম যখন অন্য পরিবেশে পরিসরে দ্বিধা-ত্রিধা-চতুর্ধা হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই বাঁধন ছেঁড়া জায়গায় বা সময়ে কি ঘটে? ঘটতে পারে?… অতি মহাকর্ষ শক্তি যখন সৃষ্টির প্রারম্ভিক সীমায় দেখা দেয়, তখন সে কি শুধুই আকর্ষণ? কণারা কোথা থেকে জন্মায়? হঠাৎ হাজিরাদেয়া কণারা ধার করা এনার্জি নিয়ে এক সেকেণ্ডের 10^{-20} ভাগ কম সময়ে উঁকি দিয়ে কোনো পিছুটান না রেখে কোথায় ফিরে যায়? সে কি শূন্যতা?

এইসব চিন্তা আকুল করে তোলে। তেমনি ভাবা হয় প্রাথমিক বা মৌলিক কণা কি? 1963 সালে মারে গেলমান ও জর্জ ৎস্থইস হেড্রন বা ভারি কণার জন্য একটি মৌলকণার কথা জানালেন কোয়ার্ক। অন্যদিকে হালকা কণা

লেপটনরা কোয়ার্কে তৈরি নয়। এখানেও প্রশ্নের শেষ ঘটে না। তারপরও প্রশ্ন ওঠে কোয়ার্ক কিসে তৈরি?

অতি ক্ষুদ্র স্পেস—যা পিঁপড়ে-বাসার মত হিজিবিজি টানেলে ভরা—যেন সাবানের ফেনায় বুদবুদে গড়া—সেখানে ক্ষুদ্রতম অঞ্চলে টানেলে পোকার বাসার মত গর্ত নিয়ে দুটি ছোট স্পেস জোট বাঁধে। এই যে স্পেস তার যেন মাস আছে। আর এই মাসআলা ছোট্ট স্পেস—সে হলো মহাজগতের স্পেসের মূল মেটার, তার কোয়ান্টা। যার ভর 10^{-5}gm। এই এনার্জির পুঁটুলি স্পেসটিকে নাম দেখা হলো জিওন (Geon)!—এই কি শেষ? পলডেভিস বিরক্তিতে বললেন, 'এসবের শেষ কোথায়? এই কোয়ার্ক বা জিওন এদের ধারাবাহিক হাজিরা টেনে কাজের কাজ শেষ কি হবে?' ছোট থেকে ছোট তার থেকে ছোট, তার থেকে···। এ যেন তিমি কে খায় তিমিঙ্গিল, তাকে খায় তিমিঙ্গিলগিল, তাকে খায় তিমিঙ্গিলগিল গিল······ইত্যাদি নাযতার উলটো পুরান।

এই সমস্যার আংশিক সমাধান ঘটে একীভূত ক্ষেত্র-তত্ত্বের আওতায়। প্রাথমিক কণা দিয়ে ভাবনা না করে, প্রাথমিকতায় না হাজির হয়েও ভাবা যেতে পারে একটি অনন্য ক্ষেত্র আছে, আছে একটি অ-সামান্য অ-সাধারণ শক্তি। যার নিয়মের ফাঁদে ধরা চারটি ফোর্স, চারটি ক্ষেত্র-যারাই জানায় পার্টিকল বা কণাদলেন আচার ব্যবহার। এক কথায় প্রাথমিক কণা নয়, খোঁজা হবে প্রাথমিক শক্তিটি—যে শক্তিধারা থেকে পাওয়া যায় চারটি প্রবাহ। তাদের অববাহিকায় আছে সব কণা, সব মেটার, সব এনার্জি।—আইনস্টাইনের চিন্তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায় না।

তবে বর্তমানের একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের চিন্তায় আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু নেই। এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপানে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক আর উইকফোর্সের জোট বাধান হলো। দুটি ফোর্সকে একটি জটিল ধারায় মিলিয়ে যা পাওয়া যায়, তার পরোক্ষ প্রমাণ লেবরোটরিতে মিলে যায়। এই দুই ফোর্সের মিলিত ধারার নাম হলো ইলেক্ট্রো উইক। এটিও একটি ক্ষেত্র। অতএব এরও একটি ক্ষেত্র কণা থাকবে। যা অন্যান্য ক্ষেত্র কণার মত বোসন। তবে W কণার মত এই কণা ধরি ধরি হয়ে ধরা বুঝি দেয়। এই ইলেকট্রোউইক তত্ত্বের ঘোষণা হলো 1·60-সালে আব্দস সালাম ও ভিনবার্গের কাছে। এবং এই থিয়োরীর বিস্তৃতি ঘটে শেলডন গ্লাশো (Glasho) র হাতে। আর সব শেষে তত্ত্বের প্রমাণ পাওয়া যায় বিরাট দৈত্যাকার একসিলারেটরে যেটি ইউরোপের CERN লেবরেটারিতে আছে। এই যে ইলেকট্রোউইল ফোর্স—যার প্রমাণ মানুষের তৈরি লেবরেটারিতে

ঘটেছে—সে ছিল বিশ্বজগতের জন্মক্ষণে। প্রথম বিগব্যাঙ বিস্ফোরণের 10^{-11} সেকেণ্ড পর, যখন টেম্পারেচার প্রচণ্ড। সেই বিশ্বজগতের আকার ধরা হয় সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর কক্ষপথের সমান আর তার ডেনসিটি হলো একটি এটমের নিউক্লিয়াসের 10^{12} গুণেরও বেশি।

এই প্রাথমিক একীকরণের পর ভাবা হয় মহাএকীকরণ বা Grand unificaton এর কথা। এখানে ইলেকট্রোউইক আর নিউক্লিয়ার ফোর্স এক জোট বাঁধে। এই ত্রয়ী ফোর্সের একীভবনকে বলা হলো ইলেকট্রোনিউক্লিয়ার। এখানে যে শক্তির কথা ভাবা হলো তা ইলেকট্রোউইক ফোর্সের চেয়ে অন্তত 10^{12} গুণ বেশি। এই শক্তিকে মানুষের লেবরেটারিতে তৈরি করা যায় না এবং হয়তো, বিশ্বজগতের কোথাও এই শক্তি পাওয়া যায় না। তবু মহাবিশ্ব সৃষ্টির কোন একটি ক্ষণে, 10^{-11} সেকেণ্ড আগে, যখন বিশ্বলোক আরো সঙ্কুচিত ছিল, তখন সেই বিশাল শক্তি ক্ষেত্রে তিনটি শক্তির একীভবন ঘটেছিল। আজ থেকে বিশবিলিয়ন বছর আগে যা ঘটে গেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তবে ফোর্সের উপস্থিতির স্মৃতিচিহ্নের পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে। সময়ের ধারা বেয়ে আমাদের কালে সেই স্মৃতি অস্পষ্ট অস্ফুট আকারে ইতস্ততঃ ভঙ্গীতে আসতে পারে। তাকে পরীক্ষার পথে চেনা দরকার। এখানে দুটি পরীক্ষার কথা ভাবা হয়। দুটিই থিয়োরীর প্রমাণ। যে প্রমাণটি অনেক প্রবল তা হলো সৃষ্টির সেই আদিমকালে যে মেটার তৈরি হতে পারে তা ম্যাগনেটিক মনোপোল—যা একটি ছোট ম্যাগনেটের মত, তবে তার একটি মাত্র পোল আছে। মহা একীকরণের সমীকরণ এই মনোপোলের সৃষ্টির কথা জানায়। একে খোঁজা হয়। ব্লাস কাবরেরা (Blas Cabrera) এই মনোপোল ধরার জন্য স্টানফোর্ড ইউনিভার-সিটিতে সূক্ষ্মতম জাল পাতেন। 1982 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হঠাৎ যেন মনে হয় জালে পাখি ধরা পড়েছে। তবু পাখিটিকে স্পষ্ট চেনা যায় না। এবং দ্বিতীয় বার মনোপোল নামক পাখিটির আবির্ভাবও আর ঘটে না।

দ্বিতীয় নাটকীয় প্রমাণের কথায় বিজ্ঞানীরা বললেন গ্র্যাণ্ড ইউনিফিকেশন জানায় প্রোটনের লয় ক্ষয় আছে। তার হাফলাইফ বা অর্ধজীবন হলো 10^{32} বছর। এই মহাবিশ্বের বয়স হয়তো 10^{22} বছরের কোঠায়। অর্থাৎ প্রোটন আরও দীর্ঘজীবি। সালাম ও জগদীশপতি প্রোটনের এই ছোটখাট জীবনের কথাটি জানালেন। প্রোটন ভেঙে যায় ঠিকই, তবে তার ভাঙন টের পাওয়া মুস্কিল। অন্যদিকে ভাবা হয় 10^{34} টি প্রোটনকে একসঙ্গে রাখলে একটি না

একটি প্রোটন দিনে বা সপ্তাহে ভেঙে যাবে। সেই চেষ্টা চলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। এমন কি ভারতবর্ষেও।

যে নতুন শক্তিক্ষেত্র পাওয়া যায়, যা বর্তমানের তিনটি শক্তিক্ষেত্রকে একীভূত করে গড়ে ওঠে, তাদের কার্যক্ষমতা কিন্তু নিউক্লিয়ার বা উইকফোর্সের চেয়েও কম জায়গায় ঘটবে। দূরত্ব বাড়লে মূলধারা থেকে শক্তিক্ষেত্র আলাদা হয়ে পড়ে। তারাও কাজ করে নিজস্ব চৌহদ্দিতে। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির 10^{-35} সেকেণ্ড কালে এই ইলেকট্রো-নিউক্লিয়ার শক্তি উপস্থিত ছিল। তখন মহাবিশ্বের আকার ছিল ফুটবলের সমান আর তার ডেনসিটি ছিল এটমের নিউক্লিয়াসের 10^{50} গুণ বেশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতের আকৃতি বাড়ে, ডেনসিটি কমে, কমে টেম্পারেচার। এবং ইলেকট্রো-নিউক্লিয়ার ফোর্স ভেঙে পাওয়া যায় ইলেকট্রোউইক ও নিউক্লিয়ার ফোর্স। তেমনি ইলেকট্রোউইক ফোর্স ভেঙে যায় দুটি ধারায়; ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ও উইকফোর্সের এই দ্বিধাকৃতি, গ্লাশোর মতে, আপনা থেকে সমতা ভেঙে গড়ে ওঠে। গ্লাশো বললেন, এ যেন সল্ট বা লবন। যখন এটি তরল, তখন এখানে থাকে সুষমা। যখন শীতল হয়ে ক্রিস্টাল হয়, তখন সেই সুষমা বজায় থাকে না প্রতিটি ক্রিস্টাল অন্য কোণ থেকে দেখলে আলাদা ছাঁদের মনে হতে পারে। অথবা যেমন বার ম্যাগনেট; কুরী পয়েন্টের উপর টেম্পারেচার বাড়ালে চুম্বকধর্ম নষ্ট হয়, উত্তর দক্ষিণ মেরুর নির্দেশনা থাকে না। আবার শীতল করলে চুম্বকত্ব ফিরে আসে; তবে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর দিক চিহ্ন পালটাতে পারে—আগে যা ছিল উত্তর মেরু—সে পরে হতে পারে দক্ষিণমুখী। এখানে কাজ করে সম্ভাবনার শর্ত। একটি সুষম অবস্থার পরিবর্তে যে বিষম অবস্থা দেখা দেয় সেটি নির্ভর করে পরিবেশের উপর। যে উত্তপ্ত পরিবেশে তিনটি ফোর্স এক হতে পারে, আজকের শীতল মহাবিশ্বে তারা আলাদা আলাদা থাকে। সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে, স্পেসটাইম মেটার এনার্জি সেই ঘন সন্নিবদ্ধ মহা মহাকর্ষ জগতে যে ভাবে জাপটাজাপটি করে থাকে, বিস্তারিত বিশ্বের খোলা আঙিনায় তাদের হাত পা মেলে আরামে শুয়ে থাকা। মহাকর্ষের লেপমুড়ি দেবার কথাও মনে থাকে না। অন্যদিকে ফোর্সরা যখন পরস্পর পরস্পরকে জাপটে ধরে আঁট-সাঁট হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তার মাঝের অংশে, সময়ের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশে কী যে ঘটতে পারে তার কোনো ধারণা নেই। সে যেন এক উষর মরুভূমি—যেখানে কল্পনার মরিচীকা হাতছানি দেয়, দিশেহারা অবস্থা জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞানী মার্টিনাস ভোল্টমান (Martinas Voltman) সেই অবজ্ঞাত জগৎটিকে বললেন "কল্পনার মরুভূমি" (Desert of imagination)

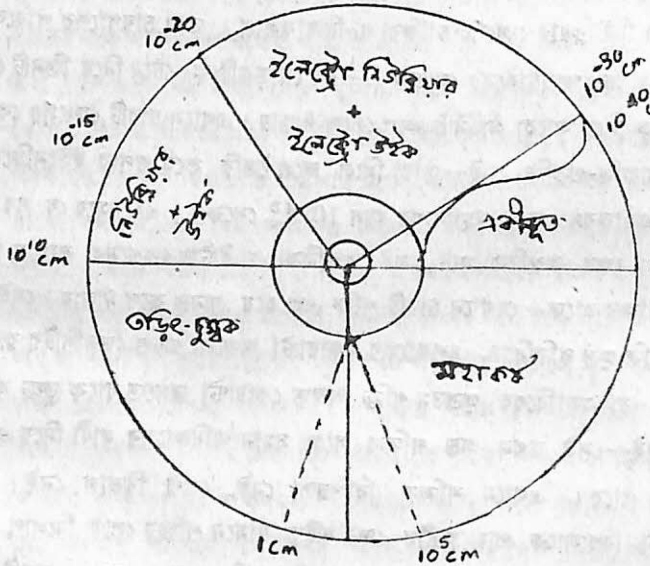
সেখানে হয়তো অনেক জিজ্ঞাসা. অনেক তথ্য সংগ্রহ, অনেক জানা খোঁজার পথে ফুল ফুটতে পারবে। মহাকাশের বিবর্তন ধারাটি সুস্পষ্টভাবে না জানালে আজকে সেই মরুভূমিতে ঝরে যাবে শুধু হতাশা আর পরিশ্রমের দীর্ঘশ্বাস। অনেক মরু পার হলে ছায়াতরুর দেখা পাওয়া হয়তো সম্ভব।

10^{-35} সেকেণ্ড বয়সের মহাবিশ্ব তিনটি ফোর্সকে এক করে মহাকর্ষকে সঙ্গে নিয়ে ছিল। সেই মহাবিশ্বে ছিল স্পেসটাইম ও মেটার-এনার্জি। এই মহাকর্ষের পটভূমিতে তিনটি ফোর্সের ক্রিয়াকলাপ। গ্রাশো বললেন, যেমন পাত্রের মধ্যে জল রাখলে জলটি পাত্রের আকার নেয়, তেমনি সেই প্রবল মহাকর্ষ ক্ষেত্রে ইলেকট্রো নিউক্লিয়ার ফোর্সের ছাজিরা বা ক্রিয়াকলাপ। তার চারপাশের পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে আছে স্পেসটাইমের মোড়ক —এই মোড়কটিকে টেনে নিয়ে তিনটি ফোর্স মহাকর্ষকে নিয়ে আরো আঁটসাঁট করে সেজে দাঁড়ায়। এখানে চারটি ফোর্সের কোনো নিজস্ব আকৃতি-প্রকৃতি নেই—তারা মিলে জুলে তৈরি করে সুপার ইউনেফিকেসন বা অতিএকীকরণ। তখন মহাবিশ্বের বয়স 10^{-43} সেকেণ্ড! এই সময়ে যে সব কণা মেটার বা বস্তুর অন্তক্রিয়া ঘটে সেই অন্তক্রিয়া বা ইণ্টারএকশনের লাগাম আছে একটি শক্তির হাতে—যেখানে চারটি শক্তি এক হয়ে অনন্য রূপে দাঁড়ায়। সেই ক্ষুদ্র সময়ে অতি ক্ষুদ্র পরিধিতে, দেশকালের কোয়াণ্টা অঞ্চলে, প্রচণ্ড ডেনসিটির রাজত্বে মহাকর্ষ—যা মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রতম শক্তি, অন্তত কোয়াণ্টা জগতে যাকে তুচ্ছ করলে ক্ষতি নেই—সেই তখন অন্য শক্তির সঙ্গে সমান অধিকারের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। এখানে শক্তির বিভিন্নতা নেই, শ্রেণী বিভাগ নেই। এই কোয়াণ্টা বিশ্বলোকে প্রায় অসীম ডেনসিটির সামনে শক্তির শ্রেণী বিলোপ ঘটে। পরিপূর্ণ সাম্য ভাব নিয়ে একটি মাত্র শক্তির নিয়ম দেখা দেয়। চারটি শক্তি ক্ষেত্র এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঞ্চলে একটি উৎসে হাজির হয়। পাওয়া যায় আইন-স্টাইনের একীভূত শক্তি।

বিশ্বের জন্মক্ষণটি এইখানেই নয়। 10^{-43} সেকেণ্ড আগেও বিশ্ব বর্ধমান ধারায় ছিল। এই সময় ও এই আকারের নিচেও সময় ছিল, আকার ছিল। তবে সেখানে আমাদের চেনাজানা ফিজিক্স পা বাড়াতে অক্ষম। যে মহাকর্ষ তত্ত্ব নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু সে আর বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। একীভূত শক্তি ক্ষেত্র সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা সে জুগিয়ে যেতে পারে। তার বেশি ক্ষমতা নেই। সুপার ইউনিফায়েড থিয়োরীটি যদি আরো বিশদভাবে বোঝা যায়, জানা যায়, তবে হয়তো আরো গভীরে দৃষ্টি দেয়া সম্ভব। নইলে বর্তমানের খোঁজার

পথে ঐ 10^{-43} সেকেণ্ডে মহাবিশ্বটি দিগন্ত রেখা টেনে দিয়ে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। দিগন্তের বাইরে কি ঘটে, ঘটতে পারে তার তালাশ বা হদিশের পথ আজকের বিজ্ঞান দিতে পারে না। এ যেন আর এক ব্ল্যাকহোল ; কেন্দ্রে কি ঘটে জানা যায় না। এখানে মহাবিশ্বের আরো ছোট বয়সে ছোট আকারে কি ঘটে জানা বোঝার উপায় নেই।

এই একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের গঠনের ধারায় কোয়াসার নিয়ে আরো একবার আলোচনা ওঠে। প্রাথমিক বিশ্বে যে সব গেলাক্সি গড়ে উঠেছিল, ধরা হয় তারা



গ্রাশোর সাপের খেলা

বিরাট, বিশাল। এই বিশালত্বের জন্য তার দ্রুত জ্বালানী ফুরিয়ে সঙ্কোচনের ধারায় ব্ল্যাকহোল হয়ে ধরা পড়ে! যেমন বিবর্তনের পথে পৃথিবীর প্রাণ জগতে আসে ডাইনোসরের মত বিশাল প্রাণী, বিবর্তনের ধারায় মহাবিশ্বে দেখা দেয় বিরাট গেলাক্সি, বিরাট নক্ষত্র, যাদের আকারটি সুস্থির রাখতে, প্রবল মহাকর্ষের সঙ্কোচনের ধারাকে বাধা দিতে অনেক তাপ, অনেক চাপের প্রয়োজন। নিজের আকার বজায় রাখতে তারা দম ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে ব্ল্যাকহোলে দাঁড়ায়। প্রাণ রাখতেই তাদের প্রাণান্ত! এই গেলাক্সির মধ্যে বিরাট ভরের কোয়াসার নামের ব্ল্যাকহোলরা চারপাশের গেলাক্সির অবশিষ্ট দেহাবশেষ টেনে নিয়ে নিজের কেন্দ্রে ফেলছে। টানের পথে

ধরা পড়ে বিকিরণ। বর্ধমান বিশ্বলোকের ছবিতে এই প্রাথমিক গেলাক্সিরা তাদের কোয়াসার নিয়ে আমাদের গেলাক্সি থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাই এরা আছে সুদূরে, তাদের বিপুল ভর আর ক্ষুদ্র আকার নিয়ে। এই আইডিয়ার সাপেক্ষে কোয়াসারের একটি প্রায় সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া যাচ্ছে। তবে এর প্রমাণ কোথায়? অন্যদিকে এই কোয়াসার অঞ্চলে অতি মহাকর্ষ ক্ষেত্রের ধারণা করা যাবে—যে মহাকর্ষ অন্য ফোর্স কটির প্রতিযোগী হয়ে এই অঞ্চলে দাঁড়াতে পারবে। একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব গঠনের প্রমাণ আবার কোয়াসার। বড় গোলমেলে এই কোয়াসার!

দূরে কোয়াসার আর ছোট দূরত্বের প্রাথমিক বিশ্বের মহাকর্ষ নিয়ে ভাবতে গিয়ে গ্লাশো দূরত্বের সঙ্গে ফোর্স বা ইন্টার-একশনের সম্পর্কের একটা আইডিয়া গাঁথেন। গ্লাশোর কল্পনায় মহাবিশ্বের ফোর্স আর দূরত্ব যেন একটি সাপ, যে তার মুখে ল্যাজ কামড়ে ধরে আছে।

গ্লাশো বললেন, অতিক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যে 10^{-43}সেকেণ্ড কালে মহাবিশ্বে ছিল একটি ফোর্স—একীভূত ক্ষেত্রশক্তি। তার উপরে কাজ করে গেছে প্রথমে ইলেক্ট্রো নিউক্লিয়ার পরে ইলেক্ট্রো উইক নামের একীভূত শক্তি। এরা কোনো এক জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। 10^{-20}cm থেকে 10^{-30} cm দূরত্বের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফোর্স তার স্বকীয়তা নিয়ে ধরা দিয়েছে। এখানেই সে পেয়েছে স্বাতন্ত্র্য। অন্যদিকে 10^{-20}cm দূরত্বে নিউক্লিয়ার ফোর্স আর উইক ফোর্স আলাদা হয়ে বিশ্বলোকের মেটার সৃষ্টিতে কাজে নেমেছে। নিউক্লিয়ার ফোর্স যখন বিপরীত চার্জের কণাদের একত্র করতে শুরু করে তখন উইক ফোর্স সেই কাজে ভাঙন ধরায়। ফলে সমতা আর সুষমা ধরা দেয়। মেটারের জগতে শ্রী আর সুছাঁদ জেগে ওঠে। মৌলকণাদের পাওয়া যায়। এই কণাদের উপস্থিতিতে ইলেক্ট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স কাজে নামে। কণায় কণায় মালা গাঁথা শুরু হয়! আসে এটম-মলিকুল, পরমাণু আর অণু এবং প্রাণ। রসায়নের শুরু হয়। শুরু করে ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্স। অনুকুল পরিবেশে মানুষের আবির্ভাব হয়। তারা সব আটকা থাকে মহাকর্ষের পটভূমিতে। ঠিক কখন যে মহাকর্ষ চুপিসারে কাজে এসে নেমেছে, তা বিজ্ঞানীদের জানা নেই। জানা আছে I cm এর চেয়ে বেশি দূরত্বে মহাকর্ষের গোপন হাজিরা। ইলেক্‌ট্রো ম্যাগনেটিক ফোর্সের পিছনে পিছনে এসে কোনো এক সময়ে তার সহযোগী হয়ে মহাকর্ষ দূরের জগতে প্রধান স্থানটি অধিকার করে নেয়। সেই দূরত্বটি প্রকট হয়ে দাঁড়ায় পৃথিবী থেকে দূরে। আর অনেক দূরত্বে, এক বিলিয়ন আলোক-বর্ষের দূরের জগতে কোয়াসার মহা গেলাক্সির, রাজত্বে মহাভর আর ক্ষুদ্র আকারের

ব্ল্যাকহোল-কোয়াসার পালসারের চারপাশে, মহাকর্ষ কি ভাবে কাজ করে সেটি অজানা। হয়তো সেইখানে ছোট দূরত্বে যা ধরা পড়ে—সেই একই অনন্য শক্তি বড় দূরত্বে হাজির হয়। সাপের ল্যাজ আর মুখ এক হয়ে দাঁড়ায়। যে শক্তি প্রাথমিক ভাবে হাজির হয়—হয়তো সুদূর লোকে সেই শক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে। এটি যদি ঘটে, তবে সৃষ্টির শেষে বিনাশ, আবার বিনাশের পর সৃষ্টির প্রবহমানতা ধরা দেয়। বলা যায়, মহাবিশ্বের যেমন সৃষ্টি আছে, তেমনি আছে তার মৃত্যু এবং আছে স্পেসটাইম নিয়ে তার পুনর্জন্ম। এইসব আইডিয়া গড়ে ওঠে একটি মাত্র সূত্রকে অনুসরণ করে—সেটি হলো ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন। এরই সাপেক্ষে বিজ্ঞানীরা গণিতের সাহায্যে বলতে পারেন সৃষ্টির তুই মিনিট পনের সেকেণ্ড পর মহাবিশ্বে হিলিয়াম সৃষ্টি শুরু হয়। আর হাইড্রোজেন তৈরি হয় সৃষ্টির পর এক মিনিট সময়ের মধ্যে। এই ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশন সূত্রটি কত যে ইম্পর্টেন্ট! বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্পের সূচনাতে এই সূত্রটি—মহাবিশ্বের জন্ম সমস্যা। তবু সেই সমস্যার সমাধানে বিজ্ঞানী গোয়েন্দারা $10^{-৪৩}$ সেকেণ্ড কাল পর্যন্ত যেতে পারেন। তারা মৃতদেহ দেখে ঠিক কখন যে ঘটনাটি ঘটেছে তার সঠিক কালটি বলতে পারেন না। ঐ ক্ষুদ্র সময়ে যেন বিশ্ব-শরীরে রিগার-মর্টিস শুরু হয়েছে—প্রচলিত বিজ্ঞান এখানে অক্ষম।

তবু বিজ্ঞানে প্রশ্ন তোলেন বিজ্ঞানীরা। একটি প্রশ্ন হলো এই মহাবিশ্ব কোথা থেকে এল? এই যে বীজ—যার থেকে শুরু মহাবিশ্বের—যেখানে ছিল সব সংবাদ উপকরণ ঠাসা—তার জন্ম কোথায়? কেন তার আগমন? সে কে? সে কি?

না, বিজ্ঞান এর উত্তর বর্তমানে দিতে পারছে না, ভবিষ্যতেও এইসব প্রশ্নের উত্তর যে পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবু প্রশ্ন কটিকে এড়িয়ে রাখা যায় না। প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা ওঠে। এই আলোচনাটি হলো নব বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব বা জেনেসিস নিয়ে চিন্তা ভাবনা। এখানে যে উত্তরটি সম্ভব বলে মনে হয়—তা হলো সব কিছুর শুরু কোনো কিছুর অস্তিত্বের বাইরে। শূন্যতা থেকে শূন্যতাকে বুকে নিয়ে সৃষ্টির শুরু। এই শূন্যতা তত্ত্বের ধারণা আনলেন প্রিন্সটনের বিজ্ঞানী এলান গুথ (Alan Guth) এবং রিচার্ড গট (Richard Gott)। গুথ বললেন, সৃষ্টির প্রথম মুহূর্তে একগুঁয়ের মত বিশ্বলোক প্রচণ্ড বেগে বর্ধমানের পথে চলেছে। সৃষ্টির সেই মুহূর্তে মহাবিশ্বের যে অবস্থা, তাকে বলা যায়, মিথ্যে-শূন্য অবস্থা (False vacuum)। এই শূন্যতাতে মেটার ছিল না ছিল এনার্জি, আর

এনার্জি থেকে, মেঘ থেকে বৃষ্টি ধারা নামার মত, মেটারের টুপটাপ ঝরে পড়া। মেটার হাজির হওয়ায় ক্ষেত্রতত্ত্ব হাজির হতে পারে। অতি বর্ধমান বিশ্বলোকের মডেলে শূন্যতা হাজির হয়—যে শূন্যতা হলো ফিজিক্সের অচেনা অজানা। গুথের পথে 10^{-43} সেকেণ্ড আগে পা বাড়ান যায়। তবে সৃষ্টির আগে কি ছিল?

গট বললেন মিথ্যে শূন্য অবস্থাতে অনেক বিশ্বলোক সহসা বুদবুদের মত হাজির হয়েছিল। সম্ভাবনার অসীম ধারায় এই বিশ্বলোক তার একটি। সব বিশ্বলোক শেষ হচ্ছে মিথ্যে-শূন্য অবস্থার আন্দোলনে।

—না, গটের চিন্তাতেও সৃষ্টি বিন্দুর আগে পা ফেলা যায় না। বরং বলা যায় অগণিত মহাবিশ্ব তৈরি না হলে আমাদের চেনা, জানা বিশ্বলোক যে পাওয়া যায় না, সম্ভাবনার শর্ত পূর্ণ না হলে নিশ্চিতকে যে বেছে নেওয়া যায় না, সেই তত্ত্ব যা বিজ্ঞানী এভারেট জানিয়েছিলেন, বিগ ব্যাঙের আঙিনায় তাকে সাজিয়ে তুলেছেন বিজ্ঞানী গুথ আর গট! 10^{-43} সেকেণ্ড আগে যে শূন্যতা ছিল, সে এখনও শূন্যতায় ভরে আছে।

এই শূন্যতায় ভরে থাকা চিন্তাটিও বিজ্ঞানীদের ভাবনার। নিউটনের শূন্যতা হলো সেই অবস্থা যেখানে কোনো কিছু নেই—না মেটার, না এনার্জি। সেই রঙ্গমঞ্চে মহাজাগতিক নাটকের অভিনয় শুরু! আইনস্টাইনের শূন্যতা হলো দেশকালের সেই শূন্যতা, যেখানে আছে তার জ্যামিতিক অবস্থা—যে অবস্থাটি নাটকে অংশী। এই শূন্যতা যেন গাণিতিক শূন্য—যে গুণের সময় বজায় রাখে তার শূন্যতার প্রকৃতি, ভাগের সময় যে তুলে ধরে অসীমকে। যে শূন্যতা সৃষ্টির অংশ। এরই পথ ধরে কোয়ান্টামবাদে জানানো হয় শূন্যতা হলো কণা আর ক্ষেত্রের ফেনা। এখানে দেশকালের অনবচ্ছেদ রূপ থাকে। দেশের গুণ প্রধান হলে যাকে মনে হয় কণা, সময় বা কালের গুণ প্রধান হলে সে তরঙ্গ; সে ক্ষেত্রবোধ জাগিয়ে তোলে। সব মেটার কণাতরঙ্গ; কারণ একে দেখা হয় চতুর্মাত্রিক জগতের পটভূমিতে। মেটার হলো দেশকালের মুকুরের ছবি। কোয়ান্টাম শূন্যতায় সেই দেশকাল থাকে—থাকে কণা ও ক্ষেত্র। কণা অবস্থায় সে ক্ষেত্রের কাছে শূন্য; সে যখন ক্ষেত্র, তখন তার কণাবোধ নাই। এওতো শূন্যতা!

কোয়ান্টা জগতে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সাম্রাজ্যে এই শূন্যতা আছে—তারা অগণিত, অসংখ্য। এরা অনেক বলেই এখানে যে কোনো ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনার নিশ্চয়তা নেই। সব কিছু সম্ভাবনার শর্তে প্রোথিত হয়ে আছে। মেটার

এনার্জি, এমন কি তাদের উপস্থিতি-অনুভূতিটুকুও টুকরো টুকরো অংশে গাঁথা। এই টুকরো নিয়ে গাঁথা মালাটিই আমরা প্রকৃতির গলাতে পরাতে পারি। এটিই একমাত্র প্রকৃতিকে বেঁধে ফেলার হাতিয়ার। নিশ্চয়তাকে বিসর্জন দিয়ে স্ট্যাটিস-টিকস পদ্ধতির ছাঁচে ভূত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান—এই তিনকালের ইতিবৃত্তের ঘোষণা। এই ঘোষণার পথে ধরা দেয় অনির্দেশ কণা—যারা রিয়েল (Real) নয়, যারা ভারচুয়াল (Virtual)। যাদের গুণধর্ম রিয়েল পার্টিকল বা কণার মত হলেও, তারা আছে শূন্যতার রাজ্যে; শূন্যতাকে বুকে নিয়ে। শূন্যতাতে শক্তি জাগলে এই ভারচুয়াল কণা হাজির হয়—যারা অবশেষে তৈরি করে মৌলকণাদের। এরা হলো দুটি ঘটনার মধ্যে যে শূন্যতা—তার বাসিন্দা। সৃষ্টি ও লয়ের মাঝের পথের পথিক। এরা কি মহাবিশ্বের জন্মমৃত্যু ও পুনর্জন্মের পথেও হাসিমুখে এসে দাঁড়ায়?—সেই উত্তর নেই। শুধু জানা যায়, যাকে মনে হয় সুস্থির প্রশান্ত, তার অন্তরেও কাজ করে কোয়ান্টার আন্দোলন। শূন্যতার মাঝে আন্দোলন আলোড়নে নামে ভারচুয়াল কণা। মহাবিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায়, যখন সে অতি ক্ষুদ্র, যাকে মনে হয় শূন্য—সেই শূন্যতাতে মেটার নেই, ছিল ভারচুয়াল কণা। যাদের নিয়ে সৃষ্টি শুরু। এখানে কোয়ান্টার একটি দিগন্ত রেখা—সীমারেখা টেনে ফিজিক্সের আইন-কানুন নিয়ে বিগ ব্যাঙের পথে মহাবিশ্বের জন্মের ইতিবৃত্ত গড়ে তোলা যায়। সেই শূন্যতার পারে ফিজিক্স দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যতাকে না জানলে গভীরে যাওয়া যায় না। এই দিগন্তের বাইরে কি থাকে?—মহাশূন্য?—ঐ মহাশূন্যের ওপার থেকে যে সঙ্গীত ভেসে আসে কোনোদিন কি তা শোনা যাবে না?

ভিন্ন দেখা

এলেম নতুন দেশে

পি.এইচ.ডি থিসিস পাবার পর মাক্স প্লাঙ্ক তাঁর শিক্ষক ফিলিপ জোলিকে একটি চিঠি লেখেন ; উদ্দেশ্য-তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার গবেষকের ক্যারিয়ারটি বেছে নেবেন কি না—তাই জানতে চাওয়া। জোলি লিখলেন, 'শোন ছোকরা, মিথ্যেমিথ্যি জীবনটাকে বরবাদ করবে ? তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যার শেষ হয়ে গেছে ; সব ডিফারেন-শিয়াল ইকুয়েশনের সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি যা ছুটছাট সামান্য কিছু আছে তা হলো প্রাথমিক সীমার ধারণায় উনিশ-বিশকে টেনে। ভবিষ্যৎ যেখানে প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতে পারে-না—সেই ক্যারিয়ার বেছে করবে কি ?' আর 1900 সালের আগস্ট মাসে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ হিলবার্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গণিতবিদের কনফারেন্সে তাঁর সেই সুবিখ্যাত তেইশটি সমস্যা পেশ করলেন ; যার একটি—ষষ্ঠটি হলো, পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত বা Axiom নিয়ে। হিলবার্টের মতে, সব জানাশোনা সিদ্ধান্তগুলো ঠিকমতন সাজালে গুছালে পদার্থবিদ্যার জগৎটি একেবারে যুক্তি দিয়ে গড়া ছবিটি হয়ে দাঁড়াবে ; সামান্য যেটুকু ফাঁক-ফোকর ক্যানভাসে আছে সেসব ভরে তুলতে দেরী হবে না।…

…বেচারা জোলি ; বেচারা হিলবার্ট ! সব জানাই যে শেষ জানা নয় সেটি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সেকালের বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের দেয়ালে ঘা মারতে শুরু করেছে। ফিজিক্স বা পদার্থবিদ্যা শেষ হয়েও শেষ হয় না। উনিশ শতক, আরো একবার দেখে, মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী !

সনাতন বিজ্ঞান যা উনিশ শতকের ঘরানা, মাক্স বোর্ন দেখেন তার বিশেষত্ব হলো পরীক্ষিত বা (Object) আর পরীক্ষক—দুজনেই তারা স্বাধীন। যে যন্ত্র দিয়ে এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা হচ্ছে—তার ত্রুটি থাকে। তবে তার প্রভাব অবজেক্ট বা বস্তুর উপর সাংঘাতিক কিছু নয়। আর একটি ফিজিক্যাল ফেনোমেনা বা প্রাকৃতিক ব্যাপারকে তার পথের ধারণা না টেনেও চিনতে বুঝতে প্রয়াসী হওয়া যায়। নিউটনের জানানো মহাজাগতিক গতিবিজ্ঞান এই পথেই গড়ে উঠেছে। এই গতিবিজ্ঞান বা ডাইনামিক্স বেশ কাজের। এই বিজ্ঞান আছে নিউটনকে আশ্রয় করে, তার আওতায়। সনাতন বিজ্ঞান এককথায় নিউটনীয় বিজ্ঞান। এই

বিজ্ঞানের ভিত্তিতে আছে নিউটনের জানানো পরম আর স্বাধীন, চরম ও সার্বভৌম দেশ আর কাল—স্পেস ও টাইম। এই ভিত্তিতে সনাতন বিজ্ঞান তিনটি প্রত্যয় নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যারা জানায়, এই জগতে সব পরিবর্তন ঘটে 'নিরবচ্ছিন্ন ধারায়' ; এখানে থাকে 'নির্দেশনার' ইঙ্গিত ; আর সব কাজের একটি কারণ থাকে ঘটনার বিশ্লেষণ গড়ে ওঠে 'কার্যকারণতত্ত্ব'কে আশ্রয় করে। এই সনাতন জগতে যে কোনো বস্তুর স্টেট বা অবস্থাকে স্পেসের তিন মাত্রায় আর ভেলসিটির সাহায্যে জানানো যায়। এই ভেলসিটি আবার সময় নির্ভর ; গণিতের ভাষায় বলা যায় এটি সময়ের সঙ্গে ফাংশনে নামে। এ জগতে যে কোনো পরিবর্তনকে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম করা যায়, কারণ পরীক্ষাধীন সময়কেও ছোট থেকে আরো ছোট কর' যায়। ট্রাজেকটারির গতিপথে সেই নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনের ধারা দেখা যায়, বস্তু কোন অবস্থা থেকে কোন অবস্থাতে যে যাবে, তা শুধু দেখার সময় ধরেই বলা সম্ভব ; বলা যায় শুধু ঠিক সেই অবস্থায় কোন ফোর্স সেই সময়ে কাজ করছে সেটিকে মেনে নিয়ে। সময় আর স্পেসকে ছোট করার রীতি সনাতন বিজ্ঞানের বন্দীশে আছে। আছে ডিফারেনশিয়াল কেলকুলাসের ধারণায়। এখানে বস্তুকেও ভাঙা যায়। যে কোনো অবজেক্ট ও ফেনোমেনা নানা উপাদান উপকরণে তৈরি হতে পারে। এদের প্রত্যেকটিকে আলাদা ভাবে পরীক্ষা করা যায়। এক কথায় যে কোনো বস্তু বা ব্যাপারকে তার পরিবেশ থেকে সরিয়ে এনে স্বাধীনসত্তা হিসেবে পরীক্ষা করা যাবে। অন্যদিকে দরকার হলে এটির নিজস্ব উপকরণে 'ভেঙে' ফেলে প্রতিটি উপরণকে আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা করে, মূল বস্তু বা ব্যাপারের স্বভাব চরিত্র বোঝা সম্ভব। এইজন্য, সনাতন বিজ্ঞানের প্রশ্ন ধারায় থাকে—'বস্তুটি কি' অথবা 'কী তার উপকরণ'। আর এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে পরীক্ষা করা হয়, সেখানে দর্শক আর তার দৃশ্যজগৎ, পরীক্ষক আর পরীক্ষার বিষয়—দুটিই স্বাধীন, দুটিই প্রধান। নিরবচ্ছিন্নতা, নির্দেশনা আর কার্যকারণত্ব বোধ এবং স্বাধীন ও পরম দেশ ও কালকে মেনে নিয়ে দর্শক নিরপেক্ষ এই জগতের গড়ে ওঠা !

চারপাশের জড়জগৎকে মেনে নিয়ে সনাতন বিজ্ঞান গড়ে ওঠে। এখানে যা কিছু ঘটে তা সাধারণ বুদ্ধি বা কমনসেন্সে গ্রহণীয়। বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি গ্রহণ হয় সেটি বিষয়টিকে জানাতে বেশ খাটে। প্রতিটি কার্যের পেছনের কারণটিকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় ; এই বিজ্ঞান নির্ভুল আর যথাযথ। এটি Exact Science ; পূর্বাপর ধারণার নির্দেশনা থাকে এই জগতে। ··নিউটনীয় বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা করে লাপ্লাস সহজেই তাঁর 1820 সালে প্রকাশিত Theorie analytique des

Probalites গ্রন্থে বললেন, 'একটি কালের মুহূর্তে জাগতিক মহাজাগতিক সব বস্তুর অবস্থানটি যদি জানা যায়, আর যদি জানা যায় ঠিক সেই মুহূর্তে যত ফোর্স কাজ করছে তাদের হদ্দ হদিশ, তবে সেই বৌধিক প্রজ্ঞায় জগতের বিশাল থেকে ক্ষুদ্রতর এটমের গতিবিধি একটি মাত্র ফর্মুলায় ধরা পড়বে। সব ডেটা বিশ্লেষণ করার মত অসাধারণ ক্ষমতা যদি সেই প্রজ্ঞার থাকে, তবে এই জগতের কোনো কিছু অনিশ্চয় (uncertain) থাকে না। অতীত-ভবিষ্যৎ চোখের সামনে ভেসে উঠবে।'… লাপ্লাস একটি পরম প্রজ্ঞার কথা ভাবলেন—যার কাছে কোনো কিছু অজ্ঞেয় নয়। বাকি সকলের এই বোধে এই প্রজ্ঞা নেই বলে ভূত-ভবিষ্যৎ জানতে পারে না; তারা নিয়তির হাতে পুতুলের মত সেজে দাঁড়ায়। হায়, কমনসেন্সে সব ধরা পড়ে না। আর এই গ্রন্থ প্রকাশের একশ বছর পর আইনস্টাইন বললেন, ষোল বছর আগে যে সংস্কারের স্তর আমরা জুটিয়ে নিই, তাই কমনসেন্স। এই স্তর না তত গভীর, না তত কঠিন!

সনাতন বিজ্ঞান যতই সবজান্তার ভাব করুক, উনিশ শতকেই বোঝা যায় কোথাও গোলমাল বুঝি আছে। কিছুটা সংশয়ের দৃষ্টি নিয়ে যাচাইয়ের চেষ্টা চলে। সব বস্তু—বৃহৎ বা ক্ষুদ্র হোক—তাদের স্ট্রাকচার এক, এই মতবাদ পাসকেলের। আর আইনস্টাইনের বন্ধু-লাঁজেভাঁ (Langevin) স্রেফ সুষমা খুঁজতে গিয়ে এ তত্ত্ব মানতে পারেন না। এটি মানা মানে Reality বা বাস্তব যে সর্বত্র সব অবস্থায় একই ভাবে প্রকাশিত হবে—এই ধারণায় বিশ্বাস করা। বাস্তব কিন্তু অনেক জটিল, অনেক ইন্টারেস্টিং। অথচ কার্যকারণের বিশ্লেষণের পথে পাসকেল তাঁর তত্ত্ব পান। এই বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনেক অংশে সফল হলেও সমগ্র বাস্তবের ধারণা করতে কি পারে? অন্যদিকে বর্ণালি রেখা, বিকিরণের ধারা অথবা আলোর গতিবেগ যে সব সমস্যার সূচনা করে, সনাতন বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে তাদের সমাধান মেলে না। দর্শক আর দৃশ্যজগৎ যে আলাদা—তা ভাবা যায় না। যে ইলেকট্রন উনিশ শতকে পাওয়া যায় সে যে কি, কী তার উপকরণ—এই প্রশ্নও খাপছাড়া ঠেকে।

ঠিক এই সময়ে ঝড় ওঠে। আইনস্টাইন সনাতন বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি টলিয়ে দেন; স্পেস আর টাইম তাদের স্বাধীন সার্বভৌম পরম রূপ হারিয়ে আপেক্ষিকতার জগতে চারমাত্রার স্পেসটাইম রূপ পায়। সিদ্ধান্ত বা axiom এর পরিবর্তন হয়। আর দর্শক ও দৃশ্য জগতের সম্বন্ধের সূত্র হাজির হয়। অন্যদিকে প্লাঙ্ক-আইনস্টাইন বোরের হাতে নির্দেশনার জগৎটি ভাঙে, পূর্বাপর বিধানের ধ্বংসস্তূপ দেখা দেয়।

জানা যায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অথবা মাইক্রোজগতে কোনো গতি নিরবচ্ছিন্ন নয়। এখানে কোয়াণ্টার ধারা কাজ করে। এ জগতের পথ ধারাবাহিকতাহীন! আরো বিশ বছর পর একদল প্রবীণ আর নবীন বিজ্ঞানীর হাতে তেপায়া সনাতন বিজ্ঞানের তিনটি প্রত্যঙ্গেরই ভগ্নদশা ঘটে। এখানে বস্তু দ্বৈত রূপে হাজির হয়—সে মেটার অথবা তরঙ্গ—অথবা কণাতরঙ্গ। সনাতন বিজ্ঞানে Content এবং Form, আধেয় আর আধারের যে নিয়মশৃঙ্খলার রূপ ছিল, সেই রূপটি পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়; বিপ্রতীপ রূপ ধরা পড়ে! গতির জগতে উপস্থিত হয় অনিশ্চয়তা। সব কিছু প্রকাশিত হয় সম্ভাবনার শর্তে। সনাতন বিজ্ঞানের বস্তুর একক, স্বতন্ত্র বিশেষত্ব লোপ পায়—যার আবির্ভাবের কথা আছে লাপ্লাসের গ্রন্থে। নির্দেশনার রীতিতে একটি নিঃসঙ্গ কণার আচার-ব্যবহারে চান্স শব্দটি থাকে না। সনাতন বিজ্ঞানে নিয়ম মেনে চলার পথে প্রয়োজন (Necessity) থাকে। এখানে ক্ষণে ক্ষণে হাঁক ওঠে, চলো নিয়ম পথে। এ পথে চলাটাই জরুরি!—এই কারণে সনাতন বিজ্ঞানের মেকানিক্স হলো ডাইনামিক্স বা গতিবিজ্ঞান নির্ভর;—এখানে স্ট্যাটিস্‌টিক্স এর স্থান নেই। চান্স এবং স্ট্যাটিস্‌টিক্স একমাত্র বস্তুসমাহারের আচার ব্যবহার বোঝাতে সনাতন বিজ্ঞানে দেখা দেয়। অথচ নতুন বিজ্ঞান ধারায়, কোয়াণ্টাম মেকানিক্সে অন্য ব্যাপার। এখানে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার জগতে, মাইক্রোওয়াল্ডে আচার ব্যবহার বোঝাতে যেমন হাজির হয় 'প্রয়োজন', তেমনি আসে 'চান্স'! এই জগতে একটি নিঃসঙ্গ, স্বাধীন, স্বতন্ত্র কণার কথা ভাবা যায় না। একটি উত্তেজিত এটম তার গ্রাউণ্ড স্টেটে আপনা থেকে, বাইরের বিনা প্ররোচনায়, হাজির হবে;—এখানে এটমের ইলেকট্রনের এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে লাফানো ঝাঁপানো। শুধু বলা যায় না কোন ইলেকট্রনটি কাজে নামবে! বলা যায় না একটি উত্তেজিত নির্দিষ্ট এটম কখন গ্রাউণ্ড স্টেটে ফিরে আসবে। তেমনি বলা যায় না একটি নির্দিষ্ট নিউট্রন আপনা থেকে কখন ক্ষয়ের পথে যাবে। এই জগতে চান্স কাজ করে; যে চান্স নিতে পারে সেই ইলেকট্রন, নিউট্রন অথবা এটম কাজে নামে।—কেন এই চান্সের উৎপাত?

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে একটি কণা তার পরিবেশের সঙ্গে অন্তক্রিয়ায় নামে। একটি নিঃসঙ্গ কণা—নিঃসঙ্গ নয়। তার উপর আশে পাশের প্রভাব এসে পড়ে। এই প্রভাবটি যেমন তেমন, এলোমেলো, রেণ্ডম। হয়তো তা সামান্য, নগণ্য। তবু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতে এই নগণ্য প্রভাবটিকে তুচ্ছ করা যায় না। এই প্রভাবের এলোমেলো ভেসে আসার জন্য স্থির নির্দিষ্ট করে কখন কি ঘটে বলা যায় না।

কণার ব্যবহারে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। অনিশ্চয়তার বেড়াজালে পড়ে কণা চান্সকে টেনে নেয়।… এই জগতে পরম বলে কিছু নেই! এমন কি পরম শূন্যও নেই। শূন্যতা অথবা ভেকুয়াম সম্পূর্ণ শূন্য নয়। এটিও একটি পরিবেশ—যা এখানে থাকা কণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। এখানে হয়তো Real বা বাস্তব কণা নেই; তবু এখানে আছে ভারচুয়েল (Virtule) কণা। যেমন কবি গালিব বলেন, 'মানুষ নির্জনে থাকলেও সে একা নয়। সে থাকে তার চিন্তা ভাবনাকে সঙ্গী করে'—কণার জগতে সেই এক ধারা। প্রভাব মুক্তহীন স্বাধীন কণা নেই। সনাতন বিজ্ঞানের একক, স্বতন্ত্র বিশেষত্ব লোপ পায়; ব্যষ্টির জায়গায় হাজির হয় গোষ্ঠী; আর তাদের আচার-ব্যবহার বোঝাতে স্ট্যাটিস্‌টিকেল নিয়ম খাটে। এখানে দেখা দেয় চান্স আর প্রয়োজন। এখানে থাকে অনির্দেশনার ইঙ্গিত আর বস্তুর দ্বৈত রূপ—সে কণা বা তরঙ্গ, সে মেটার বা এনার্জি; তার বিপরীত বস্তু থাকতে পারে। অনির্দেশনা আর দ্বৈত রূপ—প্রথমটি সনাতন বিজ্ঞান অনুযায়ী অবোধ্য, দ্বিতীয়টি তত সুবোধ্য নয়।

সনাতন বিজ্ঞানের মেকানিক্স যদিও ডাইনামিক্স আশ্রয়ী—কোয়ান্টাম মেকানিক্স স্বাভাবিক ভাবে স্ট্যাটিস্‌টিক্স আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তবুও এখানে প্রভেদ আছে। কার্যকারণতত্ত্বে সম্ভাবনার (Probability) ধারণা আছে। চান্স আর আনসার্টেনেটি অথবা আকস্মিকতা আর অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বে সম্ভাবনার সূত্র কাজ করে। তবু এই সম্ভাবনার বোধ সনাতন বিজ্ঞানের মোতাবেক নয়। প্রকৃতির মধ্যে যে সম্ভাবনার শর্ত কাজ করে সনাতন বিজ্ঞানের স্ট্যাটিসটিকেল থিয়োরী দিয়ে তার বিচার সম্ভব নয়। এখানে কাজে নামে সম্ভাবনার তরঙ্গের এম্‌প্লিটিউডটুকু; তার চূড়া নিয়ে কারবার! নানা সম্বন্ধের ধারণার তরঙ্গ রূপের যোগফলে এই জগতে দেখা দেয় ইন্টারফারেন্স বা ব্যতিচার। সেও সনাতন বিজ্ঞানের রূপ নিয়ে সেজে আসে না। মাইক্রোজগতে কণার দুটি দলে সংখ্যায়নিক রীতি কাজ করে—এই কণারা কেউ বোসন, কেউ ফের্মিয়ন দলে; প্রতিস্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ফের্মিয়ন কণা থাকে বলে এবং সম্মিলিত তরঙ্গের যোগের ক্রিয়ার শুধু এম্‌প্লিটিউড কাজে নামে বলে যে কিম্ভূত তরঙ্গাভাস ধরা পড়ে তা সনাতন বিজ্ঞানের কালে ধরা পড়েনি। অন্যদিকে ফোটনকণা বোসন;—একটি স্টেটে বহু কণা থাকে বলে সম্মিলিত তরঙ্গের রূপে সনাতন বিজ্ঞানের সাবেকি উচ্চাবচ তরঙ্গ পাওয়া যায়। এই তরঙ্গের ব্যতিচার সহজেই সনাতন বিজ্ঞানের কালে ধরা পড়ে। দুটি বিজ্ঞানের ধারায় সম্পর্কটি চেনা যায়। সনাতনী পূর্ববিধান নির্দেশনা, নিরবচ্ছিন্নতা এই বিজ্ঞানের আসন্ন রূপে পাওয়া যায়।

পরিবেশকে টেনে এনে এই মাইক্রোজগৎ গড়ে ওঠে। কাজেই এখানে সমাতন বিজ্ঞানের সংজ্ঞা অনুযায়ী বস্তু বা ব্যাপারের অনুপুঙ্খ ধারণা স্পষ্ট নয়। মেটার ও এনার্জি এখানে একটি অন্যটির রূপান্তরিত অবস্থা। আবার পরিবেশ অনুযায়ী, মেটার হয় কণা, নয় তরঙ্গ। এখানে আছে সৃষ্টি ও লয়ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এ জগতে নানা সম্বন্ধ সম্পর্কের ধারা মিলিত হয়ে এক অনবদ্য সাগরের সৃষ্টি করে—যেখানে সাগরের জলকণার মত কেউই স্বতন্ত্র নয়, বিশেষ নয়, বিশিষ্টও নয়!···এই জগতের বর্ণনায় বোম (Bohm) বললেন, 'এই জগৎকে তার নির্দিষ্ট উপকরণে বিশ্লেষণ করা যে সম্ভব—এই সনাতনী মতবাদ পালটানো দরকার। এর বদলে এই জগৎ যে মূলত এক আর অভিন্ন এই ধারণাও টানতে বলি না। সনাতন বিজ্ঞানের সীমাতেই শুধু স্বাধীন স্বতন্ত্র উপকরণের নিঃশর্ত বর্ণনা সম্ভব। যেখানে কোয়ান্টার আবির্ভাব, সেখানেই দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অংশের মৌলিক পরিবর্তন। কারণ সব অংশের অন্তরে অন্তরে রয়েছে সম্বন্ধ-সংযোগ। চোখে যে ছবি ফুটে ওঠে তা সতত সঞ্চারমান, নমনীয় আর পরিবর্তনশীল।'

সনাতন বিজ্ঞানের ধারণায় মডেল ছিল। কমনসেন্সের সাহায্যে সেই মডেলটির বর্ণনা করা যেত। কোয়ান্টাম মেকানিক্সেও মডেল আছে যাকে বলা হয় Tentative image অথবা পরীক্ষামূলক চিত্রকল্প। এই ইমেজ—সেটিও গড়ে ওঠে অনেক ইমেজের পরিপ্রেক্ষিত ধারণায়। ইমেজ বহু; তাদের ব্যাখ্যা, শাব্দিক অর্থে না দিয়ে, পরীক্ষার ভিত্তিতে দেওয়া হয়। বহুত্বকে, বহু সম্পর্কের ধারাকে সহজেই গণিতের ছকে সাজানো যায়। এই ছক—এও যেন এক মডেল। এই রূপাকৃতি, পরীক্ষা মূলক ইমেজ আর গাণিতিক ছক দুটিকেই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে এক দৃষ্টিতে দেখা হয়। তবু মডেল যেখানে মূর্ত, গণিত সেখানে বিমূর্ত। লজিকের ধারায় গড়ে ওঠা গণিত এই জগতে ন্যায়ত সিদ্ধ। সনাতন বিজ্ঞানের মডেল যেমন তত্ত্ব গড়তে সাহায্য করে, তেমনি নতুন জগতের নিয়মের ব্যাখ্যায়, আবিষ্কারে, প্রকাশনে, এমন কি কী পাওয়া যেতে পারে তার ভবিষ্যদ্বক্তিতে গণিতকে বাদ দিয়ে চলা যায় না। সম্বন্ধ সম্পর্কের ধারা আর গাণিতিক বিমূর্ততা—দুটিই এই জগতের প্রকাশভঙ্গী।

আবার একটি পরিবেশে একটি বস্তুকে পরীক্ষা করলে যে ফল পাওয়া যায়, পরিবেশের পরিবর্তনে একই বস্তুর পরীক্ষায় ভিন্ন ফল পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরীক্ষায় একই বস্তুর কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফল পাওয়া যে যায়—তারা নানা দিক থেকে বস্তুটির বিচার জানায়। এই সব বিচারকে জুটিয়ে মুটিয়ে

বস্তুটিকে বোঝা যায়। তবু অনিশ্চয়তার সম্পর্কে, দ্বৈত উপস্থিতিতে যে সব দৃশ্য দেখা যায়, তাদের একটি মাত্র ছবিতে বা গ্রাফে আঁকা যায় না। কারণ নানা দেখায় যেমন সম্পূরকত্ব বোধ জাগে, তেমনি জাগে পরিপূরকত্বের ধারণা। একটি ছবিতে সব ঘটনা লেখা যায় না, কারণ ঘটনায় ঘটনায় থাকে বৈপরীত্য, থাকে বিরোধ। এই বিপরীত আর বিরোধকে মেনে নিয়ে ঘটনার দল যে সাজে সেজে দাঁড়ায় তার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা পুরনো ধ্যান ধারণার ভিত্তিতে দেওয়া যায় না। বস্তুটি সেখানে অস্পষ্ট-আবিল হয়ে দাঁড়ায়। বরং বলা যায়, এ যেন গতিমান ছবির ধারা—সব মিলিয়ে যা প্রকাশ করে গতির জগৎকে। এখানে একটি ছবি অন্য ছবির পরিপুরক। সব ফলাফল মেনে নিয়ে যে ছবির ধারা গড়ে ওঠে সেখানে থাকে পরিপূরকত্ব বোধ। নীয়েলবোর জানালেন, ঘটনা বা ডেটা— যা বিভিন্ন পরিবেশের পরীক্ষায় পাওয়া যায়, তারা জটিল, বিরোধে ভরা। তবু সব ঘটনা বা ডেটা ঐ বস্তুকে বা বিষয়কে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। এই জটিল বিরোধাভাস—এগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। ফর্ম আর কন্‌টেন্ট, আধার ও আধেয়'র যে দ্বৈত ধারা সনাতন বিজ্ঞানে এসেছিল কোয়ান্টা জগতের রূপ সাযুজ্যের হার্মনির খোঁজে তারা দিশেহারা হয়ে দাঁড়ায়। একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমের সাপেক্ষে একটি ফর্মের গঠন আকৃতি নির্দিষ্ট হয়। এখানে সেই ফ্রেমের নিদর্শন কোথায়? অন্যদিকে একটি মাত্র আধেয় এই নতুন অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে পারে না। বস্তুটির নিজস্ব নির্দেশনা কোথায়?—সে কণা না তরঙ্গ, মেটার না এনার্জি? এখানে যে সৃষ্টি লয় চির প্রবহমান। ক্ষণে বস্তুর পরিবর্তন হয় অন্য বস্তুতে। নির্দিষ্ট আধেয় রূপ কোনটি?—এর উত্তর—সব কটি। অনির্দেশ-অনিশ্চয়তার পথে সব রূপ সব ফ্রেম পরিপূরকত্বের আঙিনায় কোয়ান্টার সংসার সাজিয়ে রাখে। পরিপূরকত্বের পথেই হার্মনির ইশারা জাগে; বস্তুটিকে চেনা যায়।

নির্দেশ নিরবচ্ছিন্নতার পথ এড়িয়ে অভিজ্ঞতার যে নতুন পথ গড়ে ওঠে সেখানে থাকে চান্স, থাকে প্রয়োজন, থাকে সম্ভাবনা। এই পথে প্রকৃতির নিয়মগুলি জানা যায়। দর্শক-দৃশ্যজগৎ একাকার হয়ে যায়। প্রকৃতির খেলায় সকলে মেতে ওঠে; সম্পর্কের খোঁজ পায়; নিয়মের ইশারা জাগে। পথের প্রসার আর বিস্তৃতির নিয়ম—সম্পর্কের আইডিয়ার ছোঁওয়া নিয়ে গড়ে ওঠে।

অনিশ্চয়তা ভরা এই জগতে পূর্বাপর বিধান নেই। নেই নির্দেশনা—আছে আকস্মিকতার অট্টহাসি। নেই নিরবচ্ছিন্ন গতিপথ। থাকে বৃষ্টির ধারার মত কোয়ান্টার ধারা। আর থাকে সম্ভাবনার সূত্র এবং পরিপূরকতা।

.. সত্যি, সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

অশেষ দেখা

শেষ অনুসন্ধান

সৃষ্টির অপার রহস্য বিজ্ঞান নিরন্তর খুঁজে চলে। খোঁজার পথের হাতিয়ার হলো প্রশ্ন তোলা। যা দেখা যায়, যা ইন্দ্রিয়ের অনুভূতিতে ধরা পড়ে সেই কার্যগুলি "কি"—তা' হয়তো জানা যায় না ; যা জানার চেষ্টা হয় সেটি ঐ কার্যটি "কেন" ঘটছে অথবা কি তার "কারণ"। এই কার্যকারণ খোঁজার ধারায় বিজ্ঞানী একটি মনোমত মডেল বা প্রতীক গড়ে তোলার চেষ্টা কারণ, আর সেই পথেই জানতে চেষ্টা করেন—কার্যটি "কি"? "কেন" এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় আর সেই উত্তরের সাপেক্ষে গড়া মডেলের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চের জগতে রহস্যের ব্যাখ্যাটি দিতে চেষ্টা করেন বিজ্ঞানী। সনাতন বিজ্ঞান বা Classical science-এ এই রীতি মেনে চলা হলো। এখানে লজিকের ইনডাকটিভ অথবা আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ হলো। সনাতন বিজ্ঞানের মূলে আছেন স্যার ফ্রানসিস বেকন এবং তাঁর Novam Organum বইটি! যুক্তি দিয়ে গড়া পদ্ধতির সাহায্যে একটা মডেল বিজ্ঞানীরা দিতে পারলেন ; পারলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অন্বেষণ-অভিজ্ঞতা থেকে জোগাড় করা নানা কার্য বা তথ্যের সাহায্যে। এই মডেলের সৃষ্টি আর তারই সাপেক্ষে ব্যাখ্যা—দুটিই বুদ্ধিগ্রাহ্য, যুক্তিসহ ; এখানে চেতনার কোনো ঠাঁই নেই। সনাতন বিজ্ঞানের এটি একটি খুঁত। এখানে মনন ও বোধির সম্পর্ক সহযোগিতার বন্ধন খুব একটা স্পষ্ট হয় ; সুসমঞ্জস তো নয়ই।

তবু কার্যকারণত্ব বোধ বহির্জগতের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছে। আপেল কেন পড়ে—জানতে গিয়ে কারণ হিসেবে পাওয়া যায় মহাকর্ষতত্ত্ব। আকর্ষণ-বিকর্ষণ কেন ঘটে তার উত্তরে খুঁজে পাওয়া যায় বিপরীত ধর্মের বস্তু (object)-দের—এই ধর্ম হয়তো বৈদ্যুতিক, হয়তো বা চুম্বকীয়। সৌরলোকেও একই রীতি খাটানো হলো। এখানে একটি ইন্দ্রিয় সম্পর্কহীন মডেলের কল্পনা করা হলো—যেখানে সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ইত্যাদি অন্যান্য গ্রহেরা ঘুরপাক খায়। দিনরাত্রি অথবা ঋতু পরিবর্তনের কারণ এই মডেল থেকে জানা যায়। সাধারণ অর্থে বস্তুর গুণধর্ম ইত্যাদি ব্যাখ্যার জন্য কার্যকারণ শৃঙ্খলাটিকে সম্পর্ক-সহযোগিতার মডেলে না বুঝিয়ে তাত্ত্বিক মডেলের চিত্ররূপে বোঝানো হতো। এই রীতির রেশ এখনো বজায়

আছে। এই মডেলের জগৎ সরল ; হয় তো তা নির্ভুল এবং স্পষ্ট। বিজ্ঞানীরা এটি মেনে নিয়েছিলেন ; কারণ চেতনার বাইরের জগতের উপলব্ধি বা রহস্যকে তত্ত্বের আঙিনায় ভাষার সাহায্যে ঠিকমত প্রকাশ করা যায় না ; ভাষার সীমাবদ্ধতা যুক্তি পরম্পরার বিশ্লেষণ রীতিটিকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাতে পারে না। যুক্তির ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি বোঝানোর জন্য আরেকটি ভাষার প্রয়োজন হয়—সেটি গণিত। যেটি একটি সর্বজনীন, অর্থবহ, নিরপেক্ষ, যুক্তিগ্রাহ্য উদাসীন ভাষা।

বিজ্ঞানে লজিকের প্রয়োগ যেমন সার্থকভাবে করলেন নিউটন, তেমনি কার্যকারণ সূত্রের জালে ধরা নানাতত্ত্বের গঠনে তিনি গণিতের প্রয়োগ করলেন। গণিতের ব্যাখ্যায় তিনি "কারণ" পেলেন এবং পেলেন "কেন"। এই যে গাণিতিক সমাধান সেটিকে তিনি ভাষায় অনুবাদ করলেন। দেখা যায় এই অনুবাদ করা সম্ভব। সনাতন বিজ্ঞানে নিউটনের প্রতিষ্ঠিত ধারায় উপস্থিতিটি বজায় রাখে কার্যকারণ বাদ আর বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব। এই অস্তিত্ব, যা তার গুণধর্ম নিয়েই প্রকাশিত, সেটি গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। এখানে চেতনার (Consciousness) ভূমিকা একটি নগণ্য পার্শ্বচরিত্রের। বোধি ও মননের সম্পর্কবোধটির কোনো সুডোল রূপময়তা নেই।

যেটুকু সম্পর্ক সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামোয় ধরা পড়ে, সেখানে যেন কারণটিকে স্পষ্ট করে জানানো যায় না। যেমন ধরা যাক 'ক' এর কারণ 'খ' একথাটি বললে ক আর খ-এর সম্পর্কের আংশিক ধারণা শুধু জাগে। সম্পর্কের পুরো ধারণাতে ক-এর কারণ খ এবং খ এর কারণ ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিনা বলা হলো না। তেমনি জানানো হয় না ক-খ-এর কার্যকারণ সম্পর্কে তৃতীয় আরেকটি এজেন্ট 'গ'-এর হাজিরা আছে কিনা—যার সাপেক্ষে ক ও খ-এর সম্পর্কবোধটি পরিস্ফুট হতে পারে। নিউটন ও সনাতন বিজ্ঞানের গণিতের ছকের প্রকাশভঙ্গীতে এখানে কিছু অস্পষ্টতাবোধ থাকে। এই অস্পষ্টতার ধারণার বিলোপ ঘটে যদি পরমত্বের ধারণাকে টেনে নেয়া যায়। কার্যের কারণ-শৃঙ্খলা খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় সময়ের কুহেলি ঘেরা রাজত্বে আর এগুনো যায় না। একটি প্রাথমিক মৌলিক কারণ থাকে। সব কিছুর 'হয়ে ওঠার' জগতে একটি কারণ। একটি পরমবোধ—যার রেশ ধরে একদল বিজ্ঞানী বলতে পারেন সব কাজের প্রথমতম কারণটিই ঈশ্বর ; যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মূলস্রষ্টা ঈশ্বর। 'কারণ' ছাড়াও ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য প্রকাশভঙ্গী ছিল। সনাতন বিজ্ঞানে সম্পর্ক সম্বন্ধের আকর্ষণের প্রবাহটি সরল ছিল। পরম অথবা চরমের সাপেক্ষে গণিতের সমাধানের ব্যাখ্যা বা Explanation দেয়া

সম্ভব ছিল। সব কিছুর ব্যাখ্যা তার বাইরের পরিসীমা ধরে দেওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় কোনো ক্রিয়ার ব্যাখ্যা তার বাইরের প্রতিক্রিয়া ধরেই বলা যাবে। কোনো কিছু তার অস্তিত্বকে নিজের থেকে প্রমাণ করতে পারে না। অতএব এই প্রাকৃতিক বিশ্বের ব্যাখ্যা এই বিশ্বের বাইরে আছে—সেই পরম ব্যাখ্যা হলো ঈশ্বর।

সনাতন বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বর্ণনায় এজন্য ভাষার কারুকৃতির ছোঁওয়া জাগে। বলা হলো, 'দিনের পর রাত আসে'; এখানে দিনের কারণ রাত নয় এবং রাত্রির ব্যাখ্যায় আসে না দিন। তৃতীয় কোনো এজেন্টকে এখানে টেনে নিয়ে আসা হলো না। কার্যকারণত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো সৌরলোকের বিমূর্ত, উপলব্ধি সঞ্জাত, গণিতে পাওয়া, ভাষায় তৈরি মডেলের সাহায্যে—যেখানে ঐ মডেলটি যান্ত্রিক হলেও যেন পরম। বিজ্ঞানের চিন্তার সীমাবদ্ধতাটুকু সেকালীন দর্শনের জগতেও দেখা দেয়। কার্য বা তথ্য, গণিতে গড়া তত্ত্ব এবং ভাষার প্রতীকে গড়া মডেল—এই তিনটি ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমটিকে দর্শনতত্ত্ব সব সময়ে যে সুস্পষ্ট ভাবে জানাতে পেরেছে, এই ঘোষণায় সন্দেহ থেকে যায়।

ব্যবহারিক জীবনে গণিতের ধারায় গড়ে তোলা গতিবিদ্যার প্রতিকী রূপকে উদাহরণ হিসেবে আনা যায়। ঢিলে জানালার কাচ ভাঙে। এখানে কার্যকারণ সম্পর্ক একমুখী। কাচ যে ভেঙে যাবার জন্য সেধে নিজে থেকে ঢিলকে ডেকে আনে তা' কবিতার ভাষায় বলা হলেও এখানে তা বলা হচ্ছে না। সহজ চিন্তা হলো কাচভাঙার জন্য ঢিলের ছুটে চলা—এই হলো ক্রিয়ার দিক নির্দেশনা। ঢিলের গতিপথ তার শক্তির পরিমাপ ইত্যাদি বিজ্ঞান করতে পারে; তবু যে ঢিলটি ছোঁড়া হলো, তা কেন ছোঁড়া হলো, কি তার কারণ—বিজ্ঞান তা স্পষ্ট করে জানাতে পারছে না। যা বলা যায়, তাহলো নানা কারণের নানা বিকল্পগুলি থেকে এই সুবিধাজনক হেতুটিকে বেছে নেওয়া—যেটি ফলাফলটির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পারবে এবং যাকে প্রমাণ করা যাবে।

অভিজ্ঞতার নিরিখে পাওয়া তথ্যগুলির বিচার করার জন্য সম্বন্ধ সম্পর্ক খোঁজার রীতেতে বিজ্ঞান কতগুলো সিদ্ধান্তের ধারণা আনলো; এদের প্রয়োগে কার্যকারণের ব্যাখ্যা দেয়া হলো। এই সিদ্ধান্তের কয়েকটা হলো প্রকাশিত তথ্যের ব্যাখ্যার জন্য মেনে নেয়া, ধরে নেয়া। যেমন নিউটনের গতি বিজ্ঞানের পরমতত্ত্ব; আর কয়েকটা হলো তথ্যের পথে পাওয়া ধ্রুব নির্দেশনা বা ধ্রুবক—যেমন নিউটনের দেয়া মহাকর্ষ ধ্রুবক—যাকে আইনস্টাইন বলেছেন 'God given'—ঈশ্বরদত্ত! সনাতন বিজ্ঞানে ধারণা ছিল, অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত অথবা অন্যভাবে বলা 'প্রত্যয়'-গুলি যেন

ন্যায় সূত্রে গাঁথা,—মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এই প্রত্যয়ের নিত্যযোগ। ঢিলে কাচ ভাঙে; যে ঢিল ছুঁড়েছে, সে যে শক্তিতে ঢিল ছোঁড়ে তারই সাপেক্ষে ঢিলের ছুটে চলা। অচেতন জড় জগতের বর্ণনায় বুদ্ধিগ্রাহ্য সিদ্ধান্তটি খাটে। তবু অনেক জায়গায় দেখা যায় থিয়োরীর পরিবর্তনে দিক নির্দেশনায় চিহ্নও পাল্টাতে পারে; অথচ এখানে তথ্যের ফলাফলের কোনো পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে।...কাচ ভাঙার জন্য যে ঢিল ছোঁড়ে—সে কেন ছোঁড়ে? ছোঁড়ার কারণ যে কি—ঢিল যে ছোঁড়ে তার কাছে সেই কারণটি কি স্পষ্ট? ভঙ্গুর কাচ তার লালিত্য নিয়ে ঢিল ছোঁড়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারে, অথবা ঢিলে কাচ ভাঙে কিনা এটা পরীক্ষা করে দেখাও যেন অনুপ্রেরণা জোগায়। এই দুটি কারণের দিক নির্দেশনা কিন্তু এক নয়, যদিও ঢিলের গতিপথ দুটি আলোচনাতে এক, ফলাফলও এক—কাচ ভাঙা! জড় জগতের সঙ্গে মানুষের চেতনা মেশাতে গেলে কার্যকারণ তত্ত্ববোধে কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। কারণ মানুষের নিজের চিন্তাতে বৈপরীত্য থাকে। এখানে প্রশ্ন জাগে, কোনো কাজের কারণ কি একটিমাত্র শক্তি, একটি মাত্র ঘটনা অথবা অন্যকিছু হতে পারে? চেতনা কি মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে তোলে—যার ফলে দেখার জগতের রূপ পালটায় এবং কারণটিও পালটাতে পারে? চেতনার প্রয়োজন কি?

সনাতন বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসু (Searcher) ও অন্বিষ্টু (Seeker) মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। কঠিন যুক্তির পথে বহির্জগতের নিয়ম খোঁজা হলো। কেপলারের ধারণা ছিল বুদ্ধিমান এঞ্জেলরা গ্রহদের ঠেলে নিয়ে চলে। তারপর যেদিন তিনি টাইকোব্রাহের সংগৃহীত তথ্য থেকে খুঁজে পেলেন গ্রহদের পথ উপবৃত্তাকার—সেদিন তাঁর আর ঐ বুদ্ধিমান এঞ্জেলদের দরকার হলো না; পথদর্শী বুদ্ধিমান গাইডদের তিনি বিসর্জন দিতে পারলেন। তথ্য আর যুক্তিশৃঙ্খল হলো গাইড—আর যে তত্ত্ব পাওয়া গেল সেটি অবশ্যই বিচার-বুদ্ধি গ্রাহ্য। ডারউইনের প্রাকৃতিক বাছবিচারের তত্ত্বে জানা গেল প্রকৃতির হাতে গড়া নানা নকশা-ডিজাইনের স্থায়িত্বের সমস্যার বুদ্ধিগ্রাহ্য সমাধান। নিরপেক্ষ উদাসীন যুক্তির পথে তথ্যভিত্তিক যে আইডিয়াটি তিনি জানালেন, দেখা যায় সেখানে প্রকৃতির বাছবিচারের পদ্ধতি হলো রেণ্ডাম—এলোমেলো। এখানে কোনো চেতনা বা বুদ্ধির নির্দেশনার ছাপ আপাতত ধরা যায় না। যা থাকে সেটি পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিতার জগতটিতে টিঁকে থাকার জন্য কিছুটা শক্তি। কিছু বা এডজাস্টমেন্ট,—নিয়ন্ত্রণ-বিন্যাস। যুক্তিগ্রাহ্য ডারউইনের তত্ত্বে বিচার বুদ্ধি আছে—চেতনার ছোঁয়া নেই। তবু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে,—মস্তিষ্কের উন্নতি যদি প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাইয়ের

ক্রমবিকাশের ফলে ঘটে থাকে, তবে চেতনার ক্রমোন্নতিতে সেই একই প্রণালী (System) কি কাজ করবে? মানুষের চেতনায় বৈপরীত্য ধরা পড়ে, অনিশ্চয়তার ছোঁয়া জাগে। সেই এক বৈপরীত্য অনিশ্চয়তা কি জড়জগতে দেখা দেয়? তত্ত্ব-ফলাফল—যা খোঁজার বা জানার—সে নিশ্চয় দর্শক-নিরপেক্ষ। কারণ বিজ্ঞানের সত্য একটি পরিসীমায় একই সমাধান বা প্রত্যয় জাগিয়ে তোলে; এটি সর্বজনীন। তবু অনুসন্ধিৎসু-অন্বিষ্ট দর্শকের হাতে ঐ পরিসীমাটি কি নির্দেশিত হয় না? নিউটনের হাতে তৈরি বহির্জগতের নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে হেমিলটন প্রশ্ন তোলেন। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এটি শুধু দু'একজনের কণ্ঠে জেগে ওঠা অস্ফুট কলধ্বনী।

নিউটনের জগৎ যেন যান্ত্রিক। অসীম অনন্ত মহাবিশ্বে পরমস্পেস ও পরম টাইমের সাম্রাজ্যে তাৎক্ষণিক কার্যকারণের শৃঙ্খলে যে জগৎ পাওয়া যায় সে স্থির, পরিবর্তনহীন। সেদিনের মানুষের অভিজ্ঞতার পরিসীমাতে এই জগৎ নিবদ্ধ। এটি যেন আদি মানুষের পুরাণ কথার সৃষ্টিতত্ত্ব মেনে নিয়ে তৈরি হওয়া। বাইবেল ইত্যাদি পুরাণ প্রথমেই এই সৃষ্টিতত্ত্ব জানায়, যা ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে। হ্বিলহেলম্ লাইবনিৎস, সামুয়েল ক্লার্ক এবং অন্যান্য অষ্টাদশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা নিউটনের কার্যকারণবাদ এবং পরমতত্ত্ব দুটির সমন্বয়ে পরম কারণ হিসেবে পেলেন সেই ঈশ্বরকে—যিনি এই সৃষ্ট জগতের বাইরে আছেন। এই পরম কারণ ও পরম ব্যাখ্যার মূলে থাকে একটি সিদ্ধান্ত—সবকিছুর মূলে একটি কারণ আছে, ব্যাখ্যা আছে এবং এই কারণ ও ব্যাখ্যা হলো ঈশ্বর। তবু প্রশ্ন তোলা যায় কারণহীন ব্যাখ্যাহীন ঈশ্বরকে মেনে নিলে কারণহীন ব্যাখ্যাহীন বিশ্বজগৎ মানতে ক্ষতি কি? এখানেও কি বোঝার সুবিধার জন্য ঈশ্বরকে টেনে নেওয়া হলো না? এই টেনে আনা কারণটিকে বিজ্ঞানে কি প্রমাণিত করা যাবে? এজাতীয় প্রশ্ন জেগে ওঠে। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্টেটিস্টিক্সের ছকে সম্ভাবনার সূত্রে তাপগতি বিজ্ঞানের আবির্ভাব এবং ম্যাক্সওয়েলের ইথারতত্ত্ব!

ঊনিশ শতকের প্রথমেই কোনো কোনো বিজ্ঞানীর কাছে নিরপেক্ষ উদাসীন খোঁজার রীতিটি খানিকটা আলুনি বলে মনে হয়। রসায়নের পর্যায় সারণীতে, তাপগতি বিজ্ঞানে, যন্ত্রের মেকানিকসে নিয়ম আছে; কঠিন কঠোর সেই নিয়ম। তবু স্টেটিস্টিক্স পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে নিয়মের গঠনে কিছু সম্ভাবনা, কিছু অনিশ্চয়তা, কিছু বা ঝাড়াই-বাছাই থেকে যায়, থেকে যায় কিছু এলোমেলোমিকে মেনে নেয়া। প্রকৃতির নিজস্ব রীতি-নীতিটি কি সূক্ষ্ম নিয়মের রাজত্বে খাটে?

তাছাড়া নিস্পৃহতা উদাসীনতা—সে ঠিকই খোঁজার রীতি। তবু জগৎটাকে যেমন বোঝার দরকার, তেমনি রস উপভোগের প্রয়োজন; প্রয়োজন উপলব্ধির। সেখানে চেতনার প্রয়োজন, প্রয়োজন চেতনাশ্রয়ী একটি রসবেত্তার সম্ভাবনাময় আবির্ভাবের; তিনি কি ঈশ্বর?...কেভেণ্ডিসের সময় থেকে এই প্রশ্ন উঠতে থাকে। কেলভিন ক্লাউসিয়াসের স্টেটিসটিক্স্ গণিতের পথ ধরে ম্যাক্সওয়েলের জগতেও এই পরম সম্ভাবনাময়ের ধ্যানরূপ সংশয়-অনিশ্চয়তার ভঙ্গীতে আন্দোলিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর জড় বিজ্ঞানের প্রচণ্ডতম উল্লম্ফনের কালে জড়দর্শনে ঈশ্বর অপ্রয়োজনীয়। এই সময়ে তাপগতি বিজ্ঞানের এনট্রোপিতত্ত্ব ও ইথারতত্ত্ব দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণার বোধ নিয়ে বিজ্ঞানে হাজির হয়। এনট্রোপি সম্ভাবনার পথে গড়ে তোলা একটি সুবিধাভিত্তিক তথ্য—যার প্রমাণ বিজ্ঞানে পাওয়া যায়। এটি সম্ভাবনার পথে গড়ে ওঠা একটি নির্দিষ্ট আইডিয়া—যা বিশৃঙ্খলার জগৎকে মেনে নিয়ে গড়ে ওঠে। অন্যদিকে ম্যাক্সওয়েলের ইথার একটি পরম সম্ভাবনা—যা বিপরীত গুণধর্ম নিয়ে গড়ে ওঠে, যার মাধ্যমে বিশৃঙ্খলার পথে জেগে ওঠা বিদ্যুৎচুম্বক তরঙ্গ বয়ে যায়। ইথার স্বয়ং পরম হলেও গতিমান, নিউটনের স্পেসের চেয়েও যার বস্তুগুণ বেশি। এনট্রোপিতত্ত্ব ও ইথার মাধ্যমকে নিউটনের যান্ত্রিকতায় ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এবং দুটি তত্ত্বই কার্যের কারণ হিসেবে দেখা দিলেও সঠিক মডেলের প্রতীকে আঁকা যায় না। দুটিই গাণিতিক ছক—যার অনুবাদে, এই প্রথম, ভাষার সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। অথচ গণিতের সাহায্যে দুটিকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই তত্ত্ব দুটি বোঝার প্রচেষ্টায় যুক্তি ছাড়াও বিচার বুদ্ধি অথবা 'বোধি' এবং মডেল ছাড়াও উপলব্ধি অথবা 'মননের' প্রবেশের সূচনা দেখা দেয়। আর এই সময়ে স্বপ্ন-চৈতন্য ইত্যাদি নিয়ে ভাবনা জেগে ওঠে। স্টেটিসটিক্স্ পদ্ধতির প্রয়োগ শুধু যুক্তির নয়, বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োজন পরোক্ষে ধরা পড়েছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবে যে ধারণা জাগে তা হলো চেতনা অথবা চেতনা সম্পর্কিত কারণটিও কার্য বা ফল বুঝতে প্রয়োজনীয় হতে পারে। ইথারের অনুপ্রবেশ বিজ্ঞানীদের চেতনা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ জোগায়। কারণ এই ইথারের বাহ্যিক উপস্থিতি নেই—সে আছে গণিতের ভাষায়, উপলব্ধির সাম্রাজ্যে। এই যে ইথার—যা চেতনার জালে ধরা পড়া পাখি—তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য মডেলে কেন ধরা যাবে না? মনও কি ইন্দ্রিয়? ইথারের যে ভাষারহিত রূপ, তার অনুভূতি সকলের উপলব্ধিতে এক বিশেষত্বে যখন ধরা পড়ে, তখন একই ভাবে অন্যের চেতনার প্রমাণ কি পাওয়া যায়? সেখানে চেতনাসম্পর্কীয় প্রতীকের নির্দিষ্টতা কি থাকে? অন্যদিকে চেতনা যদি কার্যকারণত্ব

বোধে লক্ষ্যসূচক (Significant) না হয়, তবে অভিজ্ঞতার জ্ঞানের ভিত্তিভূমিতে একে দাঁড় করানো যায় না। চেতনাসঞ্জাত উপলব্ধি—যাকে সেকালীন রীতিতে ঠিক বিজ্ঞান বলা যায় না—সে আবার অন্যত্র পরস্পরের সঙ্গে ভাব বা মত বিনিময়ে নামছে; এও যেন এক প্রতীক; হয়তো বিমূর্ত; তবু তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে সে নিশ্চয় ন্যায়ানুগ, নির্ভুল ও যুক্তিগ্রাহ্য। ইথার ও এনট্রোপির সঙ্গে ছায়ার মত বিজ্ঞানে চেতনা অথবা উপলব্ধির আবির্ভাব ঘটে। তাকে নিয়ে গড়ে ওঠে দ্বিধা ও সংশয়। আর একটি প্রচলিত বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা—ঈশ্বর কি চৈতন্যময়?

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই মাক্স প্লাঙ্ক অবিচ্ছন্নতার বোধটি ভাঙলেন, তাঁর তত্ত্বটিকে প্রচলিত কার্যকারণের ছকে গড়ে তোলা হয়েছে বলা যায় না। বরং বলা যায়, ইন্দ্রিয়ের জগতে যাদের নিরবচ্ছিন্ন বলে মনে হয়, তারা বিচ্ছিন্ন ধারায় হাজির হয়। প্লাঙ্কের তথ্যভিত্তিক তত্ত্বটিতে আরো একটি ধ্রুবকের আবির্ভাব হয়, আর পাওয়া যায় সম্পর্কীয় সম্বন্ধের জগতে খোঁজার রীতিতে একটি নতুন আঙ্গিক। পরীক্ষায় পাওয়া সব তথ্য বেছে-মেনে নেওয়াতে ফাঁক থাকতে পারে। ক্ষুদ্র জগতে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি স্পষ্ট নয়। তথ্যের-ফাঁক ধরা পড়ে চিন্তায়—বোধিতে, মননে, চেতনায় অথবা উপলব্ধিতে। এই চিন্তাকে গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। প্লাঙ্কের তত্ত্বে এই চিন্তার বীজ থাকে। তবু প্লাঙ্ক নয়; সার্থক অর্থে, বিজ্ঞানের সাধনায় উপলব্ধিকে, চেতনা-বোধিকে স্থান দিলেন এলবার্ট আইনস্টাইন।

কি ঘটছে, সেটি কি ঘটতে পারে তাও জানতে পারে; পরীক্ষায় জানা তখনো পাওয়া কার্যটি অন্য অনেক কার্যের ডাকহরকরা হতে পারে। হাতের কাছে যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায়, চিন্তাসূত্রে তারা তখনো না-জানা অনেক তথ্য জানতে পারে; সে সব তথ্য জেনেই কারণটিকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, নিয়মকে ছোঁওয়া যায়। এখানে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যই একমাত্র মূল উপকরণ নয়—কাজ করে অন্য কিছু-যাকে আইনস্টাইন বললেন, Prescientific ideas—প্রাকবিজ্ঞান ধ্যানধারণা। এবং বললেন, এই ধারণা conceptual—উপলব্ধি প্রসূত, এটি phenomenal অথবা বাহ্যব্যাপার সংক্রান্ত নয় এবং এখানে কোনো বিষয়বোধ নেই। কার্যকারণের সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধারণায় আরোহণ অবরোহণের পথের বাইরে এক নতুন পদ্ধতির সূচনা হলো—অভিজ্ঞতার জগতের বাইরে যার অবস্থান। এটিকে আইনস্টাইন প্রাক-বিজ্ঞান ধ্যানধারণা বললেও অন্য বিজ্ঞানীরা বললেন, এটিও বিজ্ঞানের ধারা। সাধারণ অভিজ্ঞতার জগতের ধরাছোঁয়ার বাইরে যে জগৎ, সেটি ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হোক, সেখানে নিয়ম খোঁজার অথবা তত্ত্ব জানার পথে উপলব্ধি বা Intution কে ঠাঁই

দিতে হবে ; এটিই নববিজ্ঞান।—বললেন, এটি থাকে যে কোনো তত্ত্বের অন্তরে ; এটি তার philosophy—যে শব্দটির অর্থ পাওয়া গেল আইনস্টাইনের কাছ থেকে The hidden fundamental character—গূঢ় প্রাথমিক বিশেষত্ব। আইন-স্টাইনের পথ ধরে নববিজ্ঞানে এই বিশেষত্ব হানা দিয়েছে। চিন্তার পথে কি হতে পারে, কি পাওয়া যায় তার একটি ধারণা গড়ে ওঠে ; তারই বিন্যাসটি প্রকাশ পায় ভাষাগণিতে। গণিতের সমাধান জানায় নতুন তথ্য যারা পরীক্ষিত হতে পারে, এবং প্রতিষ্ঠা করে উপপত্তি—যা বিজ্ঞানে প্রমাণিত হয়ে তত্ত্ব হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই পথেই পাওয়া যায় মৌলকণার খোঁজ, মহাবিশ্বের মডেল এবং জাগে একীভূত শক্তির কল্পনা।

প্রচলিত দর্শনে উপলব্ধির উৎসকে চেতনা বা চৈতন্য বলে জানিয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রশ্ন তোলেন, এই উপলব্ধির উৎস কি শুধুই চেতনা ? না, এখানেও আছে অনিশ্চয়তা ? এক পরিস্থিতিতে যাকে ভাবা যায় বোধি, অন্য অবস্থায় সেই কি মনন নয় ? চেতনা তবে কি ?

বিজ্ঞানীরা এখানে পাঁচটি সম্ভাবনার কথা ভাবেন। 1. চেতনা ও বোধি—এরা সম্পর্ক মুক্ত। যাকে দর্শনে বলা হয় Epiphenomenalism বা অভিজ্ঞতার ছকে যাদের বাঁধা যায় না। 2. বোধিই হলো উৎস। 3. চেতনাই বোধির পরিচালক। 4. এ দুটি একসঙ্গে কাজ করে, তবে এখানে কার্যকারণের কোনো সূত্র ধরা যায় না। যেমন দুটি ঘড়ি ; এরা এক মেকের (make) এক টাইপের হলেও সর্বদা একই যে সময় দিবে তা হলফ করে বলা যায় না। এ দুটি এক লয়ে কাজ নাও করতে পারে। এবং সবশেষে পঞ্চম চিন্তাটি হলো 5. এ দুটিরই নির্দিষ্ট Identity বা পরিচয় আছে। —নববিজ্ঞানীরা মনে করেন বোধির স্থিতি ও চেতনার স্থিতি একজাতীয় ; শুধু দুটি বিভিন্ন বর্ণনার জন্য এদের বিভেদ খুঁজে পাওয়া যায়। এক কথায় কোয়ান্টাম তত্ত্বের কণাতরঙ্গ শব্দের মতো বোধিমনন একটি শব্দ—যা বিভিন্ন অবস্থায় বোধি অথবা মননের স্থিতি জানায়—দুটির সংযোগে যার সৃষ্টি, তাকে প্রাকবিজ্ঞান চিন্তা বলা যায়। বোধি ও মনন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। উভয়ের সামাজিক (social) মিলনে যে বোধিমনন শব্দটি পাওয়া যায়, তা তার উপকরণ দ্বয়ের থেকে আলাদা। এটি কণাতরঙ্গের মতো—যার কোনো মডেল মুখের ভাষায় সম্ভব নয়। বিজ্ঞানীরা consciousness শব্দটি যে বোধিমননের স্টেট বা স্থিতি—সেটি বিজ্ঞানের ধারায় পেলেন।

বোধিমননের আত্মপ্রকাশ নববিজ্ঞানে অতি দ্রুতচালে ঘটে যায়। সনাতন

বিজ্ঞানে ছিল তথ্য—observed facts অথবা দৃশ্য ঘটনাবলী। আইনস্টাইন দৃশ্য তথ্যের জগতে দর্শককেও আনলেন। তাঁর আলোর গতি দর্শক নিরপেক্ষ; আলোক তড়িৎ ফল দর্শকের বোধি চেতনা গড়ে ওঠা তখনো না পাওয়া তথ্যের কল্পনায় বিধৃত। আলোর দ্বৈতরূপ গড়ে তোলার সময় বিজ্ঞানীরা আরো একবার দর্শকের উপস্থিতি আনলেন। কে কি দেখতে চায় তারই সাপেক্ষে থিয়োরী পাওয়া যাবে। সেটি কণাতরঙ্গ হতে পারে অথবা হতে পারে তখনো অলব্ধ অনেক মৌলকণার প্রাকঘোষণা। এমন কি মহাবিশ্বের রহস্যের ইঙ্গিতে দর্শকের উপলব্ধির ছোঁওয়া ধরা পড়ে।—এখানে দর্শক বিস্মিত হয়ে গণিতের ছকে অগণিত সম্বন্ধের ধারায় গড়ে তোলা নিজের মডেলটির দিকে চেয়ে থাকে—এই মডেলটি কি সত্য? তবু দর্শকের নিষ্ক্রিয়তায় বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্র জগতের লীলাখেলা বোঝা যায় না। দর্শকের এখানে এই খেলাটি ভাল করে জানার জন্য খেলায় নেমে পড়তে হবে।

হেমিলটনের উপপত্তি, "যে যেমন চায়. সে তেমনি দেখে," এবং গাউসের বক্তব্য "বিশাল গতিময় পটভুমির যে কোনো অংশে গতিমান বস্তুটির উপস্থিতির সম্ভাবনা"—এ দুটি ধারণা ক্ষুদ্র কণার জগতে পাত পেতে বসে পড়ে; দুটি সূত্রে আছে অনিশ্চয়তা ও সম্ভাবনা। এই ধারণাদের ভিত্তি করে কোয়াণ্টাম গতিবিজ্ঞানের গণিতের গঠন। এই গণিতের ব্যাখ্যায় বোঝা যায় কোয়াণ্টাম রীতি-নীতি, তার ক্রিয়া পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ভাবনা। এখানে দর্শক কোন্ প্রশ্ন তুলবে? কী সে জানতে বা জানাতে চাইবে? প্রশ্ন তোলে বলে, ক্রিয়াটিতে কি-জানা-যায় জানতে চায় বলে সে নিজেও যেন অভিনয়ে অংশ নেয়। ক্ষুদ্রকণা জগতে ক্রিয়ার ধারণাটি ফেলে রাখা চিহ্নের সাপেক্ষে গড়ে ওঠে। সামান্য কয়েকটি ক্লু'র ভিত্তিতে কণায় কণায় পার্থক্য টানা হয়। এখানে দর্শক শুধু দেখে না, সে যা দেখে তার ইতিবৃত্তটি বোঝার জন্য খেলাঘরে সংসারের বিন্যাস গড়ে তোলে। সে শুধু দর্শক-অবজার্ভার (observer) নয়, সে এখানে পার্টিসিপেটার (participator)। একটি ঘটনার সমগ্রতা পরিস্ফুট হয় দর্শকের অংশ গ্রহণে। সম্পূর্ণতা বা wholeness প্রকাশ করতে দর্শকের ক্রিয়াকলাপে নামতে হবে—এটি বিজ্ঞানী নিয়েল বোরের বক্তব্য। আর বার্ণাদ দ্য' স্পাঁনা (Bernard D'Espagnat) বললেন, "ঘটনা আর দর্শক এদের সহজে আলাদা করা যায় না; এরা নিবিচ্ছেদ্য (non-seperable); এরা অবশ্যই অবিচ্ছেদ্য (unseperable) নয়।"—বিশ্বজগতের লীলাখেলা এখানে ঘটছে—এটি ভেবে শুধু দর্শক হয়ে অভিনয় উপভোগ করলে বিশ্বজগতের রহস্য ভাঙা যায় না। দর্শককে সেই খেলায় যোগ দিতে হবে। তাকে ঠিক করতে হবে

কী সে দেখতে চায়, জানতে চায়। কতটুকু জানলে তার তাৎক্ষণিক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে। এবং ধীরে ধীরে আরো গভীরে এই খেলায় তাকে ঢুকে পড়তে হবে। এই গভীরে নামার ক্রিয়াতে সে অভিনয়ের আঙিনায় অংশী হয়ে দাঁড়ায় ; পুরনো শব্দ অবজার্ভারকে হঠিয়ে নতুন শব্দ পার্টিসিপেটার হাজির হয়। দৃশ্যমান জগতে, ঘটমান পটভূমিতে বোধিমননের আবির্ভাব হয়। সেখানে সেই দৃশ্যমান-ঘটমান জগতে মানুষ নিজের ঘটনার সাক্ষী অথবা অংশী ; তার সংগৃহীত তথ্য—তার বোধিমনন, তার মেকআপের উপকরণ।

বিশশতকের দ্বিতীয় দশকে হাইসেনবার্গের হাতে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের শুরু—আর সেদিনই আরম্ভ হলো দর্শক কী দেখতে চায়, কী বুঝতে চায়, তার রীতি। এবং জানা গেল, জানার জগৎ ত্রুটিহীন হতে পারে না, এখানে অনিশ্চয়তা থাকে এবং জানার পথে কোথাও দু-একটি ফাঁক থাকতে পারে—যারা কোনোদিন দর্শকের দৃশ্যজগতে হাজির হবে না। যারা আছে জানা যাবে শুধু গণিতের সংজ্ঞায় এবং উপলব্ধির বিস্তৃতিতে। নতুন বিজ্ঞান নিয়ে সনাতন বিজ্ঞানীদের সংশয়। এই নতুন পদ্ধতির দ্বারে দাঁড়িয়ে নিয়েল বোর বললেন, "ফিজিক্সের এক নতুন ক্ষেত্রে আমরা এসেছি—এখানে পুরনো ধ্যানধারণা হয়তো লাগসই হচ্ছে না। এরা খাটছে না—কারণ পুরনো রীতিদের মানলে এটমের স্থিতাবস্থা থাকে না। অন্যদিকে এটম নিয়ে কথা বলার সময় আমরা যে শব্দ ব্যবহার করছি—তারা সেই পুরনো কালের, পুরনো ধারণার, পুরনো ভাষার শব্দ। সমস্ত ব্যাপারটাই অসহ। আমরা যেন দূরদেশে হাজির-হওয়া একদল নাবিক—যারা সেই দেশ চেনেনা, জানেনা সেই দেশের ভাষা ; অতএব জানেনা কি করে হবে আলাপ বা কথোপকথন।"—নতুন বিজ্ঞানে পুরনো ধ্যানধারণার ভগ্নদশা দেখা দেয়। যা জানা যায়, তার প্রকাশভঙ্গী অজানা। বোর বললেন, নতুন ধারণাকে জানতে, বোঝাতে হলে সেই জগতের সঙ্গে আলাপে নামতে হবে। দর্শক নয় ; জানার জন্য বিজ্ঞানীদের সক্রিয় হতে হবে ; অংশী হতে হবে।

অনিশ্চয়তাতত্ত্ব তৈরির পথে হাইসেনবার্গ শুধু পরিদৃশ্যমান তথ্যদের টেনে নিলেন। তাঁর প্রচেষ্টার দিকে তাকিয়ে আইনস্টাইন বললেন, "অবজার্ভেশন অথবা তথ্য সংগ্রহ মানে হলো একটি ফেনোমেনা ও তাকে বোঝার চেষ্টার মধ্যে সম্পর্ক টানা। এটমের অভ্যন্তরে কিছু একটা ঘটছে, আলো বেরিয়ে আসছে, তার আঘাত পড়ছে ফোটোগ্রাফের প্লেটে —আমরা সেই প্লেটে চিহ্ন দেখি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ঘটমান পদ্ধতিতে আছে এটম, তোমার চোখ, তোমার চেতনা—

আর তুমি ভাবছ সব কিছু পুরনো ফিজিক্স মোতাবেক হয়ে চলেছে। এই যে ঘটনার শৃঙ্খলে গড়া থিয়োরী এটিকে পালটালে তোমার অবজার্ভেসনও পালটায়।...কি দেখতে চাও বা জানতে চাও—সেটি থিয়োরীর উপর নির্ভর করে। থিয়োরীই একমাত্র জানায় কী তথ্য সংগ্রহ হবে।" আইনস্টাইন জানালেন চিন্তার পথে থিয়োরীর তথ্য ধরা পড়ে, আর সেই থিয়োরী জানায় কী দেখা হবে, কী খোঁজা হবে। এখানেও থাকে দর্শকের ক্রিয়া—যে ঐ থিয়োরীর সৃষ্টিতে প্রমাণে অংশী হয়ে প্রকৃতির সত্যকে জানতে চায়।

অচেনা অজানা তথ্য বিজ্ঞানে ঠাঁই পায়। কারণ বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধের ধারায় গণিতের ভাষায় যে সমাধানটি পাওয়া যায়—যদি প্রতিষ্ঠিত ফিজিকেল নিয়মকানুনের বন্ধনে তাকে ধরা যায়, সে যদি নিয়মে নির্দিষ্ট নিরূপিত হতে পারে—তবে সে ফিজিকেল জগতে সম্ভব। এই কারণে বিপরীত কণা ঘোষণা করা যায়। মেনে নেয়া যায় যেমন কণাকে, নিউট্রিনো অথবা নিউট্রন। এরা পরীক্ষার পথে তাদের উপস্থিতি জানায়। তেমনি আইনস্টাইনের জানানো মহাকর্ষ ক্ষেত্রের গ্রেভিটন কণা—অলব্ধ হলেও অসম্ভব নয়। তেমনি অসম্ভব নয় এক্সিয়ন কণা গ্রেভিটনো এবং দুর্বল ক্ষেত্রের W কণা। গণিতের ভাষায় এদের আবির্ভাবের কথা বলা আছে ; প্রচলিত—প্রতিষ্ঠিত নিয়মের বন্ধন এই কণারা মেনে চলে ; এরা অভাবনীয় নয়, অবাস্তব নয়। এদের ধরা না গেলেও, এদের উপস্থিতি মেনে নিয়ে গণিতের সাহায্যে অন্বেষণের ধারায় ভেলা ভাসানো যায়। এরা একদিন চেনার জগতে আসবে এবং W-কণা ধরা দেয়। অন্য কণাও কি অধরা থাকে ?

এখানে বিজ্ঞানের নতুন সংজ্ঞার কথা ওঠে। বিজ্ঞান কি নাস্তিক ?—নেতি নেতির ফলে দর্শন গড়ে ওঠে—এটি একটি প্রচলিত বক্তব্য। বিজ্ঞানে নেতি নেই। আছে অস্তি। এখানে সব আছে, যারা ধরা পড়ে ইন্দ্রিয়ের জগতে, যাদের টেনে আনা যায় ইন্দ্রিয়ের মঞ্চে, যারা থাকে বোধি ও মননের সম্পৃক্ত ধ্যানে—এখনো অজানা অধরা হয়ে শুধু সময়ে হাজির হবার আকাঙ্ক্ষায়। যা আছে, যার অস্তিত্ব আছে—তার অনুপুঙ্খটি জানতে হবে। জানার পথ যেন সোপান আরোহণ। ধীরে ধীরে নিশ্চিত পথে এগিয়ে চলা। পুরনো তথ্যের স্মৃতি থাকে ; আর সামনে থাকে নতুন তথ্যের তত্ত্বের উপকরণ,—যাদের ব্যবহারে তৈরি হবে নতুন ধাপ। এই বিজ্ঞান অস্তিত্ববাদী, আস্তিক ধর্মী ; এটি নাস্তিকের ধর্ম নয়। বিজ্ঞানের যে সত্য—তা অস্তিত্বটি প্রমাণ করে। এটি স্ববিরোধে ভরা নয় ; এটি একটি প্রত্যয়। নিয়েল বোর একদা হাইসেনবার্গকে বললেন, 'যদি তুমি একটা বিবৃতির বর্ণনা দাও

যা খাঁটি—তবে এর উল্টোটা নিশ্চয় ভুল। কিন্তু তোমার তত্ত্বে যদি কোনো গভীর সত্য ধরা পড়ে, তবে জেনো—সেই সত্যের বিপরীতটিও অন্য একটি গভীর সত্য হতে পারে।'—নব বিজ্ঞানের মূলে এই অস্তিত্বের ঘোষণা থাকে।

নিউটনের অস্তিত্বময় বাস্তব (Real) জগতের ধারণার কেন্দ্রে আছে অগণিত নির্দেশিত (identified) 'জিনিসের' (things) উপস্থিতি—যাদের আমরা প্রপঞ্চের এই জগতে জানতে পারি। নিউটনের জগতে একটি পাথর—সে পাথর। তার আকৃতি-প্রকৃতি বর্ণনায় কোনো দ্বিমত নেই, অসম্ভাবনা নেই। এই বাস্তব জগতের ছবি আঁকতে বিজ্ঞান সাহায্য করে—এই মত সনাতন। তবু কোয়ান্টাম থিয়োরীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই বাস্তব ধারণার বোধটি ভেঙে যায়—যা ধরা পড়ে—তা কিছু বৈপ্লবিক আইডিয়া—তারা অদ্ভুত, তারা কৌতুক। তথ্যের জগতে এই আইডিয়ায় গড়ে ওঠা ফলাফল পাওয়া যায়—অথচ মূল আইডিয়ার প্রত্যয় কটিকে বাস্তবে উপস্থাপন করা যায় না। এই জগতের সৃষ্টির কারণ খুঁজতে গিয়ে বিজ্ঞানী হুইলার বললেন, একটি কণা—সে এটম বা কোয়ার্ক হোক, তাকে সম্পূর্ণ নির্দেশিত করা যায় না। দুটি কণা যখন ইন্টারএকশনে নেমে আবার সরে যায়, তখন এই দুটি কণার পৃথক বাস্তবত্ব (Reality) খুঁজতে যাওয়া অনর্থক—এরা তখন সহযোগী হয়ে ধরা দেয়। এই জগতের সর্বত্র, সর্বদিকে কোয়ান্টাসিস্টেম কাজ করে—তারা অনিশ্চয়তা নিয়ে গড়া, সম্ভাবনার ছকে সাজানো—ছোট ছোট ঢেউ যেন। অথচ সব মিলেজুলে টানাপোড়নের ছন্দে যে বুনোটটি পাওয়া যায় সেটি বিরাট-বিশাল, একটি নিরবিচ্ছিন্ন জগৎ। হুইলার বললেন, 'এ যেন উপর থেকে সমুদ্র দেখা—সে সমুদ্র নিস্তরঙ্গ সমতল; সেখানে গতিবোধ ক্রিয়া ধরা যায় না। যত নিচে নামা যায় তত দেখা যায় তরঙ্গমালা, স্তর ভঙ্গিমা। সাগরের বুকে জাগে তরঙ্গ রাশি আর সাগরের অভ্যন্তরে ওঠে আলোড়ন—যার স্পর্শ চোখে ধরা যায় না। এই মাইক্রোস্কোপিক—আণুবিক্ষণিক জগতের ধারণা বৃহৎ জগতের যন্ত্রের সাহায্যে জানা যায়। এই সাব-এটমিক জগতের গুণধর্ম কেবল মাত্র পরীক্ষার পথে জানা যায়। মাইক্রো-জগতের গুণধর্ম প্রকাশিত হয় আমাদের অভিজ্ঞতায় গড়া জগতের ক্রিয়ার ছাঁদে।" ঠিক এই কারণে নিয়েল বোর বললেন, "ফিজিক্সের কাজ এই প্রকৃতি 'কেন' তা বোঝা নয়, প্রকৃতিটি 'কি' তাই জানা"। এবং হাইসেনবার্গ বললেন, 'গণিতের ছকে মৌলকণাদের ব্যবহার বোঝা যায় না। জানা যায় তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।' —লেবরেটারিতে আমরা এটমকে পাই না অথবা দেখি না; তার অস্তিত্ব সোজাসুজি ধরা যায় না; তার নিজস্ব উপস্থিতিটি কিভাবে

যে আছে সে বোধ আমাদের নেই। অথচ এটম আছে। এই জগৎ, এই পৃথিবী, এই প্রাণ, আমরা—সব কিছুই এটমে তৈরি। এটমে গড়া বস্তু-মেটারদের উপস্থিতি আমাদের জানা, চেনা। এই এটম গ্রীকদের জানানো এটম নয়, যার নির্দেশ আছে ; বাস্তব (real) অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্বের জগতে এটম ও তার সংসার গোলমাল পাকিয়ে তোলে। তবু তারা যে আছে, তা অভিজ্ঞতার জগতের পরীক্ষায় জানা যায় ; চেনা-জানা জগতের ইঙ্গিতে তাদের অনুভূতিময় উপস্থিতি ; —তাদের 'পরিদৃশ্যমান' (ovservable) জগতে হাজির হওয়া।

এই যে ক্ষুদ্র জগতের মেটার এরা শ্রোয়েডিঙ্গারের ভাষায় Live-dead জীবন-মৃত্যুর স্থিতিতে আছে—আছে চেনা-অচেনা ধরা-অধরার চৌহদ্দিতে। যে স্থিতির বর্ণনা আছে, পরিচয় নেই ; যার অনুভূতি আছে বাস্তববোধ নেই। সাব-এটমিক জগতে কোয়ান্টাম থিয়োরীর রাজত্বে অনিশ্চয়তা থাকে, সম্ভাবনা থাকে। অথচ আমাদের অভিজ্ঞতার জগতের নির্দেশনায় যে ধারণা তা হলো সব ঘটনার কারণ থাকে ; আর থাকে একটি পরিচ্ছন্ন নিয়মভিত্তিক পদ্ধতি। কোয়ান্টা জগতে কারণ নেই, আছে সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনার পথে গড়া নিয়ম। এখানে কাজ করে চান্স বা আকস্মিকতা। এই জীবন, এই প্রাণ-অণু—সেও আকস্মিক। গ্রীকরা ভাবতেন, এটম জানলে, প্রতিটি এটমকে বুঝলে, ভবিষ্যৎকে জানা যায়, বোঝা যায়। কোয়ান্টাজগৎ জানায় ভবিষ্যতের প্রাক-ঘোষণা সহজ নয়। সাধারণের কাছে মনে হয়, সব তথ্যের সংকলন ঘটলে এই জগতে কি ঘটবে বলা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করতেন, এটমের জগতে কোথাও সঠিক নির্দেশনা থাকে, তাদের গতি-প্রকৃতিতে থাকে ক্রিয়া-বিক্রিয়ার অনিশ্চয়তা। দুই শতক আগে পিয়ের লাপ্লাস ভাবতেন, সমস্ত এটমের সব গতি-প্রকৃতি জানলে এই বিশ্বজগতের নির্দিষ্ট চিত্র আঁকা সম্ভব। এই শতকের প্রথমপাদের আবিষ্কারে জানা যায়, এই প্রকৃতির মৌলভূমিতে একটি আপাত বিদ্রোহীসত্তা আছে। নিয়মের যে নির্দেশনা বাহ্য জগতে দেখা যায়, তার অন্তর বিরোধে ভরা, এলোমেলোমিতে গড়া। আণুবিক্ষণিক জগতে যা কাজ করে তা 'এনার্কি'— এটিই ভবিষ্যতের প্রাগুক্তির যান্ত্রিক সম্ভাবনাটি ভেঙে দেয় ; এটমের সংসারে ধরা দেয় অনিশ্চয়তা—আনসার্টেনিটি। —আইনস্টাইন ভাবতেন, ঈশ্বর এই জগৎ নিয়ে পাশার দান ফেলছেন না।…বহির্জগতে পাশার দান নেই। অথচ এই ক্ষুদ্র জগতে যা কাজ করে তা চান্স। এই জগতের অন্দরমহলে আছে চান্সের ক্রীড়াভূমি ; সেখানে শুধু আমরা দর্শক নই ; আমরা সেই খেলার সঙ্গী !—সেই

খেলা ঘরে হাজির হয়ে আমরা জানি, মেটার যত্রতত্র যেমন-তেমন ভাবে ছুটে চলে; তবু এখানে আছে তাদের একটি বাধা। এরা ক্রিয়াশীল হতে চায় না, সামাজিক হতে চায় না। এরা বিশৃঙ্খল, অথচ অলস। অলস বলেই পথের এলোমেলোমিতেও ছোট পথ বেছে নেওয়া থাকে। এই আলস্য, এই বেছে নেয়া-ক্ষুদ্র জগতে আছে বলেই, বিশ্বজগৎ ভেঙে যায় না, ধ্বংস হয় না। অন্যদিকে এই বিশ্বজগৎ একটি যন্ত্র নয়। এটি বেছে নেয়া; চান্সের পথে পাওয়া।

চান্স এবং বেছে নেয়া—এই হলো জগতের মূলে, অস্তিত্বের মূলে। যে জগৎ অভিজ্ঞতার ছকে ধরা পড়ে সেও হয়তো একটি একসিডেন্ট—অথবা সে অনেক বিকল্পের হতভম্ব রূপ। আমাদের জগৎ—যেখানে মেটার ও এনার্জির শৃঙ্খলা-সাযুজ্যবোধ দেখা দেয়, তাদের নিয়মকানুন, তাদের পরিমাণ পরিমিতি—তা হয়তো বিশৃঙ্খল কোয়ার্কের সৃষ্টি—অথবা এটি হয়তো একটি অর্থবহ সংস্থা (meaningful organisation)—যার সভ্য আমরাও। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান বা কসমোলজি—যার সাপেক্ষেই এই জগৎ আমরা দেখি, তা আমাদের জীবন থেকে আলাদা নয়;—আর এই জীবন—সেও চান্স বা আকস্মিকতাকে এড়িয়ে নেই। পরিবেশ পরিসীমায় সামান্য উনিশ-বিশ ঘটলে প্রাণ থাকে না। বিজ্ঞানী হুইলারের তত্ত্বে জানা যায়, আমরা দর্শকরা—এই জগতের একটি সামান্য অংশকে চিহ্নিত করতে পারি;—অবশিষ্ট বিরাট ভূমি থেকে এই অঞ্চল বিচ্ছিন্ন; প্রাণহীন মহাসমুদ্রের শূন্যতায় এটি যেন একটি প্রাণস্পন্দন ভরা দ্বীপ। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, যেখানে প্রাণের পরিবেশ এত সামান্য সেখানে প্রকৃতি কেন এত বিপুলা বিশালা, এত সম্পদ ভরা?—এই বিরাট প্রকৃতি অবাস্তব নয়। অনস্তিত্ব এখানে নেই। এক ভুতুড়ে অবস্থায় (Ghostly state) মিলিয়ে যেতে নেই। সম্ভাবনার তরঙ্গে পরিবেশে সর্বত্র প্রাণস্পন্দন জাগে না। এই বিরাট জগৎ আছে বলেই আমাদের অস্তিত্ব অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। চান্স এখানেও কাজ করে—কাজ করে সম্ভাবনার বিরাট পটভূমিতে এবং জীবনের সৃষ্টিতেও চান্স থাকে। প্রকৃতির বিরাটত্বে চান্স অস্বাভাবিক নয়—জন হুইলার সেই সংবাদ জানালেন।

এ সবই ধরা পড়ে গণিতের ভাষায়, পরীক্ষার পথে এবং ধরা যায় চেতনার রঙে। এই চেতনাকে ঠিক মতন সংজ্ঞায় ব্যাখ্যা দেয়া যায় না, এটির উপস্থিতি প্রাকৃতিক জগতে, ফিজিকেল ওয়ার্ল্ডে নেই। তবু আমাদের সব অবজার্ভেশন—যার সাহায্যে বিজ্ঞানের পায়ে চলার পথ গড়ে ওঠে—তার পরিসমাপ্তি ঘটে চেতনায় বহির্বিশ্বের আঙিনায়; সেই চেতনার রঙে ঢঙে সেজে তত্ত্ব এসে দাঁড়াতে পারে।

অথচ বহির্জগৎ চেতনার উপর কাজ করলেও, চেতনা বহির্বিশ্বে কাজ করতে পারে না—সেখানে কল্পনা হাজির হয়। ইন্টারএকশন তত্ত্বে জানা যায় বিশ্বজগতের মৌলিক নিয়ম হলো প্রতিটি ক্রিয়া একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এখানে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ধরা পড়ে যেন।

তবু হিবগনার, ডিউইট ও এভারেটের (Winger, Dewitt, Everett) তত্ত্ব থেকে জানা যায় বিশ্বজগতের অনুভূতিময় অস্তিত্বটিকে সুকঠিন বাস্তব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেতনার দরকার। এই বিশ্বের অন্দরমহলে কোয়াণ্টার রাজত্ব—যেখানে আছে অনিশ্চয়তার চান্স। এই সম্ভাবনাময় জগৎটিকে বাস্তবভূমিতে আনতে গেলে দরকার একটি অ-কোয়াণ্টা পদ্ধতির বহিঃপ্রকাশ। যখন আমরা এই মহাবিশ্বকে ভাবি, ভাবি তার সব উপকরণ তথ্য—সেখানে জগতের বাইরে কোনো কিছু এই দৃশ্যের দর্শক হতে পারে না। এই মহাবিশ্বে সব আছে, সব অস্তিত্ব আছে ; সব কিছুকে যদি কোয়াণ্টায়িত করা যায়, তবে বিশ্বের সেই ভগ্নস্তূপকে বাস্তবে প্রকাশ করতে একমাত্র চেতনাই পারে। এই চেতনায় অভিষিক্ত হয় দর্শক। এই চেতনা প্রাণেই নিহিত, প্রোথিত, প্রাণের ধর্ম। চেতনা জীবনের অতিরিক্ত নয়, তার অংশ। এভারেটরা বললেন, চেতনা মেটারেরই সহযোগী, পরিপূরক যেন।

মন-মেটার, দর্শন-বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব ও জড় জগতের ধূসর আস্তরণের সীমায় বিজ্ঞান আমাদের হাজির করেছে। যে সব ছবি চিত্রকল্প আমাদের চেনা-জানা, আমাদের আদরের জিনিস (Things) ছিল, এই সীমানায় তারা ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে পড়ে। তবু যাকে Reality বা বাস্তবতা বলা হয় সেখানে এদের অস্তিত্ব আছে। এই অনুভূতির সঙ্গে সময়ের সম্পর্ক যেন নেই। অন্যদিকে আকাঙ্ক্ষা অভিপ্সা ভয়ত্রাস মুক্তি বন্ধন ধৈর্য বা অধৈর্য ইত্যাদি অভিজ্ঞতা যেন সময়ভিত্তিক। এরাও চেতনার জালে ধরা। প্রকৃতির অনিশ্চয়তা শুধু মেটারের বিধৃতিতে ধরা যায় না। স্পেসটাইমে যে মেটার কাজ করে, মেটারের উপর যে স্পেসটাইম কাজ করে, মহাজগতের নাটকের অভিনয়াংশে যারা কুশীলব, কোয়াণ্টার জগতে তাদের আকৃতি-প্রকৃতি বদলায়। সাব-এটমিক জগতে তারা এলোমেলো অনিয়ন্ত্রিত ধারায় ক্রিয়ায় নামে—যে ক্রিয়া ভীমবলে স্পেসটাইমের জরাসন্ধ রূপটি দু'টুকরো করে দিতে পারে। এই অনিয়ন্ত্রিত ধারার সম্ভাবনায় চেতনার পথে সময়কে চিহ্নিত করা যায়। সময় অনুপস্থিতিও থাকতে পারে।

প্রচলিত ধর্মের সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে নববিজ্ঞানের বিরোধ দেখা দেয়। মানুষ বিজ্ঞানকে গড়ে তোলে; যে মানুষ খোঁজে সেও সামাজিক মানুষ, ব্যক্তিমানুষ। নববিজ্ঞানের ধ্যানধারণা পুরনো চেনা জগতে ওলোট-পালোট ঘটিয়ে তোলে, তবু মানবসমাজে তার প্রভাব ক্ষীণ বললেই চলে। নিউটনের হাতে গড়া পুরনো বিজ্ঞানবোধ—যা দুশোবছর ধরে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এসেছে,—এই শতাব্দীর সামান্য কটি দশকে সেখানে যেন ঝড় ওঠে, ঘূর্ণি জাগে; যার আলোড়ন-আবর্তনের গতিটির দ্রুততার জন্য তার অনুগামী অথবা প্রতিগামীর দল খেই হারিয়ে মুষ্টিমেয় হয়ে দেখা দেয়। এই নতুন ধারণার সম্পূর্ণ সংবাদ সাধারণের জানা নেই—এখানে ভাষার প্রতিবন্ধকতা থাকে। সাধারণ লোকে যেটুকু শোনে তাকে ধর্মের মত বিশ্বাসে মেনে নেয়, প্রশ্ন তোলে না; সাধারণভাবে অলঙ্কৃত উপকরণের মত আলমারির-তাকে সাজিয়ে রেখে ভুলে যায়; আর পুরনো সরল সহজ ধ্যান ধারণা নিয়ে এখনো খেলাঘর সাজিয়ে বসে থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রচলিত সত্যকে আঘাত করে। এই আঘাত আগেও এসেছে, তবে সে এখনকার মত এত নিষ্ঠুর, এত মারাত্মক নয়। এই বিজ্ঞান মানুষের চৈতন্যলোকেও সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হাজির হয়। শুধু যুক্তি নয়, উপলব্ধিকে নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক জড় জগতে বিজ্ঞানের কৃতিত্ব অসীম। এখানে কোনো আধিদৈবিক অথবা আধিভৌতিক কার্যকারণ সম্পর্ক বা ইঙ্গিতের প্রয়োজন হচ্ছে না। গ্রহনক্ষত্র অথবা কোয়াণ্টাকণার গতিপ্রকৃতি, ধর্ম-বিশেষত্ব, পরিমাণ-পরিমিতি বোঝাতে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না; প্রয়োজন লেবরেটারির, কাগজ ও কলমের। তবু জীবন সৃষ্টির জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনকে এই শতাব্দীর প্রথম শতকেও এড়িয়ে যাওয়া গেল না। জীবন এবং মানুষের চেতনা ও বোধি—এরাও জানার বিষয়। এই বিষয়টিকে জানার জন্য শ্রোয়েডিঙ্গার পদার্থবিদ্‌দের প্রাণবিজ্ঞানের আসরে হাজির হতে বলেন। সেই ডাক শুনে এলেন কণাবিজ্ঞানীরা, নব রসায়নবিদরাও; এলেন ডেলব্রুক, শীলার্ড, মনো, ক্রিক এবং কেণ্ড। আইনস্টাইনের আবিষ্কারের সাপেক্ষে জানা যায় মহাবিশ্বের সৃষ্টি বিশবিলিয়ন বছর আগে ঘটেছে—সেই জন্মের ফসিল বিকিরণ কুড়িয়ে পাওয়া গেছে; এই জন্মকালটির তথ্যভিত্তিক প্রমাণ আছে। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট জানিয়েছিল আজ থেকে ছ'হাজার বছর আগে ঈশ্বর এই জগৎ আর তাঁর প্রতিকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির এই দিনপঞ্জী নিউটনের জানা ছিল; তিনি এই পঞ্জীটি বিশ্বাস করতে, মেনে নিতে চেয়েছিলেন। অথচ এই শতকের ষষ্ঠ দশকের আবিষ্কারে এই দিনপঞ্জীকে

আঁকড়ে রাখার কারণটি যুক্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়। তবু ইহুদিয়া পালেস্টাইনের সেই দিনের স্মৃতিকে আজো টেনে এনে বিশবিলিয়ন বছরকে সরিয়ে রেখে ছ'হাজার বছরের জন্মতিথিটি উদ্‌যাপন করে চলে। একটি অযৌক্তিক হাস্যকর কাজ। একই ভাবে ডারউইনের তত্ত্ব থেকে জানা যায়, হয়তো প্রাণের উৎপত্তি পাঁচ বা তিন বিলিয়ন বছর আগে। মানুষের, মানব প্রজাতির আবির্ভাব একটি রহস্য বা মিরাকল্ নয় ; ক্রমবিকাশের পথে মানুষ হাজির হয়। হয় তো এটি একটি আকস্মিক ঘটনা, একটি একসিডেন্ট ; তবু প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ টি'কে থাকে। কারণ প্রকৃতির ঝাড়াই-বাছাইএর রীতিতে আছে যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন। রসায়ন শাস্ত্রের উন্নতির ফলে আদিম প্রাণের জন্মকাহিনীতে এখন আর কোনো কল্পনার ছাপ নেই। যে প্রাণ নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করে বংশবিস্তার করে চলতে পারে—সে প্রাণ মানুষ সৃষ্টি করতে পারে—কারণ প্রাণ একটি রাসায়নিক যৌগ। বহু বছর ধরে বহু ক্রিয়া-কলাপের ফলে এই যৌগটি জটিলরূপ পেয়েছে, তার সব কটি ধাপ মানুষের জানা নেই। সব কটি ধাপ লেবরেটারিতে সীমিত সময়ে পুনরাবৃত্ত করা সম্ভব নিশ্চয় নয়। তাছাড়া প্রাণকে বুঝতে চাইলে, তাকে বিশ্লেষণ করতে চাইলে তার রাসায়নিক উপকরণদের চিনতে চাইলে—প্রাণ থাকে না। প্রাণের জটিলতম রূপটি বোঝার চেষ্টায় এটি এখনো বাধা। তবু প্রাণের প্রাথমিক উপকরণ বা বিল্ডিং ব্লক (Building Block) আজ আর মানুষের অজানা নয়। জীবনের সৃষ্টিতে মিস্ট্রি বা মিস্টিকত্ব নেই। জটিল প্রাণের চেতনা-বোধি থাকে—এটি প্রাণের ধর্ম ; যেমন বিদ্যুতের ধর্ম চার্জ, মহাকর্ষের ধর্ম মাস বা ভর। সঠিক ভাবে এদের জানা যায় নি ; তবু জানা যায়, এদের সৃষ্টি অথবা আবির্ভাব কারো ইচ্ছা, কারো নির্দেশে ঘটেনি, ঘটে না। ঘটনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে এই সৃষ্টি। মৌলকণা সৃষ্টির বিবর্তন-বিবর্ধন ধারায় এদের পাওয়া যায়। এটিই প্রকৃতির নিয়ম। এই নিয়ম ঈশ্বর নয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ঢেকে রাখা অনেক পর্দার আরো একটির উন্মোচন ঘটে। জানা যায়, জীবন আকস্মিক হতে পারে—তবু অভাবনীয় নয় : এটি রসায়নের পথে গড়ে ওঠে। এখানে কাজ করে রাসায়নিক ফিল্ড—অধ্যাপক বার্ণলকে আইনস্টাইন একথা জীবনসায়াহ্নে জানালেন। আর তার বিশবছর পর লেবরেটারিতে বিজ্ঞানী প্রাণ সৃষ্টি করতে পারেন। জানা যায়। জীবনের বাইরে থাকেন ঈশ্বর। ঈশ্বর জীবনের সৃষ্টির কারণ নন, জীবনের ব্যাখ্যাও নন। ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ নন। ঈশ্বর মানব অতিরিক্ত, প্রাণবহির্ভূত হয়তো কিছু।

সৃষ্টির অপার রহস্য উন্মোচনের জগতে যাত্রা করে বিজ্ঞান—এটিই তার অন্বেষণ। এই অন্বেষণের পথে থাকে সত্যকে জানার সাধনা—এই সত্য হয়তো ঈশ্বর। মানুষের হাতে তৈরি ঈশ্বর-ভাবনায় যে অস্পষ্টতা থাকে তার বিলুপ্তি বিজ্ঞানের হাতে ঘটে। প্রাণ অথবা জীবনের মধ্যে ঈশ্বরের কল্পনার সচল রূপটি বিজ্ঞানের জালে আটকা পড়ে। জানা যায়, সৃষ্টির এই মহাবিশ্বে, সময়ের একমুখী যাত্রায়, কার্য-কারণ সম্পর্কের রীতিতে মানুষের ঈশ্বর মানবিক আকারই পেতে চলেছে। এই ঈশ্বর—বিজ্ঞানের ঈশ্বর নয়।

ধর্মের ভিত্তিভূমিতে বিশ্বাস থাকে এবং থাকে গোঁড়ামি ; ধর্মের সত্য প্রমাণ-ভিত্তিক নয়। অন্যদিকে বিজ্ঞান মূলত অভিজ্ঞতাভিত্তিক। ঠিক এই কারণে, অভিজ্ঞতার নিরিখে বিজ্ঞানের যে সত্য, তা সতত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধারাটি বিজ্ঞানের দুর্বলতা নয় ; এটিই তার শক্তি। এটি যে শুধু Revolutionary বা বৈপ্লবিক তা নয় ; এটি Evolutionary বা বিবর্তনমূলক। যে তত্ত্ব একদিন বিজ্ঞানে গৃহীত হয়, একদিন সেই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে ; তাই বলে সেই তত্ত্বটিকে তুচ্ছ করা হয় না, নাকচ করা হয় না। সেই তত্ত্বের নিগূঢ় সত্যটি তত্ত্ব থেকে তত্ত্বান্তরে প্রবাহিত হয় ; পুরনো সেই তত্ত্ব নতুন বিস্তৃত আঙিনায় ঠাঁই পায় : এখানেই বিজ্ঞানের চির প্রবহমানতা বজায় থাকে। দুশো বছরের জানা নিউটনের তত্ত্ব বর্ধমান মহাবিশ্বে, সুদূর দুরান্তে, ক্ষুদ্রকণার জগতে অথবা অতি সামান্য দূরত্বে দিশেহারা হয়ে দাঁড়ায় ; কোনো সমাধান দিতে পারে না। নতুন তত্ত্ব পাওয়া যায় আপেক্ষিতাবাদ, কোয়ান্টাম গতিবিজ্ঞান। আপেক্ষিকতাবাদে নিউটন তাঁর তত্ত্ব নিয়ে থাকেন, থাকেন আসন্নরূপে ; তাঁর জানানো নির্দিষ্ট চৌহদ্দি ঘেরা জগতে। এয়ারোপ্লেনের গতি বুঝতে কেউ আইনস্টাইনের গণিত ব্যবহার করবে না—সেখানে নিউটনের তত্ত্ব স্বমহিমায় উদ্ভাসিত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির এটি সোপানরূপ। প্রতিটি ধাপ যেমন অগ্রগতি বোঝায়, তেমনি জানায় দৃশ্য জগতের অনুভূতির বিস্তৃতি। অন্যদিকে বিজ্ঞানের একটি উপপত্তি ভুল প্রমাণিত হলে তাকে ফেলে দিতে যেমন বিজ্ঞানের আপত্তি নেই, তেমনি ত্রুটি স্বীকারে সোচ্চার হতে বাধা থাকে না। এটমের আবির্ভাবকে আর্নস্ট মাক বাধা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এটি সুবিধাজনক পদ্ধতি—যা হিসেব মেলাতে বেশ খাটে। সেই মাক শিষ্য এলবার্ট আইনস্টাইনের গড়া গণিতের ছকে এটমের প্রাগুক্তিটিকে সাবাস জানিয়ে বললেন, প্রাগুক্তিটি পরীক্ষায় প্রমাণিত হলে এটমের উপস্থিতির ঘোষণাকে নাকচ করা যাবে না এবং তাই হয়। এটমকে স্বাগত জানাতে প্রত্যুদ্গমন করেন এটমের

সমালোচক স্বয়ং মাক। এটিও বিজ্ঞানের আরেক শক্তি। যে শক্তি হলো প্রমাণিত তত্ত্বকে মেনে নেওয়া। দ্বিধা-সংশয়-পরীক্ষার জগৎ যে তত্ত্ব উত্তীর্ণ হতে পারে, তারা বিজ্ঞানের সত্য। এটম আছে। আর তার কিছুদিন পরেই জানা যায় এটমের অভ্যন্তরে আছে অনেক মৌলকণা—পার্টিকল। পাওয়া যায় এটম থেকে কোয়ার্ক। এবং জানা যায় মহাবিশ্বে আছে অনেক তারকালোক-গেলাক্সি। তারা আছে বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে। এই সৌরলোক একটি নগণ্য তুচ্ছ অঞ্চল মাত্র। মানুষের অন্বেষণের ধারায় এই তথ্য জানা যায়; মানুষের বোধি-মনন ও চেতনার সাহায্যে ভাষা গণিতে তাদের বর্ণনা দেওয়া যায়। এই ক্ষুদ্র আর বিশাল জগতের সত্যকে মানুষ জানতে চায়। ১৯২৯ সালে একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রকাশের আগে আইনস্টাইন বললেন, "শুরু বা শেষ—সবকিছু কোনো শক্তির ইঙ্গিতে নির্ধারিত;—যে শক্তিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমাদের নেই। নক্ষত্র থেকে অতিতুচ্ছ কীটপতঙ্গেও এই নির্দেশনা, এই নিয়ন্ত্রণ আছে। প্রাণজগৎ, বৃক্ষরাজি, মানুষ, ধূলিকণা সবকিছু এক অদৃশ্য বহুদূরগত বংশীবাদকের রহস্যময় সুরে নেচে চলেছে।" এই অদৃশ্য বিপুল সুদূর সুরের উৎসটি বিজ্ঞান জানতে চায়। সে জানাতে অনিশ্চয়তা নেই, সংশয় নেই। এই জগতে আছে নক্ষত্র থেকে ধূলিকণা, কীটপতঙ্গ থেকে মানুষ, শক্তি থেকে মেটার—সবকিছুকে জানার আকাঙ্ক্ষা-অভিপ্সা। জানার জগৎ বর্তমানে সীমাবদ্ধ, এই সীমায়িত জগৎকে নিঃসংশয়ে জানার পর অজানার পরিধিতে পা দেওয়া যাবে; জানা যাবে এখানে অজ্ঞেয়, এখনো অচেনার সান্নিধ্যের ইশারা। এই খোঁজা আর জানার জগতে মানুষ থাকে তার প্রশ্ন নিয়ে। তার ঈশ্বর চৈতন্যময় নয়। বিজ্ঞানের ঈশ্বরের অধিষ্ঠান মানুষের "হৃদয় অন্তঃপু'র নেই।"

চার

গত কয়েক দশকের গবেষণার ফলে মানবসমাজের ধর্মের ভিত্তিতে বিজ্ঞান চিড় ধরিয়েছে। অন্যদিকে সনাতন বিজ্ঞান, যা মানুষের আওতায় কিছুটা বা ছিল, সেখানেও নববিজ্ঞান ভাঙচুর ঘটায়। এই নববিজ্ঞানের সত্যান্বেষণের ধারাটি সাধারণ মানুষের অজানা। দুটি ধারণার ভগ্নদশায়, নতুন চিন্তাটিকে মেনে নিতে না পারার অসহায়তায় এক দুর্বিষহ অস্বস্তিবোধের তাড়নায় মানবসমাজ যেন প্রাগৈতিহাসিক রূপকথার কল্পরাজ্যে আশ্রয় খুঁজতে চায়। যুক্তির বদলে কুসংস্কার দেখা দেয়; সত্যের প্রবহমানতার বিরুদ্ধে তোলা হয় গোঁড়ামির বাধা; স্বচ্ছ নিরপেক্ষ

চিন্তাকে আঘাত করতে উদ্যত হয় যুক্তিহীন নিস্ফল আক্রোশ। বিজ্ঞানের কিছু কিছু ভাসাভাসা অস্পষ্ট শব্দ ধারণা নিয়ে নতুন নতুন কাল্ট (cult) এর সৃষ্টি হচ্ছে। পশ্চিমে দেখা দেয় ডাইনীতন্ত্র, মাদক দ্রব্যের প্রচলন, পূর্বে ধরা দেয় শূন্যতাবোধ অথবা পুরনো ধ্যানধারণাকে আরও নিবিড় করে আঁকড়ে ধরা। পুরনো চিন্তা প্রবাদে গড়া মতবাদে বিজ্ঞানের কিছু সত্য অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ঢুকিয়ে পূবে বা পশ্চিমে এক বকচ্ছপ জাতীয় খিচুড়ি তত্ত্ব তৈরি করা হচ্ছে; বিজ্ঞান সমাজের দিকে সেটিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলা হয়—'এটিই তোমাদের তত্ত্বের ব্যবহারিক রূপ।' সমগ্রকে খোঁজার ফাঁকটুকুকে কল্পনা দিয়ে ভরাট করে উপন্যাস সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক রূপ, যা টেকনোলজির উন্নতিতে প্রকাশ, সেখানে সাধারণ জনসমষ্টির সর্বাঙ্গীন আত্মসমর্পনের ফলে আরেক কুসংস্কার হানা দেয়। মধ্যযুগে ধর্মের বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রতিষ্ঠায় যে হানাহানি দেখা দিয়েছিল সেই একই হানাহানি বিজ্ঞানের ফলিতরূপের প্রতিযোগিতায় হাজির হয়। বিজ্ঞানের যে গবেষণা মানুষের কাজে তৎক্ষণাৎ ব্যবহৃত হতে পারে, অস্ত্রের উন্নয়নে যার প্রয়োগ, সেখানে অর্থ-বা সঙ্গতির ঘাটতি নেই। ঘাটতি শুধু সেই বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যা সত্যের চির প্রবহমানতা বজায় রাখে। এই এক বাধা যেখানে একটি বাক্যাংশ বারবার ব্যবহার হয়, এই গবেষণায় সময় দিয়ে লাভ কি?

সময় এটিও একটি পুরনো শব্দ—বিজ্ঞানের হাতে যে নতুন অর্থ পায়। সনাতন বিজ্ঞানে সময় ছিল পরম, দায়িত্ববান; যার গতি একমুখী। নববিজ্ঞানে সময়কে নিয়ে দুর্ভাবনা। অতীত মানে স্মৃতিরোমন্থন—আর ভবিষ্যৎ মানে আবেগে চেয়ে থাকা, উৎকণ্ঠা বা ভয়, আশানিরাশার দোলায় প্রতীক্ষা। মানুষের চলার পথে থাকে অতীতের অভিজ্ঞতা, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা। Motivation বা প্রেরণার উৎস হলো সময়ের এই একমুখীনতা। সময়ের এই একদিকে চলার গতিটিকে বাদ দিলে অথবা স্পেসটাইম ও মেটারকে সরিয়ে রাখলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বুঝতে চাওয়া নিরর্থক—একে দর্শনের ভাষায় বলা যেতে পারে Anthropomorphic—ঈশ্বরকে ছোট-খাট গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করে তার উপর নরত্ব আরোপের মত এক এবসার্ড কিম্ভূত চিন্তা।

ঘটনা ঘটে—কারণ সময় চলে যায়। সময়ের গতি কি ভাবে বোঝা যাবে? কত তার গতিবেগ? সময় চলছে, বইছে, ছুটছে, সময় অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে যায়; ভেসে যায়, ছুটে যায়; এটি মানুষের প্রাথমিক অভিজ্ঞতা। সময়ের যাত্রাপথটি চিন্তার জগৎ থেকে বাদ দেয়া যায় না; এটি জীবনের সঙ্গে ওতঃপ্রোত

ভাবে জড়িয়ে আছে। মানুষের মনে, বোধিতে, চেতনায় সময়ের গতি ধরা পড়ে। জানতে পারে অতীত বা ভবিষ্যৎ। ফিজিক্সের সব সূত্রে যে সময় থাকে সেই সময় সর্বত্র একই ভাবে কাজ করে; সময় অনন্য। ফিজিক্সের জগতে সময়ের বর্তমানত্ব-বোধ সুস্পষ্ট নয়। অথচ মানুষের মনে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ছোঁয়া লাগে, ছোঁয়া জাগে। আমরা অতীতের স্মৃতি টানি; বর্তমানে, এখন বা নাউ (Now) কাজ করি; ভবিষ্যতের কথা ভাবি। এই মুহূর্তটুকু হলো বর্তমান। মানুষের কল্পনায় বিশ্বলোকে ঢোকার চাবিকাঠিটি হলো এই নাউ (Now) বা এখন।

এই এখন কি? বর্তমানের দ্রুতধাবমান রূপটি বোঝাতে পারার মত এমন কিছু তত্ত্ব ফিজিক্সে নেই। এখনকে আমরা সময়ের একটি ক্ষণ বা instant বলতে পারি। কি সেই ক্ষণ—বোঝাতে উত্তর পাওয়া যায় সেই ক্ষণ—যা সবক্ষণ। যে কোনো ক্ষণে ঘটনা ঘটে, ঘটতে পারে। ঘটনাকে সময় দিয়ে চিহ্নিত করা যাবে। অন্যদিকে নির্দিষ্ট ঘটনা যে কোনো ক্ষণকে নির্ধারিত করতে পারে—সেটি হবে সেই ঘটনার এখন বা নাউ। এই দ্বিমুখী বর্ণনা ব্যাখ্যার পদ্ধতিতে প্রশ্নোত্তরের ধারা যেন ঘুরপাক খায়। তবু তুলনামূলক বিচারে, আপেক্ষিকতার সাম্রাজ্যে ঘটনা ছাড়া সময়কে চিহ্নিত করা যায় না। অন্যদিকে ঘটনা নির্দিষ্ট হয় স্পেসটাইমে। সব নাউ (Now) সব এখন বা ক্ষণমিলিয়ে সময়। কিন্তু সবক্ষণই যে এক। সব ঘটনা যে একসময়ে ঘটে তা বলা যায় না;—এটি যেন ভাষার সমার্থবাচক Tautology রীতি;—এটি সঠিক নয়।

আবার সব ক্ষণমিলিয়ে সময় যেন একটি একমাত্রিক সময়বোধ জাগিয়ে তোলে, যেখানে ক্ষণ যেন বিন্দু। এটিও ভাষাবিজ্ঞানের একটি রীতি—যেখানে শব্দার্থের সিম্যানোটিকত্ব-প্রসারত্ব বোঝানো হচ্ছে।

অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ধারণা এটি যেন ভাষাভিত্তিক। এটি ফিজিকেল বা প্রাকৃতিক নয়। ফিজিকেল সায়েন্স বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এই নাউ বা এখনের ব্যাখ্যা দিতে পারে না; এই অক্ষমতা সনাতন বিজ্ঞানে এবং কিছুটা আধুনিক বিজ্ঞানেও। তবু বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সূত্রে এই ব্যাখ্যার ইঙ্গিত কিছুটা যেন পাওয়া যায়। সময়ের যুগপত্তাবোধ (Simultaneity) যেন আপেক্ষিক। মহাবিশ্ব স্পেসে কোথাও এখন বলে সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। স্পেসে সর্বত্র কিছু না কিছু ঘটছে; বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে একটি মাত্র আলোর নির্দেশনায় একটি মাত্র দর্শকের চোখে এদের সবাইকে একসূত্রে একতালে, একলয়ে বাঁধা যায় না। দর্শকেরা বহু হলে বর্তমানের সংজ্ঞা বহু হতে পারে, বিভিন্ন হতে পারে। যে এখনের কথা মনে মনে

আমরা ভাবি, যার চিন্তা বা কল্পনায় থাকে বহির্জগতে বহু লোকের একসময়ে একই ক্রিয়ার কথা—এটি যেন একজনের ব্যক্তিগত চিন্তার বিস্তৃতি মাত্র। কোথাও সর্বজনীন এখন নেই, শুধু থাকে ব্যক্তি মানুষের নিজস্ব এখন এবং এখানে। এই ধারণার সাপেক্ষে দর্শকের বিশিষ্টতা জেগে ওঠে। সময়ের বিভিন্নতা বোঝার জন্য প্রয়োজন হয় স্মৃতির—মনের বা চেতনার; সেই জানায় অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ।

আমাদের চেতনার 'এখন' অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে চলে। এইটি Arrow of Time—সময়ের দিকচিহ্ন। এই গতির ফলে স্মৃতিতে ছাপ পড়ে, সম্ভাবনার বোধ জাগে। সময় ছুটে যায়—গতির বোধ জাগে, বস্তুর শেষ ঘটে, একটি মানুষের মৃত্যু হয়,—বর্তমান অতীতে পর্যবসিত হয়, ভবিষ্যৎ প্রকাশ পায়। তবু প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে শুধু বর্তমান থাকে। এসবই মানুষের মনের ভাষায় লেখা—যেখানে জগতের প্রতিটি মুহূর্তে থাকে সৃষ্টির প্রবহমানতা। এই সৃষ্টিই ঘটনা।

এই সময় একমুখী, তবু একই সময়ে বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে। একটি ক্ষণে একটি মেটারের লয়ে শক্তি পাওয়া যেতে পারে; আবার ঠিক সেই ক্ষণে শক্তি রূপান্তরিত হতে পারে মেটারে। সময়ের সঙ্গে বিশৃঙ্খলার বোধ বাড়ে, বাড়ে এনট্রোপি। এই বিশৃঙ্খলার ধারণা—এটিও দর্শকগ্রাহ্য। একদলের কাছে যাকে মনে হয় বিশৃঙ্খলা—সেটি হয়তো অন্যের চোখে শৃঙ্খলা। এই তত্ত্ব, এই ধারণা বা চিন্তা—এসবই স্থানিক বা লোকাল (Local)। কোয়ান্টা জগতে যে সম্ভাবনা ধরা পড়ে সেও তো স্থানিক। সে জগতে বিপরীত চিন্তা ধরা দেয়, থাকে বিপরীত চার্জ; এবং সময়ের অপ্রতিসাম্য গতিটিও যেন ভেঙে যায়—বিপরীত সময় বা সময়ের বিপরীত মুখীনতার কথা সম্ভাবনায় ধরা পড়ে। আইনস্টাইন মনে করতেন কণাজগতে কাজ করে লোকাল থিয়োরী—কোনো একটি স্থানিক পরিবর্তনের ধারায় নিহিত থিয়োরী কাজ করে (Local hidden variable theory) যার সাহায্যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের সব ফলাফল নিশ্চিত করে জানা যাবে। এই চিন্তাটি সুন্দর। তবু পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যে জানা যায় স্থানিক নীতিটি শুদ্ধ নয়। প্রকৃতির ব্যাখ্যায় কোথাও কোনো স্থানিক বিশেষত্ব নেই। প্রকৃতির নিয়মে স্পেসটাইমের স্থানিকত্ব নেই। (S. S. Freedman & S. C. Clauser—1972)।

ফিজিক্সের নিয়মে সময় থাকে। এই নিয়মের শাশ্বত ধারায় সময় থাকে, সময়ের পরিমাপ-পরিমান থাকে। এটি সেই তুলনামূলক সময়, যা সৌরলোকের গ্রহদের আবর্তনে গড়া, যা আণবিক অথবা মহাজাগতিক। এই সময়কে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর করা হয়েছে—যাতে পরীক্ষায় পাওয়া মানটিও শুদ্ধ হতে পারে। এই

এটমিক বা মহাজাগতিক সময়ের সাপেক্ষেই সময়ের ধারণা করা হতো। কারণ ফিজিক্সের যে নিয়ম পৃথিবীর বুকে খাটে, দেখা যায় খাটে সৌরলোকে অথবা দূরের নক্ষত্র জগতে। এই নিয়ম সর্বজনীন, সর্বকালীন। এটি স্থানিক নয়। কাজেই সময়ের যে পরিমাপ পৃথিবীর বুকে মানা হবে—সেটি অন্যত্রও প্রযুক্ত হতে পারে। এই সময় এক। এখানে আবার 'নিশ্চিত' থাকে না। জানা যায় মহাজাগতিক সময়ের মাপে হেরফের ঘটতে পারে। কারণ, মহাকর্ষের ধ্রুবকত্বের মানের পরিবর্তন ঘটতে পারে—এটি একটি সম্ভাবনা। তাই সব মাপ করা হয়, এটমিক সময়ের সাপেক্ষে।

এই এটমিক সময় মেক্রোজগতে কাজ কারবার চালাতে সক্ষম হলেও মাইক্রো-জগতে এটি কত শুদ্ধ? এই জগতে যে সময়ে কোনো ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে যায় তা এক সেকেণ্ডের একটি ক্ষুদ্রভগ্নাংশ মাত্র। এই জগতে ক্রিয়া প্রবাহ নিরন্তর বয়ে চলে। এখানে শেষ নেই—আছে অন্য একটি আরম্ভ। এখানে কাজ করে রূপান্তর। সৃষ্টি বা লয়—ক্রিয়েশন ও এনিহিলেশন শব্দ দুটি—দুটি রূপান্তরী অবস্থা বোঝাবে। দুটি বিপরীত কণা, ইলেকট্রন ও পজিট্রন, যাদের গতিবেগ আলোর গতির চেয়ে কম—তাদের মিলনে সেই কণা দুটির বিনাশ ঘটে, পাওয়া যায় কিছুটা শক্তি—যে শক্তি থেকে জন্ম নেয় অন্য কণা ফোটনকণা—যার গতি আলোর গতির সমান। আবার অন্য পথে ফোটনকণার সংঘাতে তৈরি হয় ইলেকট্রন-পজিট্রন জুটি। রূপান্তরে পাওয়া যায় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের কণা। বীজ ও ফসল কণার ফলাফল জানায় এই পদ্ধতিটি দ্বিমুখী। অথচ অভিজ্ঞতার জগতে একটি কাচের গ্লাস যখন টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে—আবার সেই টুকরোগুলো জুড়ে গ্লাস হয়ে দাঁড়ায় না।—এই ঘটনা শুধু অভাবনীয় নয়, অবাস্তব। অন্যদিকে বীজ কণার বিলয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় সেই শক্তি সৃষ্টি করে ফসল কণা। দুটি মেটারের আবির্ভাবের মাঝখানে থাকে একটি শক্তিস্তর—থাকে সময়ের একটি ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ—যে সময়কে যন্ত্রে মাপা যায় না এবং সেই সময়টুকুতে ঠিক কি ঘটে তা জানা যায় না। যা পাওয়া যায় তা শুরু ও শেষের কথকতা। যাকে শুরু ভাবা যায় সে হয়তো অন্য কিছুর শেষ। ভেঙে যাদের পাওয়া যায়, তারা অনায়াসে ফিরে আসে মূলে। গণিতের ভাষায় দৃশ্যবর্ণনায় জানা যায় ছোট জগতে ছোট পরিসরে, সহজ সরল পরিচিতি-পরিমণ্ডলে যা ঘটে তা অবাস্তব হলেও অসম্ভব নয়। এমন ঘটনা ঘটতে পারে। ঘটনাশ্রয়ী সময়ের দিকচিহ্নের তফাত ধরা দেয়—আইনার ওপাশের জগতে শিশু এলিসের হাজির হওয়া অসম্ভব নয়।

জলমাটি দিয়ে পুতুল গড়ে শুকিয়ে নিয়ে সেই পুতুল খেলার শেষে জলে ভিজিয়ে কাদায় মাটিতে ফিরিয়ে আনা যায়। বালির প্রাসাদ গড়ে আবার বালিতে মিশিয়ে দেওয়া সম্ভব। যে ক্রিয়া যত সহজ, যত নিরলংকার, যত সীমিত উপকরণে তৈরি, সে ক্রিয়ার প্রাথমিক অবস্থাতে, ক্রিয়াটি সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে, ফলাফল কটি ফিরে পেতে পারে। প্রয়োজন নির্দিষ্ট শক্তি আর রীতির পুনঃপ্রয়োগ। আর সেখানে অতিসামান্য ভগ্নাংশক্ষণে বিপরীত সময়ের পথে কণার যাত্রা অসম্ভব নয়।

আপেক্ষিক তাবাদ দেশকালের সূত্রটি জানিয়েছে। আমরা জানি ভবিষ্যৎ আছে; সেখানে ঘটনা ঘটবে যাদের আমরা আমাদের জীবনের যাত্রা পথে পেতে পারি। একটিমাত্র দর্শকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে জানা যায়, এই যে ভবিষ্যৎক্ষণ — সেটি বাঁধা আছে বর্তমানের সঙ্গে যুগপত্তার বন্ধনে। সময়ের একক প্রবাহ থাকে না; থাকে নানা ঘটনার সম্পর্কের অপরিবর্তনীয় রূপ। এই ঘটনার শুরু একটি ঘটনা দিয়ে—সেটি বিশ্বজগতের শুরু অথবা সৃষ্টির আরম্ভ। এই যে আরম্ভ বা শুরু—সেখানে সময়েরও আরম্ভ; তার আগে সময় নেই, কারণ সময়ের বোধ নেই। এই চিন্তার সাপেক্ষে দুটি প্রাচীন চিন্তা বিজ্ঞানে হানা দেয়—একটি হলো cosmological argument অথবা মহাজাগতিক বিতর্ক—যে বিতর্কের বিষয় এই সৃষ্টির কারণ কি? দ্বিতীয়টি হলো পাশ্চাত্ত্যে খ্রীষ্টান ধর্মমতে—সময় ও ঈশ্বরের সম্পর্ক। ঈশ্বর সময়ে নির্দিষ্ট, না তিনি কালাতীত [ব্রহ্ম নিরাকার, কিন্তু ব্রহ্মার আকার আছে! ব্রহ্ম কালাতীত এবং নির্দিষ্ট—এটি হিন্দু দর্শনের বক্তব্য।] এই বির্তকের কালে ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিপ্পোর সেণ্ট আস্টিন বলেন, "এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি সময়কে নিয়ে, সময়ে নয়।" আজকের ফিজিক্স সময়কে জগতের অংশ বলে মানে। এই সময় মহাকর্ষের টানে স্পেসটাইমের মোড়কে মোড়া, গতিতে গড়া। এই সময়কে লেবরেটারিতে মাপা যায়। মেটারের মত এও মানে ফিজিক্সের নিয়ম। মেটারকে যে ভাবে ব্যবহার করা যায়—একই পদ্ধতিতে সময়ের ব্যবহার হতে পারে। বর্তমানে একীভূতশক্তিক্ষেত্র চিন্তায়, মেটারও যেন স্পেসটাইমের মত এই ফিজিকেল মহাবিশ্বের দায়ভাগী, এই মেটার নিজেও সৃষ্টি করে ফিল্ড। এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে যদি এই মহাজগতের কারণ বা ব্যাখ্যা বলে ধরে নেয়া হয়, তবে এই ঈশ্বর সময়েরও ব্যাখ্যা এবং তার অবস্থান হবে এই সময়ের বাইরে।

নিউটনের সময়ে মানুষের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট ভাবে ধর্ম বা Religion জড়িয়ে ছিল। যে কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক বিবর্তন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার —সব কিছুর মধ্যে ধর্ম জড়িয়ে পড়তো। খ্রীষ্টান জগতে প্রচলিত ধর্মের রীতি-

নীতিতে যাঁরা প্রতিবাদ তুললেন, তাঁরা প্রোটেস্টান্ট। বিজ্ঞান জগতের বিপ্লবী নিউটনও ছিলেন ধর্মে প্রোটেস্টাণ্ট। নিউটন ভাবতেন বিজ্ঞান জগতে তিনি যে আবিষ্কার করেছেন, তা ধর্মের সহায়ক হবে, তাঁর আবিষ্কার ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে না। —প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থে তিনি বললেন, "এই বিশ্বজগৎ কলের মত নিয়মমাফিক চলে। আর দুনিয়ার এই কলটি চালান স্বয়ং ঈশ্বর।' সমকালীন বিজ্ঞানী লাইবনিৎস বললেন, 'নিউটন বিজ্ঞানে যা প্রকাশ করেছেন, তা মেনে নিলে ঈশ্বরে আর মানুষের বিশ্বাস থাকে না।' নিয়মভিত্তিক, নিরপেক্ষ জগৎসংসারে, দর্শনের চিন্তায় ঈশ্বর সেদিন কোণঠাসা হয়ে দাঁড়ান। কান্ট-হেগেল যে জড়দর্শন গড়ে তোলেন সেখানে নিয়মের প্রতিষ্ঠা; তথ্য থেকে কার্যকারণের ইঙ্গিতে বুদ্ধি গ্রাহ্য তত্ত্ব গড়ে তোলা। তবু লাইবনিৎস মনে করেন সব শুরুতে যে একমাত্র কারণটি থাকে—তিনি ঈশ্বর। এখানেই কার্যকারণ ধারার অবলুপ্তি।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে জানা যায় সঙ্কোচনের অসীম ধারায় স্পেস-টাইমে সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়;—যে সীমারেখা অসীম; যেখানে স্পেসটাইম একটি বিন্দুমাত্রিক অবস্থান পেতে চলে; যাকে গণিতের ভাষায় বলা হয় সিঙ্গুলারিটি। এই সিঙ্গুলারিটি যেন স্পেসটাইমে সীমাটানা—যে সীমার ওপারে ফিজিকেল মহাবিশ্বের বোধ থাকে না; এখানে স্পেসটাইমের সমাপ্তি; ফিজিকেল আইনকানুন, অতএব, খাটে না। ফিজিক্সের অবলুপ্তি এখানে। এই বিগ্ ব্যাঙ্ সিঙ্গুলারিটিতে—যাকে বিজ্ঞান জানিয়েছেন সৃষ্টিতে বিন্দু অথবা সৃষ্টিকাল হিসেবে—এখানে 'কারণ' 'ব্যাখ্যা', 'সময়' নিয়ে চিন্তা করা যায় না। কারণ এখানে পূর্ব বা before এর কোনো বোধ নেই। স্পেসটাইম ও মেটারের অবলুপ্তি এখানে। এই সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে স্পেসটাইম স্তব্ধ—আর মহাবিস্ফোরণের পর, বর্ধমান বিশ্বলোক সৃষ্টির মুহূর্তে স্পেস-টাইম দেখা দেয়, মেটার উঁকিঝুঁকি মারে। ঈশ্বর যদি সৃষ্টি কর্তা হন, তবে বিগ্ ব্যাঙের পর তাঁর আবির্ভাবটি অবাস্তব। অন্যদিক সঙ্কোচনের পথে সব যখন সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে থেঁতো হয়ে জমাট হয়ে থাকে, সময়ও গতিহীন হয়ে দাঁড়ায়—সেখানে কি ঈশ্বরের শেষ? না, ঈশ্বর আছেন এই জন্মমুহূর্তের বাইরে?

এই বিশ্ব বর্ধমান, অন্তত বর্তমানে এই বর্ধমান বিশ্বের ছাপ ধরা পড়ে। এই সতত বিস্তারমান মহাবিশ্বে কোথায় যে স্বর্গলোক নামের জায়গাটি থাকে তা বেঠিকানা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীর সৃষ্ট মহাবিশ্বলোকের মডেলে স্বর্গ কোথাও থাকতে পারে না। অথচ স্বর্গ না হলে ব্যক্তিস্বরূপ (Personal) ঈশ্বরের স্থান কোথায়? —আপেক্ষিকতা তত্ত্বে গড়া জ্যোতির্বিজ্ঞানে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য নেই। যে ঈশ্বরের

রূপ মানুষের সৃষ্টি সেই অনন্ত শক্তিমান ঈশ্বরের নিজস্ব অধিষ্ঠানটি অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়। একদিন উধ্বর্পানে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা হতো ঐখানে ঈশ্বর আছেন —সে বিশ্বাসের ভিত নেই। ঐখানে উধ্বর্লোকে ঈশ্বর নেই। যে ঈশ্বরের কল্পনা করা হবে, সে ঈশ্বর রইবেন স্পেসটাইম ও মেটারে গড়া জড় জগতের বাইরে—যার থাকতে পারে একটি অ-মেটার স্থিতিভূমি। মেটারের বাইরে, জগতের বাইরে ঈশ্বর নামের অন্য একটি সত্য হয়তো আছে।

স্পেসটাইমে গড়া মহাবিশ্বের নানা রূপের কল্পনা বিজ্ঞানীরা করেছেন। আইনস্টাইন জানিয়ে ছিলেন, এই বিশ্বলোক বর্ত্তুল ও স্থির। অন্যদিকে হাবলের তথ্যে জানা যায় এ বিশ্ব বর্ধমান। ফ্রিডম্যান বর্ধমান বিশ্বের মডেলটি আইনস্টাইনের তত্ত্ব থেকেই পেলেন—এটি সতত বর্ধমান হতে পারে অথবা হতে পারে বৃদ্ধির শেষে সঙ্কোচনের পথে তার প্রাথমিক অবস্থায় ফিরে আসা। গোল্ডবণ্ডি স্থির ও বর্ধমান বিশ্বলোকের একটি এডহক মিল টানলেন। আর সর্বশেষে গোল্ড জানালেন প্রতিসাম্য (symmetric) সময়ের বিলুপ্তি ;—সময়ের দ্বিমুখীনতার ছকে গড়ে ওঠা যুগল বিশ্বলোকের চিত্র—যেখানে মহাবিশ্বের দোলায় সময় আটকে পড়ে থাকে। রূপ নানা—কারণ বিকল্পও যে নানা। অথচ গোল্ড ও আইনস্টাইনের গড়া মডেলে একটি সৃষ্টিবিন্দু থাকে—যাকে বলা হলো বিগ্‌ব্যাঙ সিঙ্গুলারিটি যার বিস্ফোরণের ফসিল চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। অতএব আইনস্টাইনের বিশ্বলোক প্রমাণিত নয় ; এখানে সৃষ্টি নেই, লয় এবং ক্ষয়ও নেই। চির-যৌবনা উর্বশীর মত আপনাতে আপনি বিকশিত এই বিশ্ব ; এই রূপ সুন্দর ; তবু একে আঁকড়ে রাখা হবে না ; এটি পরিত্যাজ্য।

সৃষ্টির যে দোলন বা বৃদ্ধির কথা বিজ্ঞান জানাচ্ছে, তার বাইরে কি থাকে ? সময়ের দ্বিমুখীনতার ঘোষণা মহাজাগতিক চিন্তায় ঠাঁই পায় ; অতএব যাকে নেগেটিভ বা বিপরীত সৃষ্টি ভাবা হয়, সেটি যদি সঠিক হয় তবে সৃষ্টিবিন্দু আর লয়বিন্দু— এ দুটি কোন চিত্রটি প্রকাশ করবে ? এই দুটি শুরু শেষের সম্পর্কটি কি ? শুরু ও শেষের মাঝের পথ—যে পথে বিশ্বলোক ফিজিকেল জগতে প্রকাশিত হতে পারে— সে পথটি কতটা নিয়মানুগ ? কোয়ান্টাম গণিতে জানা গিয়েছিল সৃষ্টি ও লয় দুটি অবস্থার রূপান্তর মাত্র। এখানেও কি সেই রূপান্তর তত্ত্ব প্রকাশ পাবে ? সৃষ্টি ও লয় কি আবার সৃষ্টি ও লয়ের পুনঃপ্রবাহ ঘোষণা করবে ? না—এটি একটি নির্বাণ— যা শুধু বিলয় বোঝায় ? যদি বিশ্বজগৎ নির্বাণে বিসর্জিত হয়, তবে ঈশ্বর কোথায় থাকেন ?

এই প্রশ্নপত্র নিয়ে বিজ্ঞানে আজকের চিন্তা—যার উত্তর জানা নেই। এই প্রশ্নদের এড়ানো হয় না। কোনো কোনো মহলে একটি চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে—এসব প্রশ্নের উত্তর জানার সহজ উপায় হলো কার্যকারণ ও তার ফলাফল—এ জাতীয় পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ নাকচ করা। কার্যকারণ বা সম্পর্কবোধ হলো একজাতীয় হাতিয়ার—যেমন চিন্তাভাবনা বা উপলব্ধি; এরা জিজ্ঞাসু মানুষের পথ যষ্টি। ফিজিক্সের জগতে এরাই জানায় সময় ভিত্তিক নানা ইন্টারএকশন (Interaction) বা অন্তর্ক্রিয়া—যার ফলে ধ্বংসের রূপ ধরা পড়ে। বরং ধরে নেয়া হোক, এই মহাবিশ্ব একটি সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার, একটি ফেনোমেনা। যেমন জার্মান বিজ্ঞানী হার্মান ভীল (Weyl) বলেছিলেন, 'এই জগৎ হয়নি, এটি আছে।'—এই জগতের শুরু নেই, শেষ নেই, এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া; এই জগৎ স্পেসটাইম, মেটার ও ইন্টারএকশন দিয়ে তৈরি। এই জগৎ অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলেছে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, ঘটনা থেকে ভিন্ন ঘটনায়। অস্তিত্বের জটিলতম জালে ঘেরা এই জগৎ—যে জগৎ বিস্ময়ের। এই জগতের আবির্ভাবের ইচ্ছাতে আছেন ঈশ্বর; যিনি আছেন এই সৃষ্ট জগতের স্পেসটাইমের বাইরে। নিউটনের তত্ত্বে লাইবনিৎস ঈশ্বরকে আনেন। আইনস্টাইনের বিশ্বলোকেও ভীল ঈশ্বরকে খুঁজে পান—তবে সেই ঈশ্বর থাকেন শুরু শেষহীন বিশ্বলোকের বাইরে। ভীল ও আইনস্টাইনের মৃত্যু বছর, 1955 সালের ঠিক দশ বছর পর বিগ ব্যাঙ কালে ঘটে যাওয়া পশ্চাৎপটের বিকিরণের খোঁজ পাওয়া যায়; জানা যায় এই জগৎ হয়েছে, তাই আছে। এই জগৎ স্পেসটাইমের সৃষ্টি নিয়ে শুরু, স্পেসটাইম নিয়ে তার যাত্রা। এই জগতের ক্ষেত্রে ঘটে চলা ইন্টারএকশন এটিকে বৃদ্ধি বা সঙ্কোচনের দিকে নিয়ে চলেছে। বিশ্বলোকের যে মডেলই ধরা যায়, সতত বর্ধমান বা সঙ্কোচন—দুটির শেষ পাওয়া যায় স্পেসটাইমের ধ্বংস। এই ইন্টারএকশন যা স্পেসটাইমের ধ্বংসের কারণ—সেটি কি সৃষ্টির আদিতে থাকে? এই ইন্টারএকশন কি? কি তার উৎস?

ছয়

আইনস্টাইনের তত্ত্বে object বা বস্তুর পরিবর্তে দেখা দেয় মেটার—যে মেটার শক্তির রূপান্তরিত অবস্থা বলে সেও ফিল্ড বা ক্রিয়াক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। বৌদ্ধ চিন্তার মত আইনস্টাইনের মেটার নানা শক্তির প্রবাহে গড়া। এই মেটার জড় নয়; তার নিজস্ব আপেক্ষিক গতি আছে এবং স্পেসটাইমে ক্রিয়া করতে পারে।

অন্যদিকে স্পেসটাইমে মেটারের সৃষ্টি। এই মেটারের ক্রিয়াশক্তি আছে—এরা কাজ করে কোয়ান্টা জগতের অতিক্ষুদ্র অঞ্চলে, আবার কাজ করতে পারে দূর দূরান্তে। বিজ্ঞান এই শক্তিদের চারিটি বলে জানিয়েছে—এরা নিউক্লিলিয়ার, দুর্বল, তড়িৎচুম্বক ও মহাকর্ষ। এরাই ইন্টারএকশনের কারণ। আইনস্টাইনের কল্পনায় এই চারটি শক্তির একটি উৎসক্ষেত্রের রূপারোপে ধরা পড়ে। একটি অনন্ত-ক্ষেত্র থেকে চারটি শক্তির উৎসধারা। তাদের প্রবাহ পথ আলাদা, শক্তির মান ভিন্ন, ক্রিয়াকলাপের পরিসীমা পরিমিতিও ভিন্ন এবং ভিন্ন তাদের গুণধর্ম ও বিশেষত্ব। তবু এই চারটি ধারা একটি অসামান্য ক্ষেত্রে সমন্বয়ের বাঁধনে বাঁধা পড়তে পারে। যেমন র‍্যালে জিনস ও ভীনের দুটি ফর্মুলা মাক্স প্লাঙ্কের জানানো একটি মাত্র গণিতের ছকে বাঁধা যায়, যেমনি একটি গাণিতিক রীতিতে সমস্ত শক্তি সূত্রকে একটি মাত্র সর্বানুভূ শক্তির পটে ধরা যাবে—এই আইনস্টাইনীয় কল্পনাটি বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে আজ আর অসম্ভব নয়। তবু যে পথে আইনস্টাইনের এই প্রচেষ্টা, এই সমন্বয় গড়ে উঠে তার থেকে ভিন্ন একটি পথে। বর্তমানের জানার পদ্ধতিতে এই ছক সম্পূর্ণ নয়; এটি একটি প্রাথমিক নকশা, যার পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, অলংকরণ ইত্যাদি হবে। গণিতের ছকটিকে শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর রূপে আঁকা হবে। তবে জানা যায় এই চারটি শক্তি মেটারের জগতে কাজ করে। পরীক্ষা—অভিজ্ঞতা যুক্তি-উপলব্ধি-বোধ ও চেতনের সমন্বয়ে জানা গেছে ফিজিক্সের ইন্টার-একশন শক্তি সরল থেকে জটিলতম মেটারের ক্রিয়াকলাপের অংশী। মৌলকণার সৃষ্টি স্পেসটাইমে—এটি আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম গ্রেভিটিতত্ত্ব—দুটি থিয়োরী থেকে জানা যায়। মৌলকণার বাঁধন ইন্টারএকশনের পথে, এটমের রাসায়নিক সংযোগ ইন্টারএকশনের উপস্থিতিতে। রসায়নের পথে প্রাণের উৎপত্তি; মেটারের প্রবাহ পথে প্রাণ যেন একটি ঝর্ণাধারা। প্রাণের জগতে ইন্টারএকশনের কি যে ভূমিকা—সেটি স্পষ্ট নয়। তবু জানা যায় অন্তর্ক্রিয়া ঘটে একমাত্র মেটারের সাম্রাজ্যে এবং প্রাণ মেটারের সৃষ্টি। বিগ ব্যাঙ থিয়োরীতে জানা যায় সৃষ্টি বিন্দু সিঙ্গুলারিটি এবং তার কিছু পরের অংশে ফিজিক্স কাজ করে না। সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলের কাছাকাছি জায়গায় আপেক্ষিকতা বাদ কাজ করে না; অন্যদিকে অসামান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঞ্চলে কোয়ান্টাম গণিতের প্রয়োগ করা যায় না। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো তত্ত্ব জানা নেই, যার সাহায্যে সিঙ্গুলারিটির গভীরে মানুষ পা বাড়াতে পারে। মানুষের কল্পনা-চিন্তা-যুক্তিবোধ-সব কিছু তার আগেই স্তব্ধ অচল হয়ে দাঁড়ায়। চেনাজানা মেটারের সৃষ্টি এই অঞ্চলের পরে,

সেখানে ফিজিক্স ও ইন্টারএকশন কাজ করে—এবং ইন্টারএকশনের ধারায় সরল থেকে জটিলতম মেটারের সৃষ্টি হয়—মেটারের অবলুপ্তিও ঘটে। ইন্টারএকশন কাজ করে মেটারের ক্ষেত্রে, স্পেসটাইমের জগতে। অতএব যেখানে মেটার নেই, সেখানে সর্বনুভূ তত্ত্বটি কাজ করতে পারে না—সেই তত্ত্বের হদিশ সেখানে নেই। এই সর্বনুভূ তত্ত্ব—একীভূতশক্তিক্ষেত্র তত্ত্বে সব শক্তি একত্রিত হলেও—এই শক্তিক্ষেত্র সৃষ্টির "কারণ" নয়; সৃষ্টির জন্মবিন্দুতে এই শক্তি থাকে না। বিজ্ঞানের ঈশ্বর সর্বানুভূ শক্তি নয়।

স্পেসটাইমের জগৎটিকে বিজ্ঞান বুঝতে চায়; অথচ এটিকে জানার বা বোঝার অভিজ্ঞতা মানুষের থাকে না। সমগ্রভাবে, সর্বতোভাবে মানুষ এই জগতের ক্রিয়া উপলব্ধি করতে পারে না। চেনাজানা ফিজিক্সের পরিসমাপ্তি ঘটে এই স্পেসটাইমের প্রান্তসীমায়—সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলে। অথচ আপেক্ষিকতাবাদ জানায় এটিই সৃষ্টি বিন্দু। এই অবস্থাটিও অস্বস্তির। বিকল্প সৃষ্টি কল্পনা কোয়ান্টাম অনিমিত্তবাদকে নিয়ে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়। কারণ সিঙ্গুলারিটি অঞ্চলের সীমারেখায় আপেক্ষিকতাবাদ দিশেহারা হলেও, কোয়ান্টাতত্ত্ব তার কাছাকাছি অঞ্চলে দৃষ্টি দিতে পারে। কোয়ান্টাতত্ত্বে জানা যায় কোয়ান্টাম আন্দোলনে (fluctuation) আপনা থেকে মৌলকণা হাজির হয়। এরই রেশ টেনে, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জগতের অকারণ পুলকে পাওয়া কণার মত স্পেটাইমের আবির্ভাবটি ভাবা হয়—যে আবির্ভাবটি নিমন্ত্রিত বা রবাহুত নয়, সম্পূর্ণ অনাহুত। গণিতের ব্যাখ্যায় জানা যায় এই মহাবিশ্ব আপনা থেকে তৈরি—এই যে কোয়ান্টামতত্ত্বের ছকে গড়া বিশ্বলোক—এটির স্থিতি ও কাল দুটি অতি ক্ষুদ্র; একে বলা যাবে বীজ (seed)। এই বীজটিতে থাকে বিপরীত মহাকর্ষ শক্তি (antigrvatiy) যার উপস্থিতিটি বর্তমানের একীভূত শক্তিক্ষেত্রে আছে বলে ভাবা হয়—এটি আছে অতি শক্তি (Super energy) জগতে এই অতি শক্তিমান বিপরীত মহাকর্ষের ধাক্কায় ছোট বীজটি ফেটে পড়ে; যে বিরাট শক্তিটি বিপরীত মহাকর্ষের রূপান্তরে পাওয়া যায় সেটিই সৃষ্টি করে বিশ্বলোক,—মেটার ও বিকিরণ!—এই যে থিয়োরী, এটি সম্ভাবনার সূত্রে গড়া। এই তত্ত্বের সাপেক্ষে সব কিছুর অস্তিত্বের একটি বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায়। এটি বিগ ব্যাঙ থিয়োরীর মত নয়—যেখানে সব মেটার এমন থেঁতো হয়ে থাকে যে, ফিজিক্স সেখানে কাজ করতে পারে না। নতুন মহাকর্ষতত্ত্বটিতে এত দিশেহারাত্ব ভাব নেই। এখানে জানা যায়, ফিজিক্সের কাঠামোতে স্পেসটাইম আপনা থেকে হাজির হতে পারে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থার বর্ণনা বর্তমান বিশ্বলোকের সাপেক্ষে

অপ্রাসঙ্গিক ; বিস্ফোরণের পথে সেই অবস্থার সব স্মৃতি হারিয়ে যায়, মুছে যায়,—যা পাওয়া যায়, তা চেনা-জানা বিশ্বলোক ; অনিশ্চয়তা তত্ত্বে গড়া এই বিশ্বলোকে যে ফিজিক্স থাকে সেটি ক্ষুদ্র জগতের ফিজিক্স—যেখানে সম্ভাবনা আছে এবং আছে অকারণত্ব। এই কোয়ান্টা বিশ্বলোক জানায় ফিজিকেল জগতের স্ট্রাকচার ও বিন্যাসের প্রাথমিকতায় ও প্রারম্ভিকতায় এলোমেলোমি আছে। কিভাবে শুরু হয়েছিল, সেই ব্যাখ্যাটি নিশ্চিত জানা নেই। যা জানা যায়—একবার শুরু হলে বিস্ফোরণের ধারায় ফিজিক্সের নিয়ম দেখা দেয়। এই নিয়মে ধরা পড়লে বিশ্বলোক আপনা থেকে চলে যেতে পারে। চলার পথে সর্বত্র ফিজিক্স থাকে।

আমাদের অভিজ্ঞতার জগৎ—নিউটনের জগৎ। এই জগৎ যেন যান্ত্রিক। এর দুই পাশে মাইক্রো ও মেক্রো জগতে নিউটনের নিয়ম খাটে না ; যান্ত্রিকতা বোধ সুস্পষ্টও নয়। লিলিপুট আর ব্রবিংডানের জগতে হাজির হওয়া গালিভার নিজের অভিজ্ঞতার ছকে দেশ দুটিকে বোঝার চেষ্টা করে। এখানেও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দুটি জগৎকে দেখা—দেখতে চাওয়া। তবু তিনটি অঞ্চলে একই নিয়ম খাটে না। মাইক্রোওয়র্ল্ডে কোয়ান্টা গণিতের প্লাঙ্কের ধ্রুবক সর্বত্র থাকে। এই ধ্রুবকের নির্দেশনায় জানা যায় এই জগৎ নিরবচ্ছিন্ন নয়, নিস্তরও নয়। এখানে অনির্দেশ থাকে এবং থাকে অনিশ্চয়তা। এই ধ্রুবকের মান নিউটনের জগতে শূন্য বলে, সেখানে নিরবচ্ছিন্নতা দেখা দেয়, দেখা দেয় যান্ত্রিকতা। নাটকের অভিনয়ে যে অভিনেতাটি প্রথম অঙ্কে দাপটে দেখা দেয়, দ্বিতীয় অঙ্কে তার কোনো স্থান নেই। অন্যদিকে মেক্রোওয়র্ল্ডে যে থিয়োরী কাজ করে সেটি রিলেটিভিটি—যেখানে আলোর গতি দর্শক নিরপেক্ষ এবং অনতিক্রম্য। এই জড়জগতে-আলোর চেয়ে গতিমান কোনো বস্তু থাকতে পারে না। নিউটনের জগৎ ছোট গতি নিয়ে গড়া। তার পরিসীমাটিও ছোট। নিউটনের তত্ত্ব বিরাট বিশাল পশ্চাদ্‌পটে, বিরাট গতিতে কাজ করতে অক্ষম। সেখানে আলোর গতির ধ্রুবকত্ব নিয়ে থাকে রিলেটিভিটি। আবার এই আলোর গতিটিকে অসীম করলে রিলেটিভিটি ক্ষেত্রে যে নিয়ম পাওয়া যায়—তা নিউটনের গতিবিদ্যা। ধ্রুবকত্বের বিসর্জনে আবার নিউটনের তত্ত্ব হাজির হয়!

নিউটনের তত্ত্বে সর্বত্র নিয়মের পরিপূরকত্ব দেখা দেয় নি। তার কারণ এটি শুধু একটি সামান্য অঞ্চল, সামান্য গতি নিয়ে গড়ে তোলা। বুনটে ফাঁক ছিল বলেই কল্পনার সুযোগ ছিল। বিজ্ঞানের অন্যতম অংশ হলো থিয়োরী। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ধারায় থিয়োরী থাকে। এই থিয়োরী থেকে যে প্রাগুক্তির নির্দেশ পাওয়া যায়, তাদের পরীক্ষার পথে প্রমাণ করাও যাবে। এর মানে এই নয় যে, একটি তত্ত্ব এমন নিটোল নিভাঁজ হবে যেন সব অচেনা-অজানার ঠাঁই সেখানে হতে পারে। বলা যায়, একটি থিয়োরী একটি দলের, ফেনোমেনার আচার-ব্যবহার বোঝাতে পারে এবং জানাতে পারে সেই দলের সীমাটি কোথায়। গালিলিওর গতিবিদ্যা একটি ফুটবল মাঠে প্রযুক্ত হতে পারে, নিউটনের গতিবিদ্যা যা গালিলিও'র গতিবিদ্যা নিয়ে গড়ে তোলা সেটি এই অভিজ্ঞতার জগতে খাটে। রিলেটিভিটি খাটে মহাবিশ্বে আর তার আসন্ন ফল হিসেবে পাওয়া যায় নিউটনের তত্ত্ব। অন্যদিকে অণু-পরমাণুর জগতে আছে কোয়ান্টাম গতিবিদ্যা যেখানে নির্দেশনা নিরবচ্ছিন্নতা বোধ আনলে নিউটন হাজির হয়। সব কটি জগতে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। তবু সব নিয়মের ধারায় যেটি পাওয়া যায় তা নিয়মে গাঁথা একটি সাতনরী হার। একটি নিয়মের মুক্তাটি অন্য নিয়মের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে গাঁথা যে, তাদের আলাদা ভাবা যায় না। গণিতের ভাষায় জানা যায় নিয়মে পরিপূরকত্ব আছে।

ফিজিক্সের নিয়মের সরল সৌন্দর্যটি বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। প্রতিটি নিয়ম পরস্পরের সঙ্গে সুসমঞ্জস সঙ্গতি টেনে যে সুষমাটি প্রকাশ করে সেখানে জানা যায় এই বিশ্বলোকে আছে হার্মনি-সমন্বয়তা। ফিজিক্সের নিয়মে নকশা বা যে ডিজাইনটি ধরা যায় সেখানে থাকে অটল অসমঞ্জস, সুসঙ্গত-সঙ্গতি। এই জগতের জটিলতায় গণিতের কমপ্লেক্স রীতির ছাপ ধরা পড়ে—যা দেখে রোজার পেনরোজ মনে করেন এই জগৎটিও কমপ্লেক্স ; প্রাথমিক এলোমেলোমির বিড়ম্বনাটুকু কাটিয়ে ওঠার পর যা দেখা যায়, তা সুস্থিত-শৃঙ্খল রূপ। এই জগতের শৃঙ্খলার নিয়ন্ত্রণে আছে নিয়ম যার ব্যাখ্যা গণিতের ভাষায় দেয়া যায়, যার অন্বেষণ অথবা বিন্যাস গণিতের সুদূর-প্রসারিত আঙিনায় বিজ্ঞান তার কাজের ভাষা খুঁজে পায়। সেই আশ্চর্য সুন্দর আঙিনাটিকে দেখে পল ডিরাক বিস্ময়ে বলেন, ঈশ্বর একজন মহাগণিতজ্ঞ! এই ব্যঞ্জনাটিও প্রশ্ন জাগায়—ঈশ্বর কি গণিতের স্রষ্টা অথবা গণিত কি ঈশ্বরেরও আগে? লজিকের নিয়মে যে গণিতের সৃষ্টি সেই গণিতের ধারণাটি ঈশ্বরের কি ছিল? একটি বিশেষ ভঙ্গীতে, গণিতের পথে ফিজিক্সের নিয়মগুলি তিনি কেন গেঁথেছেন?

কেন এই আইন, এই নিয়ম? এখানে যে প্রশ্ন তোলা হলো তাও যে সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তের কল্পনা!

স্পেসটাইম-মেটার-প্রাণ-চেতনা—এই শৃঙ্খলধারার প্রতিটি অংশ নিবিড় করে জানায়। জানায় বিজ্ঞান, যে বিজ্ঞান মানুষের সৃষ্টি; আর যার যুক্তি-চিন্তা-উপলব্ধি-পরীক্ষার ভিত্তিভূমিতে থাকে অভিজ্ঞতা-চেতনা-মনন আর সবার উপর মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কবান মানুষ বিজ্ঞানের পথে সত্যটি খুঁজতে চায়। স্পেসটাইমের শৃঙ্খল ধারা—একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রবাহ; এখানে প্রাথমিক এলোমেলোমি আছে, বৈপরীত্য আছে, থাকে বিরোধাভাস, সম্ভাবনার স্বীকৃতি ও অনিশ্চয়তার আবির্ভাব। এগুলি সবই নিয়মে নিষিক্ত। এরা সত্য। এরা আছে। এই সর্বাস্তিবাদের জগতে তবু একটি প্রশ্ন—এই নিয়ম শৃঙ্খলার সৃষ্টি কেন? স্পেসটাইমের সৃষ্টির কারণ কি? কি সেই সত্য?

এই সত্যের নিদের্শনা মানুষের কাছে নেই। এই সত্য-সৃষ্টির উৎসমুখ—যা থাকে মেটার স্পেসটাইমের বাইরে—লজিক-গণিত ও ফিজিকেল নিয়মের বিমূর্ত জগতে। এই সত্য অথবা ঈশ্বর, পুরনো দিনের মত স্রষ্টা আখ্যা পেলেও ইনি একটি নিয়ন্ত্রা যার অস্তিত্ব প্রকৃতির বাইরে এবং যে প্রকৃতিতে আছে অন্য সব অস্তিত্ব। আইনস্টাইন তাঁর অন্বেষণে প্রকৃতিকে বুঝতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির বাইরে—যেখানে ফিজিক্স খাটে না—সেখানে দৃষ্টি দিতে চান নি। এই প্রকৃতির বুকে পরম-স্পেস বা পরম সময় নেই, জড় মেটারে ধরা যায় অনিয়মিত কোয়াণ্টাম এনার্জির আন্দোলন। এই জগতে থাকে বিরোধে ভরা অথচ সঙ্গতি মেনে নিয়ে অস্তিত্ব—ফিল্ড ও পার্টিকল, স্পেসটাইম ও শক্তি, মন ও মেটার। অভিজ্ঞতার ছকে এদের একত্রিত করা যায় না। তবু এরা আছে, আছে এই বিশ্বজগতে, প্রকৃতিতে। এর বাইরেও সত্য থাকতে পারে। সেই সত্য বিজ্ঞানের ঈশ্বর। তাকে জানার সোপানধারা এখনো অজানা।

নিউটনের তত্ত্বটি নিয়ে যে কসমোলজিকেল আর্গুমেণ্ট বা মহাজাগতিক বিতর্কটি শুরু হয়েছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেদিন বিজ্ঞান-দার্শনিকরা জানিয়ে ছিলেন পরম কারণ—পরম ব্যাখ্যা ঈশ্বর আছেন এই মহাবিশ্বের বাইরে। এই ঈশ্বর সেদিন 'প্রয়োজনীয়' ছিলেন, কারণ ফিজিকেল নিয়মকানুন গুলির সবকটিকে লজিকের সূত্রে বাঁধা যায় নি; নিয়মগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যেন বিস্ময় ও ভীতি জাগিয়ে তোলে। সেদিন এই নিয়মগুলি বোঝার জন্য মনে হয়েছিল একটি সর্ববেত্তা মন (Mind) যেন সবকিছুর ডিজাইনে এবং নিয়ন্ত্রণে আছে। এই

জগৎটি আপনা থেকে নিজেকে চালু রেখেছে, কোনো পরিচালকের প্রয়োজন নেই—এই চিন্তার পিছনে যা থাকে তাহলো এই জগৎটির ব্লুপ্রিন্ট যাঁর তৈরি, তিনিই একমাত্র মাস্টারপ্ল্যান মেকার—ঈশ্বর!

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টা তত্ত্বের সাপেক্ষে বিশ্ব-জগতে এটম থেকে কোয়ার্ক, গ্রহ থেকে কোয়াসারে যে নিয়ম দেখা যায়, তারা প্রাকৃতিক জগতেরই অংশ। এই নিয়মগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক, এই ধারায় পাওয়া যায় সম্পূরক নিয়ম এবং সবার শেষে সমন্বয়ে গড়ে তোলা শক্তিক্ষেত্র! এই জগতের বর্ণনা ফিজিক্স দিতে পারে—সেই ফিজিকেল জগৎটির পরিসীমাটিও জানা। তবু এই জগতের বর্ণনায় যে ভাষাটি ব্যবহার করা হচ্ছে—তার অনুবাদ সহজ নয়, অনায়াস নয় বলেই এই জগতের অভিজ্ঞানের ছোঁওয়া মিষ্টিকত্ব জাগিয়ে তোলে। কোয়ান্টাম ফিজিক্স, রিলেটিভিটি, ব্ল্যাকহোল অথবা সিঙ্গুলারিটি—এদের ঘিরে কল্পনাসাম্রাজ্য গড়ে উঠতে দেরী হয় না। অথচ দেখা যায়—যে শক্তির কল্পনা আধুনিক বিজ্ঞানের পূর্ববর্তীকালে ছিল—যন্ত্রের মত বিশ্বলোকের পটভূমিতে, পরম স্পেস ও পরম সময় নিয়ে যিনি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় সুউচ্চ মঞ্চে রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই ঈশ্বর ও তাঁর প্ল্যানট দেশকালের মোড়কে, কোয়ান্টাম কসমোলজিতে ব্যক্ত হচ্ছে না। এখানেও কসমোলজিকেল বিতর্কে জানা যায় এই জগৎ—যা হয়েছে বলে আছে—তার সৃষ্টি আছে। যে সৃষ্টির রহস্য সমাধান ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও ভাষা গণিতের সাহায্যে, টেকনোলজির উন্নতবিকাশে হতে পারে। এই জগতের পথে সর্বত্র নিয়ম আছে। সবকটি নিয়ম জানা নেই। তবু দেখা যায় নিয়মে পরিপূরকত্ব সম্পূরকত্বের ইশারা আছে। নিয়মে নিয়মে যে বাঁধন সেটি সর্বত্র ঘটেনি। তবু একত্রীকৃত শক্তির গবেষণায়, কোয়ান্টা গ্রেভিটির কল্পনায় নিয়মের বুনোটের মাকুর টানাপোড়েনের আদর ইঙ্গিত ভেসে আসে।

আট

স্বভাবে বিজ্ঞান অশেষ, কারণ জিজ্ঞাসাও শেষহীন। নতুন টেকনোলজির আবির্ভাবে পরীক্ষা ও তথ্য সংগ্রহের নতুন দিগন্ত ধরা যায়। যা আগে ভাবা যায় নি, যাদের আগে ধরা যায় নি,—তারা সম্ভব হয়, তাদের অস্তিত্বের ঘোষণা শোনা যায়। তবু টেকনোলজির উন্নতিতে সব থিয়োরীর প্রমাণ পাওয়া কি সম্ভব? ইনারশিয়া অথবা জাড্য এবং গ্রেভিটেশন অথবা মহাকর্ষকে একটি সূত্রে গাঁথা যায়—

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্বের এই আইডিয়ার সূচনা গালিলিওর হাতে এবং এটির প্রমাণ মহাবিশ্বলোকের গবেষণায় বর্তমানে পাওয়া যায়। তবু টেকনোলজির কোন উন্নতির ধারায় ইণ্টারএকশনের একীকরণের যে গণিতটি পাওয়া যাবে—তা কি পরীক্ষিত হবে? এটি পরীক্ষিত না হলে গণিতের ভাষায় গড়া থিয়োরীটি হাইপথেসিস বা উপপত্তি হয়েই থাকবে। এখানে 'গাণিতিক সৌন্দর্য' বা Mathematical Beauty-টি বিজ্ঞানকে কতদূর অধিকার করতে পারবে—সেটিও প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। বিজ্ঞানের সর্বজনীন রূপটি পরীক্ষার সাহায্যে গড়ে তোলা হয়। একীভূত ক্ষেত্র সমীকরণটি সম্পূর্ণ হলেও—সেটি সর্বজনীন কিনা সেখানে সংশয়-দ্বিধা থেকে যেতে পারে।

এই বিজ্ঞান কতদূর সম্পূর্ণতার দাবী করতে পারে? মানুষের জিজ্ঞাসার অন্ত নেই, প্রশ্নেরও শেষ নেই। মহাকাশে একটি তারা বা নক্ষত্র কোথায় কোন অঞ্চলে পৃথিবী থেকে কত দূরে আছে—তা বিজ্ঞান জানাতে পারে। ঐ তারাটি ঠিক ওখানেই কেন—এই প্রশ্নের উত্তরে সম্ভাবনাতত্ত্ব হাজির হয়। গণিতের ভাষায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়। যে তারাটি কয়েক বিলিয়ন বছর আছে, হাজির হয়েছে—সেটি কোন পথে কোন ধারায় সেখানে হাজির—তার স্মৃতি নেই, শ্রুতিও নেই। আছে গণিতের ভাষায় গড়া ইতিহাস। এই ইতিহাস কতটা সম্পূর্ণ?

সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা নিয়ে ভাবনা শুরু হয়। থিয়োরীরা একটি নির্দিষ্ট পরিসীমায় সম্পূর্ণ। ম্যাক্সওয়েলের ইলেক্ট্রোডাইনামিকসে যে ফোর্স-ইলেকট্রিকেল চার্জ তৈরি করে সেটি নিয়ে ভাবনা নেই। এটমের উত্তেজিত কক্ষের ঘোষণায় উত্তেজনা জোগানোর কারণটি তত্ত্বের বাইরে থাকে। জেনারেল রিলেটিভিটিতে মেটারের স্থিতির সমীকরণ কটি এই তত্ত্বের আওতায় থাকে না বলে ধরা হয়। তবু এই থিয়োরীরা নিজের অধিকারে থাকে—এরা স্বরাজ্যে সম্রাট। অন্যদিকে থার্মো-ডাইনামিকসে যে সাম্যভাবের কথা ধরা হয়, সেটি স্ট্যাটিসটিকসের সাহায্যে গড়ে তোলা। এখানে সম্পূর্ণতা নেই। অনুপুঙ্খটি না জেনেও তত্ত্ব গড়ে তোলা যায়; তাকে প্রমাণিত করাও যায়। সম্পূর্ণকে না জেনেও সত্যের দ্বারে হাজির হওয়া যে যায়—এটিও বিজ্ঞানের একটি শক্তি, একটি গর্ব। এখানে কাজ করে গাণিতিক সৌন্দর্য।

এই অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বিজ্ঞানী ভাবেন, অসম্পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণতার ছোঁওয়া জাগাতে পারে। সম্পূর্ণ করে জানা, অনুপুঙ্খটিও শুদ্ধ করে জানা, প্রতিটি ব্যষ্টিকে জানা—একটি অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা। তবু যা জানা যায় তাকে ভাল করে জানা—

সেটিই হলো বিজ্ঞানের পথ। তাই বিজ্ঞানে সম্পূর্ণকে খোঁজার প্রচেষ্টা চলে। আইনস্টাইন-এডিংটন-শ্রোয়েডিঙ্গার ও হাইসেনবার্গ একটি ওর্য়াল্ড ইকুয়েশন বা মহাজাগতিক সমীকরণের কথা ভাবেন—যেটি একীভূত ক্ষেত্রতত্ত্বের সম্পূর্ণরূপ। এই সম্পূর্ণতা গণিতের কাঠামোয় গড়া যায়। এই সম্পূর্ণতা থেকে বিচ্ছিন্ন ধারা কটি প্রমাণিত হতে পারে। গণিতের এই কাঠামো পরোক্ষে প্রমাণিত হবে। এই অসম্পূর্ণতাই এর সম্পূর্ণতার নির্দেশনা!

সব থিয়োরীতেই কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা, অজানা থেকে যায়; কারণ পরীক্ষার পথে সব থিয়োরীর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। নিউটনের গতি-বিদ্যায় আর্বিটারি ফোর্সের স্থিতি থাকে; আইনস্টাইনের জেনারেল থিয়োরীতে থাকে মেটারের স্থিতির আবিটারি সমীকরণ অথবা ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রো ডাইনামিকসে চার্জ ও ডায়পোলদের আর্বিটারি গতি। এদের মেনে নিলে তত্ত্বটির প্রাগুক্তিগুলি প্রমাণিত হয়। এরা নিজেরা নিজস্ব তত্ত্বে প্রমাণিত নয়। এগুলি তত্ত্বের সিদ্ধান্ত। যদি এই জগতের নিয়ম কটিকে এই জগতের আঙিনায় বসে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা যায়, তবে এলোমেলামি—রেণ্ডামনেসকে এড়ানো যায় না। অথবা জন হুইলার যেমন ভেবেছিলেন কণাজগতের এলোমেলোমি বাইরের জগতে ধরা পড়ে না—তেমনি এই জগতের অসম্পূর্ণতা এলোমেলোমি এই জগতের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলে অবাস্তব মনে হবে না। এই জগতে থেকে যা দেখা যায়, সে দেখা অসম্পূর্ণ হতে পারে; তবু সেখানেও সত্যের ইশারা জাগে। আপেক্ষিকতা ও অনিশ্চয়তা—নববিজ্ঞানের দুটি ধারায় যে সত্য জানা যায়—তা আপেক্ষিক। এটিই এই জগতের সত্য। এর বাইরে যদি কোন সত্য থাকে, তার সাপেক্ষে এই সত্যটি সম্পূর্ণত্ব পেতে পারে। সেখানে এই জগতেও সব অজানা-অচেনার বিনাশ। অন্যথা এই জগতের সত্যে কিছু অজানা,—কিছু অচেনা, কিছু অন্বেষণার উপকরণ থেকে যাবে। অন্যদিকে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টির বাইরে যদি কিছু থাকে, সেই অচেনা সত্যটি এই প্রকৃতির পূর্ব;—যেখানে কোয়াণ্টাম ফিজিক্স অথবা স্পেসটাইমের বিশ্বলোক পা বাড়াতে পারে না।

আইনস্টাইন ও নিয়েল বোর প্রকৃতির বাইরে যে পূর্ব বা Before আছে তাকে খোঁজা নিরর্থক মনে করেছিলেন। বোর বলেছিলেন, এই প্রকৃতি কি এটিই জানার বিষয়; প্রকৃতি 'কেন'—তা বর্তমানের অন্বেষণের ধারায় থাকে না। আইনস্টাইন বললেন, 'বাইরে ঐখানে আছে মহাবিশ্ব—মানব সম্পর্ক স্বাধীন, একটি বিরাট প্রহেলিকার মত; যার একটি সামান্যতম অংশ আমাদের চোখে পড়ে।' বাইরের

ঐ জগৎ নিয়ে প্রকৃতি সম্পূর্ণ। তিনি বললেন, 'এই জগতের সবচেয়ে অবোধ্য বিষয় হলো যে, এই জগৎ বোঝার ও জানার।' এই জানাটি ও বোঝাটি কি সম্পূর্ণ হবে? হতে পারে?

আজকের দিনে বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্ন যত না অস্বস্তির আর শংকার— ততটা জোগায় সমাধানের প্রয়াসে উৎসাহ। সনাতন বিজ্ঞানের ঠাসবুনোটি যুক্তিশৃঙ্খলে এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় না। কারণ যুক্তির মুক্তিতে গড়া কোয়ান্টাম তত্ত্বটিকে ঠেলে রাখা যায় না। এই তত্ত্ব এত বিচিত্র বিবিধ সমস্যার সমাধান করতে যে সক্ষম! অন্যদিকে নতুন তত্ত্ব আপেক্ষিকতা মহাকর্ষতত্ত্ব সৃষ্টি কালের চৌকাঠে বিজ্ঞানকে হাজির করতে পারে। দুটি তত্ত্বের সহযোগিতায় পরিপূরকত্বে একটি সম্পূরক তত্ত্ব গঠনের চেষ্টা চলে। আর অন্য দিকে খোঁজা হয় মানুষের প্রাচীনতম জ্ঞানের ভাণ্ডারের রত্নরাজি। ভাষায়, মুখের কথায়, যা একদিন মানুষ বলে গেছে তাদের গণিতে যদি অনুবাদ করা যায়, তবে সেই অনুবাদ নতুন কোন পথের ইঙ্গিত জোগাতে পারে কি? বিজ্ঞানীরা হাত বাড়ায় চীনের তাও, জাপানের জেন এবং ভারতের বৌদ্ধ ও উপনিষদের তত্ত্বে।

তাও জানায় পথের কথা, যা ছিল সৃষ্টির পূর্বে। সৃষ্টির জননী সে, স্রষ্টাও সে। সব সৃষ্টির গুদাম ঘর এই পথ। এই পথেই আছে সব কিছুর অস্তিত্ব—তার বস্তুধর্মও! আবার তাওয়ের সহযোগী হলো তে—যার অর্থ ধর্ম বা গুণ। এই যে পথ তারও গুণ আছে। এবং গুণ আছে বলে সে নিয়মে বিধৃত। তাও যেন নব-বিজ্ঞানের সৃষ্টির বীজটি, যার চরিত্রে আছে উ-উয়ে (wu-wei) অথবা নিষ্ক্রিয়তা। এই পথ নিজে কোন ক্রিয়ায় নামে না—অথচ সব কিছু অস্তিত্বের স্বভাবজ অবস্থাটি সে যেন বয়ে নিয়ে যায়। পথের বাঁকে বাঁকে ধরা পড়ে নতুন ধর্ম, গুণ বা নিয়ম। এ যে নব-বিজ্ঞানের কথা!

অথবা ধরা যাক জেন তত্ত্ব। যা জানায় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হলো বিজ্ঞান; আর বোধিমননের সংশ্লেষে যে জ্ঞান পাওয়া যায়—তাই প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা ইনটিউশনের পথে গড়ে তোলা জ্ঞান। ক্ষুদ্রকণা জগতের তত্ত্ব হলো কোয়ান্টাম থিয়োরী—যার চরিত্র বা স্বভাব নিয়ে বিজ্ঞানে মতভেদ আছে। এই মতভেদ হলো রিয়েলিজম বা বাস্তবতা এবং নমিনেলিজম্ বা সংজ্ঞাবাদ নিয়ে। প্রথমটি যেন জানায় সং আখ্যা বা টার্ম যেন একটি বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতার সূত্ররূপ। দ্বিতীয়টি সেখানে যেন কতগুলি আকৃতি বা স্ট্রাকচারের নির্দেশ জানায়—যে আকৃতি কটি অভিজ্ঞতার মুকুরে দেখা যায় না। সংজ্ঞাবাদ ধীরে ধীরে টেনে নেয় সক্রিয়তা

(operationalism) এবং উপযোগিতা (utilitarianism)। উপযোগিতার পথে পরীক্ষায় পাওয়া ফলের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। এখানে অভিজ্ঞতার ব্যাখ্যায় ধরা পড়ে গণিতের ফর্ম বা কাঠামো। ক্ষুদ্রকণা জগতে রিয়েলিটি বা বাস্তবতার সম্পর্ক নেই। কোয়ান্টাম তত্ত্ব যেন সংজ্ঞাবাদের সহচর।

অন্যদিকে বর্তমানে সংগৃহীত তথ্য থেকে বিজ্ঞান যদি ভবিষ্যদ্বক্তি করে চলে, তবে এই জগতে অভিজ্ঞতার জগতের বোধ স্পষ্ট নয় বলে, কোনো অভিজ্ঞতা ধরা পড়ে না; যে জ্ঞান অভিজ্ঞতার পথে পাওয়া—সেই জ্ঞান নেই। প্রচলিত সংজ্ঞাবাদের সংকট এখানে। এখানে নব-বিজ্ঞান জানায়, বিজ্ঞানের তত্ত্ব কোন কিছুর সাপেক্ষে গড়ে ওঠে—এটি পরীক্ষায় তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার চিন্তা শুধু নয়; প্রশ্ন তোলা যায়, কার সাপেক্ষে তত্ত্ব গড়ে ওঠে? কান্টের সময় থেকে বিজ্ঞানের এই প্রশ্ন দর্শন জগতে আন্দোলিত হয়েছে। বিজ্ঞানের ইতিহাসও একটি নির্দেশনা আনিয়েছে—একটি 'ভেবে নেওয়া' জগতের সাপেক্ষে একটি তত্ত্বের বিচার সম্ভব নয়। বাস্তবতা অভিজ্ঞতার স্পর্শ ছাড়া নলেজ বা জ্ঞান অথবা ইগ্‌নোরেন্স বা অজ্ঞানতার কোনো চিহ্ন নেই; অথচ দিব্বি ভবিষ্যদ্বক্তি করা চলে! সংজ্ঞাবাদ বা নমিনেলিজমে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ঘটলে, বিরোধ মিটে যায়—তবে জ্ঞান থাকে না। অন্যদিকে বাস্তববাদ এই জগতের সম্পূর্ণ ছবি এনে দিতে পারে—পারে না বৈপরীত্য বা বিরোধের মুখোমুখি হতে।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব এই দুই তত্ত্বের সহযোগী হয়ে পরিপূরকত্ব মেনে দিয়ে জানায় স্টেট (state); স্টেটের সম্পর্ক টেনে এনে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করা হয়। অথচ ক্ষুদ্রকণা জগতে একটি মুহূর্তে কণার আগমন-নির্গমন, লয়-ক্ষয় ঘটে বলে স্টেটকে নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। এখানে স্টেটকে বলা হলো state of affairs—অথবা বিষয়-ঘটিত অবস্থা—একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় বা স্পেসে যে ঘটনা ঘটছে তারই সাপেক্ষে স্টেটকে স্থির করা হলো।

কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে মুখ ফিরিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন এ যেন বৌদ্ধ দর্শনের আলোকে, জেন তত্ত্বের সাপেক্ষে জগৎ দেখা। অভিজ্ঞতা বহির্ভূত জগতে যা ঘটে চলেছে, সেই গভীর লোকের ক্রিয়াকলাপ প্রজ্ঞার আলোকে বোঝা; বিজ্ঞান এখানে প্রজ্ঞায় স্থিতি পায়। এখানে খেলা করে বিপরীত গুণ, স্টেট অথবা শক্তিস্তর। এই শক্তিস্তর যেন য়িন বা য়্যাঙ—যারা পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বৈপরীত্য-বিরোধকে মেনে নিয়ে এই জগৎ। যার অন্তরে এই বিরোধ নিত্য। অথচ এই বৈপরীত্য আনে সহযোগিতা—আনে পরিপূরকত্ব। আবার যে জগৎ বিরাট

বিশাল—সেখানে অভিজ্ঞতার ছোঁওয়া স্পষ্ট নয়। সেই জগৎটিও যেন মার্গ,—একটি পথ, একটি তাও—যার আঁকেবাঁকে নতুন নতুন গুণধর্মের আবির্ভাব। পথেই আছে ধর্ম, তার গুণ—আর সব পথ মেলে পথের উৎসে। পথই জানায় মানুষের আবির্ভাবের কথা। যে মানুষ ঐ পথ, তার ধর্মকে খুঁজে চলতে চাইবে। তা না হলে সৃষ্টি কর্তার প্রেম, সৃষ্টির উদ্দেশ্য মিথ্যে হতো! উপনিষদ জানালো পথে চলার কথা!

শুয়ে থাকলে কলিকাল, উঠে বসলে দ্বাপর, দাঁড়ালো ত্রেতা—আর চললেই পাওয়া যায় সত্যকে। এক-দুই-তিন-ও চার—সত্যের বিভিন্ন পদে মিলে পাওয়া যায় দশ—সম্পূর্ণ সংখ্যা রাশির উৎসকে—যা এক থেকে শূন্য। নানা ক্রিয়ার সমাহারে পাওয়া যাবে এ জগতের অসম্পূর্ণ সত্যটিকে—যা এই জগতেই আছে।

আরো জানায় মানুষের আবির্ভাব প্রকৃতির শর্তে। অতএব প্রকৃতিকে মেনে নিতে হবে। তাও এবং জেন জানায় আদর্শ মানুষ হলো প্রকৃতির সহচর, জীবন ও মৃত্যুর সখা! কত তুচ্ছ এই মানুষ! তবু সে সহচর-সখার গরবে গরবী! আশ্চর্য নববিজ্ঞানও সে কথা যে জানায়!—তবু কতটা মানুষ জানতে পারে? কত পথ সে হাঁটতে পারে?

১৯২৬ সালে বার্লিনে এলেন রবীন্দ্রনাথ। কবি ও বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আলোচনা করলেন সত্য ও সুন্দর নিয়ে; আলোচনা হলো অনিশ্চয়তা-আকস্মিকতার জগতের দ্বৈত অস্তিত্বের রূপ আর বিরোধ নিয়ে। কঠিন নিয়মের ব্যতিক্রম জীবন আর প্রকৃতিতে দেখা দেয় বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে, তাঁর মনের কাছে, জীবন এত সুখের, এত আনন্দের ও সুন্দর বলে মনে হয়। তিনি বলেন, সব জানা গেলে এই জগৎ একঘেয়েমিতে ভরে ওঠে। কিছু রহস্য থাকা ভাল—তাতে খোঁজার আনন্দ থাকে। বৌদ্ধ নির্বাণ তত্ত্বের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কবি ও বিজ্ঞানী দুজনেই চাইলেন না। খোঁজার আনন্দতেই জীবনের সৌন্দর্য ধরা যায়। সম্পূর্ণ করে, নিশ্চিত করে সত্যকে জানা এই জগতে হয়তো সম্ভব নয়। বর্তমানে জানা তত্ত্বের পথে সেই সত্যকে খোঁজা যায় না। তবু প্রকৃতির রহস্য-উন্মোচনের আকাঙ্ক্ষায় খোঁজা হয় এই সৃষ্টির কারণ, এই সৃষ্টি কেন। এটিও অন্বেষণের। এই অনুসন্ধানের পথ জানা নেই। এই জানার পথে অজানার অশেষ হাতছানি। এই অন্বেষণের শেষ কি আছে? প্রকৃতির বাইরে, সৃষ্টির বাইরে বিজ্ঞানের অন্ধকারের রাজত্বে প্রজ্ঞার সান্নিধ্যে থাকে বিজ্ঞানের দক্ষিণ নায়ক—একটি সত্য। সেটিই বিজ্ঞানের ঈশ্বর। এই জগত থেকে সেই ঈশ্বর চির অচেনা-অজানা হয়ে থাকে। তবু সেই সত্যের অপূর্ণতাকেই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ করে জানতে চায়।

এই বিজ্ঞান সত্যের সন্ধানী।

ভাষায় দেখা

বিজ্ঞান-সাহিত্য

খুব বেশী দিন আগেকার কথা নয়। এই সেদিনও গ্রামে গঞ্জের কোনো বাড়িতে নতুন মানুষ, অতিথি এসে হাজির হলে সে বাড়ির প্রাচীনতমা মহিলাটি জিজ্ঞেস করতেন, 'বাবা, তোমার বাড়ি কোথায়? কি কর? বাড়িতে কে কে আছেন? ইত্যাদি। পরিচয় পাবার পর তিনি খুঁজতেন সম্পর্ক বা সম্বন্ধ; চেনাজানা জায়গা বা মানুষের সঙ্গে এই অতিথিটিকে মেলাতে পারেন কিনা। অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গীতে এই খোঁজটি তিনি করতেন। আর সবশেষে একটা সম্পর্ক বা মিল খুঁজে পেয়ে ভারি আশ্বস্ত হয়ে স্বস্তিতে একগাল হেসে বলতেন, 'আরে, তুমি তো আমাদের আপনজন।' ...কোলের কাছে বসে থাকা শিশুটিকে বলতেন, 'সম্পর্কে এ তোদের কাকা হয়; কাকা ডাকিস।' ...সম্পর্কটা খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত যে যন্ত্রণা তাঁর চোখে-মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল, সে সব মিটে গিয়ে সারা মুখে ফুটে ওঠে খুশি-খুশি, সুখী-সুখী হাসিটি!

সম্পর্ক খোঁজা নিয়ে বিজ্ঞানীদের সেই এক যন্ত্রণা। জগতের মঞ্চে প্রকৃতির নানা কারুকৃতি, নানা অভিনয়, নানা ক্রিয়াকলাপ। এর মধ্যে কোথাও লুকিয়ে থাকে রীতি-নীতি অথবা নিয়ম-সম্পর্ক। কারুকৃতিতে ধরা পড়ে আঙ্গিক বা ফর্ম; অভিনয়ে আছে ছলাকলা —লীলা-খেলা; ক্রিয়াকলাপে থাকে অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি। আর এদের পরিবেশনায় প্রকৃতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, সম্পর্ক সম্বন্ধের মূল সূত্রগুলো জানা যায়; নিয়মকে খুঁজে পাওয়া যায়। এই নিয়মগুলোই মানুষ আর প্রকৃতির সম্বন্ধটি সুদৃঢ় করে তোলে। প্রকৃতির রহস্যের একটা কুলকিনারার দেখা পায় মানুষ; সেই দেখাতে তার মুখে ফুটে ওঠে খুশি-খুশি হাসি। সে হাসি বিজ্ঞানের।

এই যে সম্পর্ক খোঁজা—যার ফলে নিয়মকে জানা যায়—সেই খোঁজার পরিধি পরিবেশ কতটা? যেমন 'ক' বাবুর গল্প। ইনি অফিসে দোর্দণ্ডপ্রতাপ সাহেব, ক্লাবে ভারি মজলিশি; সভাসমিতিতে বিদগ্ধ সজ্জন; আর বাড়িতে ইনি নাতিটির সঙ্গে খুনসুটি করেন; স্ত্রীর সঙ্গে পুজোর বাজার নিয়ে হিসেব করেন; ভয়াবহ চাহিদা দেখে মিনমিন করে প্রতিবাদ তোলেন। এখানে 'ক' বাবুর কোন রূপটা আসল?

জীবন চরিতকার বলবেন, সব মিলিয়েই তিনি। একেক পরিসীমা, পরিবেশে, একেক সময়ে তিনি বিভিন্ন ঘটনার নায়ক ; বিভিন্ন তাঁর ক্রিয়াকলাপ। কোথাও তিনি স্বয়ম্ প্রধান, কোথাও তিনি অনেকের একজন ; কোথাও তিনি দায়িত্ববান, কোথাও বা পরনির্ভরশীল। সব অবস্থায় নানা সময়ে, বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে তাঁকে জানা যাবে। বহু ঘটনার সম্পর্ক পথে তাঁকে বিশদ ভাবে বোঝা যায়। এই সব নানা ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কটি 'ক' বাবুর আসল রূপটি জানাবে—তিনি তখন আর রহস্য নন।

বিজ্ঞানী যখন প্রকৃতিকে জানতে চান, তখন তাঁদের একটি ইচ্ছা—প্রকৃতির রহস্যের যবনিকাটি সরিয়ে তাকে বিশ্বমঞ্চের পাদপ্রদীপে প্রকাশ করা। এজন্যই এত সম্পর্ক সম্বন্ধ খোঁজা—নিয়ম জানতে চাওয়া। প্রতিটি নিয়মের আবিষ্কারের পর রহস্যের কুহেলি যেন কিছুটা ঘুচে যায়। অতি তুচ্ছ ঘটনাগুলোও এখানে তুচ্ছ করা যায় না। সামান্যতম আন্দোলন আলোড়নটুকুও এই রহস্যের উন্মোচনের সূত্র হতে পারে ; সেই সূত্রটির পরিমাণ জানা যেতে পারে তুলনামূলক পদ্ধতিতে ; এটি হতে পারে স্বাভাবিক অথবা সম্ভাবনার দৃষ্টিতে ঘেরা। সম্বন্ধ-সম্পর্কের সূত্রটিই জানায় নিয়ম।

প্রথম যুগে এই খোঁজ ছিল মুখের ভাষার আঙ্গিকে। সে যুগে সাহিত্যের রমরমা, বিজ্ঞানের শৈশব আবার মানব ইতিহাসেরও কৈশোর। সম্বন্ধ-সম্পর্কের চিহ্নগুলো সে যুগে খুব একটা জটিল ছিল না। কাজেই মুখের ভাষায়, আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পর্কের পথ ধরে প্রাথমিক নিয়মগুলোকে খুঁজে নেওয়া মানুষের অসাধ্য বা কঠিন ছিল না। আর এই নিয়মের বর্ণনা করা হতো সুন্দর ব্যঞ্জনাময় কুশলতায়। নানা উপমা উৎপ্রেক্ষা দিয়ে এই সম্বন্ধ-সম্পর্কগুলো প্রকাশ করলেন সে যুগের বিজ্ঞানীরা, তাদের বলা হতো রিলেশনিস্ট স্কুল।

যতদিন যায়, প্রকৃতির রহস্যের জটিলতা তত যেন ধরা পড়ে। জটিল সম্পর্ক-চিহ্ন-কণ্টকিত প্রকৃতির পথ। সে পথের বর্ণনায় মুখের ভাষা দিশেহারা হয়ে যায়। এখানে দরকার হলো অন্য একটি ভাষার, যে ভাষা হবে সংক্ষিপ্ত, আঁটসাঁট—কারণ দীর্ঘ জটিল পথ দ্রুত পার হতে হবে। হতে হবে যুক্তিনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ। কারণ, সম্পর্কের এলোমেলো অগোছাল বহুধা ভঙ্গীদের যাচাই করে, বাছাই করে, ঠিকমত সাজিয়ে নিতে হবে। হতে হবে অর্থবহ ও উদাসীন, তা না হলে প্রকৃতির গভীরতার স্রোতে সে ভাষা থই পাবে না, খেই হারিয়ে ফেলবে। হতে হবে অতিশয়োক্তি ও অতিরঞ্জনমুক্ত—কারণ প্রকৃতির সম্পর্ক চিহ্নের

রোমাঞ্চনার বিহ্বল না হয়ে সম্বন্ধটি সঠিক ভাবে প্রকাশ করা দরকার। পৃথিবীতে এইরকম একটি মাত্র ভাষা মানবসমাজে আছে,—সেই একমদ্বিতীয়ম্ ভাষাটি হলো গণিত। ভাষাটির তারুণ্যের জোয়ার মাত্র ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল। তার আগে গণিত নামক ভাষাটিও মুখের ভাষা আশ্রয় করে গড়ে ওঠা। ষোড়শ শতাব্দীতেই পালক পক্ষীমাতার স্নেহচ্ছায়াটি তুচ্ছ করে, নিজের ভাষার কুহুধ্বনি তুলে সে আকাশে পাড়ি জন্মায়।

এই অকৃতজ্ঞ-বিদ্রোহী ভাষাটি হাতে নিয়ে বিজ্ঞান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। তবে তখনো, সেই ষোড়শ শতাব্দীতে ভাষাটির শক্তি ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তার প্রয়োগের সার্থকতা নিয়ে তখনো সংশয়। ···বিজ্ঞানে গণিতের সার্থক অনুপ্রবেশ ঘটালেন সপ্তদশ শতাব্দীতে—সার আইজাক নিউটন। পূর্বসূরীদের এবং নিজস্ব নানা সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে গণিতের ভাষায় তিনি তত্ত্ব খুঁজে পেলেন। সেই তত্ত্বেই প্রথম জানা গেল ভবিষ্যদ্বক্তি করা যায় আগে থেকে বলা যাবে কখন আসবে জোয়ার বা ভাঁটা, কখন ঘটবে সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ। অর্থাৎ গণিত নামক ভাষাটির সাহায্যে শুধু যে নিয়মটি জানা যায়, তা নয়; সেই নিয়ম নিজেই নতুন তথ্যের ইঙ্গিত জানায় ও জানাতে পারে; যারা আবার প্রমাণিত হয়ে নতুন নিয়মের দ্বারে উপকরণ হয়ে সেজে দাঁড়ায়।

নিউটনের কাল থেকে বিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার। অনেকটা যেন যান্ত্রিক ভাবে গণিতের প্রয়োগ করে সম্পর্ক-সম্বন্ধের লতাবিতানে বিজ্ঞানীরা নানা নিয়মকে প্রতিষ্ঠা করে গেলেন; নিরাসক্ত-উদাসীন রীতিতে নিয়ম খোঁজা। তবু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ম্যাক্সওয়েলের কালে গণিত নিয়ে বিজ্ঞান একটু দ্বিধা সংশয়ে পড়ে। প্রকৃতির সম্পর্ক যে মানুষ খোঁজে সে মানুষ বিজ্ঞানী, সে শিল্পীও। সে নিরাসক্ত-উদাসীন, যখন সে অন্বেষণের পথযাত্রী। তবুও সে সামাজিক মানুষ—যুক্তিনিষ্ঠ হলেও সে অনুভূতিপ্রবণ। সংক্ষিপ্ত আঁটসাঁট গণিতের ভাষা চর্চা করলেও সে যে-কোনো মুহূর্তে মুখর হয়ে উঠতে পারে, পারে কথায় হাসিতে ভেঙে পড়তে। মানুষ নামক প্রকৃতির সৃষ্টিটিই প্রকৃতির নিয়ম খোঁজে। সেখানে তার নিজস্ব স্বাভাবিকতা বাদ দিয়ে সে কি যন্ত্র হয়ে উঠতে পারে?

না, পারে না। সেই প্রাচীনযুগে সারাদিন ধরে সমস্যার সমাধানের চিন্তায়-মাথা-গরম কমাতে স্নানাগারের জলাধারে ঢোকেন আর্কেমিদিস। তখনো তিনি অন্যমনস্ক, চিন্তায় আকুল, সমাধানটি জানতে চাওয়ার উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল। আর হঠাৎ জলাধারের উপছে পড়া জলের দিকে তাকিয়ে তিনি সমাধানের সূত্রটি খুঁজে পান,

সেই সমাধানটি গণিতের ছক হয়ে বিদ্যুতের মত তাঁর মনে প্রতিভাত হয়। আর তারপর বিজ্ঞানী আর্কেমিদিস হঠাৎ মানুষ আর্কেমিদিস হয়ে নিরাবরণ বাইরে বেরিয়ে ছুটে চলেন, মুখে বলেন 'ইউরেকা—আমি পেয়েছি, পেয়েছি।' নিরাসক্ত উদাসীন খোঁজার পথের যাত্রাটি পথের শেষে এসে হঠাৎ আবেগে ভেঙে পড়ে মুখর হয়ে ওঠেন। গণিতের ছকে নিয়ম সাজানোর মুহূর্তে শোনা যায় মুখর সংলাপ।... এমন ঘটনা ঘটে ম্যাক্সওয়েলের জীবনে। গণিতের ভাষায় বিদ্যুৎ-চুম্বক তরঙ্গতত্ত্বটি প্রকাশ করেন আর নিজের সৃষ্টি ইথারের তুলনাহীন রূপ দেখে বিস্মিত হয়ে কলধ্বনি তোলেন। ইথারের বন্দনা-স্তুতি গানে তিনি এবং আরো অনেকে মুখর হয়ে ওঠেন। যেন ভাষা-গণিতের ফুলসাজে সাজা বিজ্ঞানের পায়ে বেজে ওঠে অবহেলিত মুখের ভাষার নূপুরধ্বনি, বাজে কংকনের কিংকিনী!

তবু ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানে গণিতের প্রাধান্য; সেই একই প্রাধান্য দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। জটিল গণিতের মাধ্যমে এলবার্ট আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদ প্রচার করলেন। সেই গণিতের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিজ্ঞানী সমাজ চিত্রার্পিত হয়ে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। মহাকাশ তত্ত্বের গবেষণায় গণিতের প্রাধান্য। একই প্রাধান্য ক্ষুদ্র কণার জগতে, কোয়ান্টাম গতিবিদ্যার গঠনে। গণিতের ধারায় বন্যার ঢল নামে যেন। মুখের ভাষা থেকে বিজ্ঞান শব্দ গ্রহণ করে; এল এটম, প্রোটন, আইসোটপ, মেসন, কোয়ার্ক শব্দ। অন্যদিকে মুখের ভাষার বর্ণনায় গণিতের বাগ্‌ভঙ্গী ধরা পড়ে। দেখা দেয় স্ট্যাটিসটিকস্, ইনভেরিয়েন্ট, কো-ভেরিয়েন্ট ইত্যাদি শব্দ। মুখের ভাষাও গণিতের শব্দসম্ভার গ্রহণ করে ধনী হয়ে ওঠে। তবু বিজ্ঞান, সঠিক অর্থে, গণিত নির্ভর। কেন এই নির্ভরতা?

দুই

গ্রীক চিন্তার পথ অনুসরণ করে চিন্তাবিদ্‌রা যে বিমূর্ত ভাবনায় পা রাখলেন, সেই একই সময়ে, গণিত অনুসরণ করে বিজ্ঞানী-দার্শনিক-গণিতবিদ্ পোআঁকার (Poincare) একই বিমূর্ততার স্থিতিতে এলেন। পোআঁকারের সময়ে বিজ্ঞানের বিশ্বাসের ভিতে ফাটল দেখা দেয়। যুগ যুগ ধরে বিজ্ঞানের সত্যকে চরম ভাবা হয়েছে—তার লজিকে-যুক্তিতে ভুল নেই, ভুল ঘটা মানে নিয়মের ব্যাখ্যায় ভুল পাওয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ধরে নেওয়া হলো, বিজ্ঞানের সব মহাসমস্যার সমাধান পাওয়া গেছে। বাকি যা কাজ, তা শুধু সমাধান ক'টিকে আরো মার্জিত,

আরো মসৃণ করা। ইথারের মাধ্যমে আলোর পথ পরিক্রমার সমস্যা তখনো একটা ছিল। তবে সে যে পরমস্পেস, পরম-সময়, পরমবস্তু এমনকি পরম-প্রসারত্বকে ভেঙে তছনছ করতে পারে, কাচের দোকানে ষাঁড়ের মত সব লণ্ডভণ্ড করতে, তা কল্পনাও করা যায় নি। তবু তা ঘটে এবং ঘটে জ্যামিতিক নিয়মে। পোআঁকার জানেন গণিতে সাদামাটা এসামৃশন নেই; জ্যামিতিতে আছে এক্সিয়ম্, পস্ট্‌লেট, আর জেনারেল নোশন; স্বতঃসিদ্ধ, সিদ্ধান্ত আর সাধারণ ধারণা। এই স্বতঃসিদ্ধের দলকে প্রমাণ করা যায় না। এদের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে থাকে সনাতন বিজ্ঞানের কাঠামো। তবু এই স্বতঃসিদ্ধদের অসম্ভবতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে পাওয়া যায় নতুন জ্যামিতি। পুরনো জ্যামিতির বিরোধ ঘোচাতে আসে অন্য একটি বিরোধাভাস। গণিত অনিশ্চয়তার স্বাদ পায়। অথচ নতুন জ্যামিতির সাহায্যে আইনস্টাইনের তত্ত্ব প্রকাশ পায়। এই গণিতও ভাষা। এও গণিতের সত্য। দুটি ধারার গণিতেই সত্য থাকে। তবে গণিতের সত্য কি?

বিজ্ঞানের ভিত্তি (Foundation of Science) নামে বইটিতে পোআঁকার বললেন, গণিতের সত্য কান্টের জানানো a-priori বিচার নয়। তা যদি হতো, তবে এই সত্য হতো অভিজ্ঞতার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এটিকে মেনে নিলে নব জ্যামিতি, ননইউক্লিডিয়ান জ্যামিতিকে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধদের কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার নিরিখে বর্ণনা করা যায় না। তা যদি হতো, তবে এই স্বতঃসিদ্ধ দলের বারবার পরিবর্তন ঘটতো—জ্যামিতিকেই পাওয়া যেত না। পোআঁকার বললেন, জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধদল যেন কনভেনশন বা রীতি অথবা শর্ত। অভিজ্ঞতার জগতে এদের পাওয়া গেলেও নিজের পরিসীমায় এরা স্বাধীন। শর্তানুযায়ী জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের মধ্যেই আছে তার সংজ্ঞা। এই চিন্তার প্রসার ঘটিয়ে পোআঁকার বললেন, গণিতভিত্তিক বিজ্ঞানের সত্যও নির্দিষ্ট পরিবেশে সত্য; এই সত্য সম্পূর্ণ বা পরম নয়। জানার পথে অনেক তথ্যকে কুড়িয়ে নিতে হবে। তবু কোন্ তথ্যকে কুড়িয়ে নিতে হবে, জোগার করতে হবে অথবা দেখতে হবে? অনেক ফুল চয়ন করে মালি। তবু মালাকার পুষ্পসম্ভার থেকে বেছে নেয় সেই ফুল, যা তার মালায় শোভা পাবে। সব ফুলে মালা গাঁথা যায় না, হয় না। পোআঁকার বললেন, There is a hierarchy of facts: তথ্যেরও ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিভাগ থাকে। যে ফুল যে ঋতুতে সহজলভ্য—সে ফুলই মালায় বেশি দেখা দেয়। যে তথ্য সহজ সরল সাধারণ—সেই বেশি কাজের। যা সব সময়ে হাতের কাছে, কাজের, তাই ভালো; যা অবরে সবরে হাজির হয়, কাজে লাগে, তা অবরে

সবরেই ভাল। যেমন, হাতের কাছে স্পেসিস (Species) না থেকে শুধু যদি একটি প্রাণী বা জন থাকতো, যদি পিতামাতার রূপগুন সন্তানে সঞ্চারিত না হতো, তবে প্রাণীবিজ্ঞানীদের কাজ সহজ হতো না, সরল হতো না। সহজ সরল তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বিজ্ঞানী এই সহজসারল্যকে খুঁজে পেতে চায়। তার খোঁজে বিরাটত্বের পটভূমিতে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের জগতে ; এই খোঁজার পথে নিয়ম পায়। আর সেই নিয়মে মিল টেনে আসা তথ্যগুলো হঠাৎ মনে হয় একঘেয়ে। তখন সে খোঁজে বৈপরীত্যকে। যা সবচেয়ে বিরোধী—সেই তখন আকর্ষণের। তবু আকর্ষণীয় বলেই সেই তথ্যকে বিজ্ঞানী সাজানোর উপকরণে টেনে নেয় না। তার সাজাবার রীতিতে থাকে অনেক অভিজ্ঞতার সংবদ্ধ রূপ, অনেক চিন্তার সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। এই অভিজ্ঞতা, চিন্তা আর উপকরণ হাতের কাছে থাকলেও সবাই সাজাতে পারে না। কেউ কেউ পারে। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। এ কেন হয় ? পোআঁকার মগ্নচৈতন্যের অস্তিত্বের আবির্ভাবের কথা বললেন ; বললেন, এটি হলো Subliminal self—যাকে অন্য পথ অনুসরণ করে অন্য চিন্তাবিদরা পেলেন ; বললেন এটি Preintellectual Awareness বা উপলব্ধি পূর্ববোধ। কান্টিয় দর্শনের অবজেকটিভের বেড়া ভেঙে সাবজেকটিভের চৌকাঠে এই অস্তিত্বের, এই বোধের পা রাখা। গণিত এখানে দাঁড়াতে পারে। পারে বলেই অনেক তথ্যের ভিড়ে সঠিক আলপনার অলংকরণটির আভাস সে এনে দেয়। মানুষের মগ্ন চৈতন্যে গণিতের সৌন্দর্য ভেসে ওঠে। গণিতের গঠনে কারুকৃতে আছে সুষমা, আছে স্বরসঙ্গতি-হার্মনি। আর সব মিলিয়ে সুন্দরতা। সব কিছুর কেন্দ্রে আছে এই সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য রোমান্টিক নয়। এটি ক্লাসিক্যাল—যা প্রতিটি অংশের সঙ্গতি-সাযুজ্যে গড়ে ওঠে ; যা জাগায় রোমাঞ্চ ! একে বাদ দিয়ে জীবন অর্থহীন, তুচ্ছ। এ যেন একজনের স্বপ্ন—যা আবার বহুজনের। এখানে পার্থক্য টানা যায় না। এই হার্মনি বা সুষমার অন্বেষণে বেরিয়ে মানুষ তথ্যকে বেছে নেয়। সম্বন্ধ সম্পর্ক খোঁজে। "...বিজ্ঞানের ভিত্তিতে থাকে সৌন্দর্যবোধ—যা সে গণিতের মাধ্যমে সহজে চিনতে পারে এবং পারে গণিতের সহায়তায় সেই সহজসারল্যের সুন্দরতাকে প্রকাশ করতে।"—বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গণিত থাকে—এ কথাটি জানালেন পোআঁকার ; জানালেন মুখের ভাষায়, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে। গণিতের সৌন্দর্য মুখের ভাষায় প্রকাশ পেল। একটি ভাষার মোহময় বর্ণনা হলো অন্য আরেকটি ভাষায়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে গণিত পা রাখতে পারে—পোআঁকারের এই কথায় প্রতিধ্বনি তুললেন উলফগাঙ পাউলি এবং লাইনাস পাউলিং। আজকের

বিজ্ঞানের প্রমাণে যে জটিলতা পরোক্ষতা—সে যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুজগতের বাইরে অনুভূতির শিহরণ। যেন গণিত নামক ভাষাটি মানুষের তৈরি মানুষেরই মত; On his Image! এটি একটি স্নায়ব শরীরী ভাষা। বিজ্ঞানের প্রকাশে এটির প্রবেশাধিকারকে রোখা যায় না।

এলবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞানের এই সহজিয়া সৌন্দর্যবোধের অন্বেষণের কথা বললেন। 'একটি তথ্যে গৃহীত সূত্র যত সহজ ও সরল হবে, যত সে বিচিত্রগামী হবে, বিস্তৃত হবে, তথ্যটি ততই আকর্ষণের।' 'আমাদের চিন্তা শব্দ ঘিরে শুধু যে গড়ে ওঠে তা তো নয়; শব্দের আওতা এড়িয়ে অবচেতনার সাম্রাজ্যে তার নিঃশব্দ পদচারণে যে ঘটে—সেখানে সন্দেহ কোথায়? তা নইলে কোনো ঘটনার অভিজ্ঞতায় হঠাৎ আমরা বিস্মিত হই কেন? আমাদের চেনাজানা, অভিজ্ঞতায় গড়া বিশ্বস্ত জগতের বিরোধী ঘটনায় আমরা অবাক হই। এই বিরোধ আমাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন তোলে।' বিস্ময়বোধের ঝরণাধারায় অভিষিক্ত হয় আমাদের চিন্তাজগৎ। মনের কোণে গুণগুন করে তখন সুর জেগে ওঠে—বড় বিস্ময় লাগে। এই বিস্ময়, এই রসানুভূতি—এ কি গণিতে সেজে দাঁড়ায়? এই প্রশ্ন এলবার্ট আইনস্টাইনের। জ্যামিতি ও অভিজ্ঞতা (Geometry & Experience) নামের প্রবন্ধে তিনি বলতেন, 'গণিত, যা মানুষের চিন্তার একটি ফসল, যাকে অভিজ্ঞতার আওতায় বাঁধা যায় না—এই বাস্তব বস্তুজগতের ব্যাখ্যায় সে কেন এত বিশিষ্ট? অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে কেবল চিন্তার পথে গড়ে তোলা মানুষের যুক্তিবোধ বাস্তব জাগতিক বস্তুর গুণাগুন বিচার করতে কি সক্ষম? আমার মতে এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো বাস্তবের বর্ণনায় যে গাণিতিক প্রতিজ্ঞা বা Proposition-এর প্রয়োগ হয়—সেটিকে 'নিশ্চয়' বলা যায় না। আর যখন এটি নিশ্চিত তখন বাস্তবের বর্ণনা সঠিক নয়।' গণিতের এই অনিশ্চয় পদক্ষেপ, তার সীমাবদ্ধতার কথা জানালেন আইনস্টাইন। জানালেন মুখের ভাষায়। ...তবু অনিশ্চয়তার বিস্ময়েঘেরা গণিত নামক ভাষাটি সম্ভাবনা অনিশ্চয়তায় বেড়ায় বাঁধা আজকের বিজ্ঞান জগৎকে প্রকাশ করতে পারে। অন্য কোন ভাষার সেই ক্ষমতা যে নেই!

অন্যদিকে গণিতে পাওয়া নিয়মগুলির বর্ণনা মুখের ভাষায় দিতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা দেখেন গণিতের প্রতীক রূপটির ব্যাখ্যা মুখের ভাষায় সব সময়ে দেওয়া যায় না। কারণ শব্দার্থের পূর্বস্মৃতি অথবা অর্থের সংকীর্ণতা। যেমন ক্রিয়েশন ও এনিহিলেশন শব্দ দুটি, যার প্রচলিত অর্থ হলো সৃষ্টি ও লয়। গণিতের ভাষায় জানা গেল, এরা জানায় রূপান্তরিত অবস্থা। এই সৃষ্টি ও লয় চিরপ্রবহমান। যা ধরা পড়ে, তা শুধু রূপান্তরিত অবস্থা। অথবা ইলেকট্রন, ফোটন ইত্যাদির আচার-ব্যবহার। এরা কণা, এরা তরঙ্গ; হয়তো বা কণাতরঙ্গ—যার সঠিক ধারণা গণিতের ছকে জানা যায়; অথচ মুখের ভাষায় নিশ্চিন্তে প্রকাশ করা যায় না; খানিকটা অস্পষ্টতা থেকে যায়। অথবা ধরা যাক Inert (ইনার্ট) শব্দটি। এর প্রাচীনতম অর্থ ছিল অদক্ষ। অদক্ষ বলেই অকাজের, অলস। নিউটনের কালে ইনার্টের অর্থ হলো অলস, জড় এবং ইনারশিয়ার ভাষান্তর জাড্য। আবার আর্গন, নিওন ইত্যাদি মৌল গ্যাস, যাদের বলা হলো ইনার্ট অথবা অলস, তারা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। সুতরাং ইনার্ট হলো নিষ্ক্রিয়। আরো পরে জানা যায় এই সব গ্যাসের এটমের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনরা সহজে নড়তে-চড়তে চায় না বলেই কাজে-কারবারে নামে না। গ্যাসটি নিষ্ক্রিয়, কারণ এদের ইলেকট্রনরা নিষ্ক্রিয়। আরো পরে জানা যায়, এই ইলেকট্রনদের কাজে নামানো যায়, দরকার শুধু এদের কাজে নামানোর জন্য প্রবল ঠেলাঠেলির শক্তি। এই গ্যাসরাও, অতএব ক্রিয়াকলাপে নামতে পারে; এদের ইলেকট্রনরা আক্ষরিক অর্থে Immovable বা অচল নয়। এরা Nonmovable বা নিশ্চল। অতএব ইনার্ট শব্দের আভিধানিক অর্থের বিস্তৃতি ঘটে, অদক্ষ অলস, জড়, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চল। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পথে গড়ে তোলা গণিতের সংজ্ঞা ধরে অর্থের বিস্তৃতি ঘটানো হচ্ছে। গণিতের শব্দাংশের অনুবাদ করা হচ্ছে মুখের ভাষায়। শব্দের পূর্বস্মৃতিকে সরিয়ে নতুন অর্থ হাজির হয় অভিধানে। বড় দ্রুত এই অর্থের পরিবর্তন। অন্যদিকে মুখের ভাষায় শব্দের অর্থ পরিবর্তন ঘটে সাধারণত ঢিমে তালে। কালিদাসের কালে একরাট্‌ শব্দের অর্থ ছিল বৃহৎ সাম্রাজ্য—যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পেল One world—এক পৃথিবীর রূপ। হাজার বছর লাগল সাম্রাজ্যকে পৃথিবীর রূপ পেতে। অন্যত্র দেখা যায় বৈদিক রোদসী শব্দের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন ক্রন্দসী—মানে আকাশ যা রোদসীরও অর্থ। তবু অতুলপ্রসাদ যখন লেখেন ক্রন্দসী পথচারিণী—তখন আকাশের বদলে একটি দুঃখ ভারাক্রান্ত ক্রন্দনমুখী নারীর ছবি ধরা পড়ে। মুখের ভাষায় অর্থের স্থিতি নেই। অথচ গণিতে অর্থের নির্দেশনা থাকে, থাকে নিত্যতা।

আরো একটি সংশয় দেখা দেয়। শিল্পীর মনে তাঁর শিল্পকর্মটির একটি ভ্রূণরূপ ধরা পড়ে। এটিকে শরীরী রূপ দেবার যন্ত্রণা শিল্পীর। প্রকাশের বেদনাটিও তাঁর। নিজের উপলব্ধিটিকে কবি প্রকাশ করেন ভাষায়, চিত্রী করেন রঙ তুলিতে; মূর্তিকার মাটি পাথরে অথবা ধাতুর ছাপে। প্রকাশের ভঙ্গী ভিন্ন, আঙ্গিকও ভিন্ন। তবু এই সব প্রকাশিত শিল্প-কর্মগুলির দিকে তাকিয়ে সমজদাররা বিস্ময়ে আনন্দে মুখর হয়ে ওঠেন, নন্দিত ভাষায় ব্যাখ্যা জানান; সেই ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি পেয়ে আরো অনেকে শিল্পকর্মটির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হতে পারে। বিজ্ঞানেও তাই ঘটে। কি হতে পারে, কি ঘটছে সব হয়তো জানা যায় না, বোঝানোও যায় না। বিজ্ঞানী তাঁর শিল্পকর্মটি প্রকাশ করছেন গণিতের ছকে। সেই কর্মটির ব্যাখ্যা বা বর্ণনাটি মুখের ভাষায় করা যে দরকার।

তত্ত্ব গঠন করতে নিউটন গণিতের যে শাখাটি ব্যবহার করলেন, সেটি তাঁর নিজের সৃষ্টি কেলকুলাস। ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ-চুম্বক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে দ্বারস্থ হলেন গাউসের হাতে সাজানো ভেক্টর গণিতের কাছে। আপেক্ষিকতাবাদ সৃষ্টি করতে আইনস্টাইন তুলে নিলেন রীমানের জ্যামিতিভিত্তিক ক্রিস্টোফেলের টেনসর। এটিকে তিনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নিজের চিন্তাটি প্রকাশ করতে প্রয়োগ করলেন। অনিশ্চয়তা তত্ত্ব গঠনের কালে হাইসেনবার্গ একটি গণিতের ছক পেলেন; —ডিরাক তাঁকে জানান, গণিতের এই ছক নতুন নয়, এটি হেমিলটনের চিন্তায় পাওয়া ম্যাট্রিক্স এলজেব্রা। গণিতের এই শাখাটি ব্যবহার করে অন্য বিজ্ঞানীরাও তাদের ব্যঞ্জনাটি খুঁজে পান। ডিরাক ও রোজার পেনরোজ তাঁদের তত্ত্বের গঠনের জন্য গণিতের দুটি নতুন রূপের কথা ভাবেন, স্পিনোর ও টুইস্টোর। কণা পদার্থ বিভাগে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে হুিগনার গণিতের গ্রুপ থিয়োরীটির ব্যবহারের কথা চিন্তা করেন এবং বিজ্ঞানের হাতে সৃষ্টি হলো গ্রুপ থিয়োরীর সহযোগী লাইএলজেব্রা। অন্যদিকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে, বিজ্ঞানের ফলিত শাখায়, কম্পুটার ইলেকট্রনিক বিভাগে গণিতের আরো একটি শাখার প্রয়োগ হলো, বুলিয়ান এলজেব্রা। যেমন ভাষার সৃষ্টিতে নিজের চিন্তার নির্মিতিরূপ দিতে কেউ আশ্রয় নেন কবিতার, কেউ প্রবন্ধের, গল্প বা উপন্যাসের, সেখানে শৈলী আলাদা, ভঙ্গী আলাদা শব্দ ও বাক্যগঠন আলাদা; কেউ সৃষ্টি করেন নতুন শাখা, কেউ পুরনো ধারার মার্জনা করেন, কেউবা করেন পরিবর্ধন;—বিজ্ঞানেও সেই এক রীতি ধরা পড়ে। ভাষা-গণিতের আবির্ভাব অথবা সৃষ্টি, পরিমার্জনা অথবা পরিবর্ধন, প্রয়োগ অথবা সংযোগ, বিজ্ঞানীদের হাতে। তাঁরাই এই ভাষার রূপকার।

এই ভাষাটি কেন এত আদরের? চিন্তাবিদ্‌রা যুক্তিশৃঙ্খলের ধারায় সম্বন্ধ সম্পর্কের কার্যকারণ খুঁজতে গিয়ে কতগুলো পদ্ধতির কথা ভাবেন—যেমন colligating, coalescence—যা একাঙ্গীকরণের সুষমাটি জানায়। গণিতের ধারায় নানা উপকরণের সম্বন্ধ-সম্পর্কের জের টেনে একাঙ্গীকরণ অথবা একত্রে আবদ্ধকরণ সম্ভব। অতি দ্রুত সাজিয়ে-গুছিয়ে ডালা ভরা যায়,—আর এই একাঙ্গীকরণের রূপসজ্জায় যে অপরূপটি ধরা পড়ে, সে একটি বিশেষ প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। যেন কুমোরের হাতে মূর্তি গড়া। খড়, কাঠি, মাটি, রঙ এর একাঙ্গীকরণে যে রূপ সে সাজিয়ে তোলে—তা হতে পারে শিব অথবা সরস্বতী বা অন্য কিছু। কারুকৃতির পথে যা পাওয়া যায়, গণিতের ভাষায় সেই একই পদ্ধতি ধরা পড়ে। তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়ার পথে বিজ্ঞানীদের তাই গণিতের দ্বারস্থ হওয়া।

তবু মূর্তি গড়ার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে ভাবনা। মূর্তি গড়ার পর থাকে মূর্তির ব্যঞ্জনাময় বর্ণনা। দুটি সীমার মাঝে থাকে উপকরণ নিয়ে শৈল্পিক গঠন। অথবা যেমন হনুমানের সাগরপাড়ি। লাফ দেবার আগে হনুমান খুঁজে নেয় উপযুক্ত স্থান—যেখান থেকে সে লাফ দিতে পারে। শরীরকে বিস্তৃত সে করে, আর ক্ষমতার জন্য পবনদেবের সাহায্য চায়। সাগর লাফের কালে ছোটখাট বিপদ দেখা যায়। —তবু প্রস্তুতি আর শক্তি দুটিই সঠিক হওয়ায় সে সাগর পার হতে পারে। লাফের আগে সে জানে, যেখানে সে পৌঁছুবে সেখানে হয়তো সীতাদেবীর দেখা পাবে। লাফের শেষে যা 'সে যা' দেখে, তা' সীতা কিনা' সে সন্দেহ থেকে যায়। তবু সে সংশয়হীন হয়ে সীতার দেখা পায়। এই যে অন্বেষণ, এ যেন বিজ্ঞানের যাত্রাপথ। তথ্য আর উপকরণ নিয়ে বিজ্ঞানীর প্রস্তুতি। তথ্য সাজাবার কালে সে মূর্তিকারের মত মডেলের কথা ভাবে। নিউটন ভাবেন লাট্টুর কথা, শূন্য নাগরদোলার কথা; গাউস ভাবেন নদীর জলে ভাসা মালাটির কথা; ওজনহীনতা বুঝতে চেয়ে আইনস্টাইন ভাবেন লিফট আর তার ভেতরের মানুষটি; নিয়েল বোর দেখেন এটমের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনের এক্কা দোক্কা খেলা; আর দ্রবলী দেখেন হার্প নামক তার-যন্ত্র। এই যে মডেল, এরা আমাদের অভিজ্ঞতার জগতে পাওয়া, যারা ঘরের জিনিস, যারা পরিচয়ের, যাদের আচার-ব্যবহার মুখের ভাষায় দেওয়া যায়। এখানে গণিতের প্রয়োজন নেই। তবু এই মডেল না থাকলে সাজানোর রীতিটি সহজ লভ্য নয়। এই প্রস্তুতিপর্বে মুখের ভাষায় কলরোল থাকে। আবার সাজাবার পর যে মূর্তিটি পাওয়া যায়—সেটি কে, সেটি কী সে ব্যাখ্যা গণিতে নেই। এখানেও এটিকে সঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে, বর্ণনা করতে লাগে

মুখের ভাষা। বিজ্ঞানের যাত্রাপথে গণিতের পদরেখার শেষ ও শুরুর সীমান্তে থাকে মুখের ভাষার মুখরতা—গণিত নামক ভাষাটি বিচিত্রগামী হলেও সর্বত্রগামী নয়। ভাষাটি উদাসীন নিরপেক্ষ হলেও সে স্বাধীন নয়। মানুষের মত হয়েও স্নায়ুবশরীরী ভাষাটির চালচলন মানুষেরই হাতধরা! মুখের ভাষায় শিল্পকর্ম করার মত এটিও ব্যক্তিনির্ভর।

চার

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের চিন্তায় আইনস্টাইন একটি নতুন ধারা আনলেন। তথ্য থেকে তত্ত্ব গড়া—এই ছিল সনাতন বিজ্ঞানের রীতি। বিজ্ঞানের গবেষণায় তাই তথ্য সংগ্রহের এত প্রাবল্য। এবং থাকে পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের স্বীকৃতি। এমন কি নোবেল পুরস্কারের ঘোষণাপত্রে এই স্বীকৃতির ঘোষণা দেখা যায়—পুরস্কার পাবার যোগ্যতা শুধু আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের—ডিসকভারারদের—যাঁদের আবিষ্কারের ফলিত রূপ মানবসেবায় লাগবে। বিজ্ঞানের সব তত্ত্ব কি তাই? তাদের অনেকে হয়তো বা জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়ে তোলে। তবু মানব সেবায় তারা কি ব্যবহৃত হতে পারে? এই প্রশ্ন থাকে। অথচ বিজ্ঞানীরা প্রকৃতির নিয়ম খুঁজতে বিরত হন না। কারণ, সেই নিয়ম তাঁদের সত্যের কাছে নিয়ে যায়।

1905 খ্রীস্টাব্দে আইনস্টাইন চারটি পেপার প্রকাশ করলেন, যাদের তিনটি একটি আশ্চর্য ধারা প্রকাশ করে। সামান্য কিছু সীমাবদ্ধ তথ্যকে মেনে নিয়ে ইনট্যুশনের সাহায্যে, উপলব্ধির পথে তিনি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রতিষ্ঠা নয়, বরং বলা হোক, ঘোষণা করলেন। পরীক্ষা-গবেষণার পথ এড়িয়ে কাগজ-পেন্সিলে তিনি তত্ত্বকে খুঁজে পান। আর সেই তত্ত্বের তথ্যভিত্তিক প্রমাণ পাওয়া যায় পরীক্ষক বিজ্ঞানীদের হাতে, অনেক পরে। তাঁরাই তখনো না-পাওয়া, না-জানা তথ্য শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতাটিকে প্রতিষ্ঠা করেন; যে ফাঁক-ফোকরগুলো আইনস্টাইন উপলব্ধি দিয়ে ভরাট করেছিলেন, তাদের বাস্তবে উপস্থিতি দেখা যায়। পরীক্ষা-তথ্য-চিন্তা-তত্ত্ব এই সাবেকি সনাতনী বিজ্ঞানের রীতিটিকে পালটে আইনস্টাইন এক নতুন শৃঙ্খলের ধারণা আনলেন: প্রাথমিক তথ্য-উপলব্ধি-চিন্তা-উপপত্তি-পরীক্ষা-তথ্য-তত্ত্ব। আইনস্টাইনের প্রাকতত্ত্ব-উপপত্তির সৃষ্টিতে আছে যুক্তি ও কল্পনা; যে যুক্তি ও কল্পনা হলো গণিতের প্রয়োগে গড়া অনিরুদ্ধ-ঊষার স্বপ্ন কাহিনী—যা তথ্যভিত্তিক বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠার পূর্বরাগ এবং

হয়তো বা উপলব্ধির পথে ভেসে আসা স্বপ্নস্বরূপ চৈতন্য। তবু এই উপলব্ধিকে, স্বপ্নস্বরূপ চৈতন্যটিকে বর্ণনা করতে হয়; ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করতে হয়; সেই প্রকাশের ভাষা—প্রাক্-বিজ্ঞান ভাষা। গণিত নয়, মুখের ভাষা। পোআঁকার জানিয়েছেন, উপলব্ধির দ্বারদেশে গণিত এলেও, তার প্রবেশাধিকার ঘটে নি। অন্যদিকে দৈনন্দিন প্রাত্যহিক আটপৌরে মুখের ভাষা এই উপলব্ধিকে সঠিকভাবে প্রকাশ করতে কি পারে?

একটি প্রবন্ধে এই সঙ্কটের কথা আইনস্টাইন বললেন: 'অভিজ্ঞতার জগতের কোন ধ্যানধারণার অংশটুকু আমাদের প্রাক্-বিজ্ঞান উপলব্ধিকে গঠন করতে সাহায্য করে, তা আমরা জানি না। আরো দেখি, পুরনো কালের প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণার চশমার মধ্য দিয়ে দেখা ছাড়া অভিজ্ঞতার জগৎটিকে এমন কি নিজের কাছেও প্রকাশ করা যেন দুঃসাধ্য। আরেক সমস্যা হলো, যে ভাষায় তা প্রকাশ করতে বাধ্য হচ্ছি, সেটি ঐ পুরনো ধ্যানধারণার ভিত্তিমূলে যেন অবিচ্ছেদ্য ভাবে গাঁথা। স্পেসের তত্ত্ব গঠনে প্রাক্‌বিজ্ঞান-উপলব্ধির বিশেষত্ব যখনই বর্ণনা করার চেষ্টা করছি, তখনই এসব বাধা দুর্বার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' —প্রচলিত ভাষার কাঠামোতে প্রাক্‌বিজ্ঞান-উপলব্ধিটিকে প্রকাশ করা কঠিন। এখানে যে মডেলের কাছে হাতপাতা হয়, সে হয়তো বাস্তবে সম্পূর্ণ নেই! এটি যেন অর্ধেক বাস্তব—অর্ধেক কল্পনার মিশ্রণ। সেই উপলব্ধির সাহায্যে নরসিংহী মডেলের সহায়তায় গণিতের রূপরেখায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব গঠন করা হয়তো সম্ভব; আবার অসম্ভব সেই তত্ত্বের সত্যটিকে মুখের ভাষায় প্রকাশনে। কারণ এই তত্ত্ব চেনাজানা নিউটনের জগৎ নিয়ে গড়ে ওঠে নি। পরিদৃশ্যমান জগতের সীমার বাইরে এই তত্ত্বের পা রাখা। সেখানে থাকে মহাবস্তু বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা।...আধুনিক বিজ্ঞানের সংকট এইখানে।

নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করে বিজ্ঞানীরা তথ্য জোগাড় করেন। সেই তথ্য নিয়ে অন্য একদল বিজ্ঞানীর চিন্তা ভাবনা। কী জানা যাবে তথ্যগুলি থেকে? কেমন করে জানা যাবে নানা তথ্যের সম্পর্কটি? পরীক্ষায় যে ফল পাওয়া যায়, সেই শেষ নির্দেশনার আগে থাকে প্রস্তুতি, থাকে শুরু থেকে শেষে যাবার প্রবাহ। পরীক্ষায় পাওয়া তথ্য সে প্রবাহকে কি জানতে পারে? তবে কেমন করে থিয়োরী বা তত্ত্বের আঙিনায় বিজ্ঞানীরা আসেন?—এই প্রশ্নগুলি চিহ্নিত করে 1926 খ্রীস্টাব্দে হাইসেনবার্গকে আইনস্টাইন বললেন, 'লেবরেটারিতে যা দেখা যায়, সেটি জানায় একটি ঘটনা, একটি ফেনোমেনা। আর তার থেকে যুক্তিসম্মত বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা গড়ে তোলা হয়। এটমের অন্দরমহলে কিছু একটা ঘটেছে; আলো বেরিয়ে আসে,

তার আঘাতের চিহ্ন ফোটোগ্রাফ প্লেটে ধরা পড়ে; আমরা সেই পড়ে থাকা চিহ্ন দেখি। এসবই ঘটছে! এই পরিদৃশ্যমান ঘটনার জগতে এটমের লীলাখেলা আর তোমার চোখ ও বোধির সমন্বয়ের চৈতন্য; তুমি ভাব,— ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের রীতিতে সব বুঝি বোঝা যায়; সবকিছু বুঝি ঘটে! এবার তথ্য সাজানোর দৃষ্টিকোণটা যদি পালটাও, অথবা যদি পালটাও ঘটনার প্রবাহশৃঙ্খল, তবে তখনো দেখবে, নতুন ভাবে যা চোখে ধরা পড়েছে, সেই ঘটনাও যেন সুন্দর শ্রীছাঁদে দাঁড়ায়।'—দেখার নির্দেশনাগুলো চেতনার স্পর্শে অন্যরূপ পেতে পারে। মালাকারের হাতে মালির চয়ন করা ফুল নতুন সাজে সাজতে পারে। যাকে ভাবা যায় কণা, ভিন্ন চোখের আলোয় সে তরঙ্গের ঢেউ তুলতে পারে। এই যে 'দেখা'-এ যেন কবির চোখে দেখা—যেখানে চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়ে ধরা পড়ে। —তবু সেই 'দেখা'ও যে বাস্তব।

দেখার জগতের দৃশ্যগুলিকে বুঝতে চেয়ে চিন্তার দ্বারে, কল্পনার দ্বারে বিজ্ঞানীদের বারবার ফিরে ফিরে তাকানো; পরীক্ষায় পথের শেষটুকু দেখা যায়; অথবা শেষের ইঙ্গিতটুকু ধরা পড়ে। কী আছে পথের মাঝখানে অথবা পথের শুরুতে? সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে আলো-তাপ নেমে আসে। সূর্যের বুকে কী ঘটেছে যা তাকে জালিয়ে রাখে? কী সেই যন্ত্রণা অথবা কী সেই আনন্দ?—কেন এই খোঁজা? কেন খোঁজার যন্ত্রণাকে মেনে নেওয়া?

পাঁচ

আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার বেশির ভাগ শরীরের প্রয়োজন আর বিলাসের দাবী মেটাবার কৌশল। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে শক্তি, যে বুদ্ধি কাজ করে তার জটিলতা বিস্ময়কর। একই দাবীর তাগিদে হাঁসের দল যাযাবর হয়ে পাড়ি দেয়, গুটিপোকা তাঁত বোনে, কাকের বাসার সামনে কোকিল কুহুধ্বনি তোলে। তবু প্রয়োজনভিত্তিক চাহিদা মেটাতে সভ্যতা নিঃশেষ হয় না। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাবের ক্ষণটি আজও অজ্ঞাত। তার চেয়েও গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। এই মন—Subliminal self অথবা Preintellectual awareness —এরও বাইরে রাখি; প্রাণের রক্ষা আর পুষ্টিতে বারমহলে তার ছোট তরফের ক্রিয়াকলাপ। এই ক্রিয়া যত ব্যাপক, যত জটিল তত সে বিচিত্র। মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা করে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। তবু

প্রাণের কাজে বায় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বললেন, 'মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এই সৃষ্টি অলৌকিক।'···শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্টি তাকেও সমান স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই।—কথাগুলি অতুল গুপ্ত মহাশয় সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকায় বললেন। আধুনিক বিজ্ঞানে যে সৃষ্টি-রহস্যমত্ততা দেখা দেয়, এ যেন সভ্যতার প্রয়োজনিক রূপটিকে মেলে ধরছে না। এটি যেন সেই অবশেষ মনের খেলা বা লীলা।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বা কাব্য বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক কিছু আছে যেখানে সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। গোটা মেঘদূত কাব্য ঘেঁটে 'যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামাঃ—পঙক্তিটি পেয়ে গোঁড়া কট্টর সমাজবাদী নিশ্চিন্ত হতে পারেন। তবু মেঘদূত মেঘের কথা জানালেও চাষের কাজে লাগে না। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কিছুই ফলিত রূপ পেতে পারে নি। তবু মহাবিশ্বে বা কণাজগতে তত্ত্বতালাশ চলে। কারণ মানুষ সত্যকে জানতে চায়। আর এই জানতে চাওয়া আকাঙ্ক্ষাটিও ঐ অবশেষ মনের।

আইনস্টাইনের তত্ত্ব মানুষকে সামান্যতা দিয়েছে। এই বিশাল মহাবিশ্বের একটি সামান্য তারকার একটি ছোট্ট গ্রহের নাম পৃথিবী—যেখানে কয়েকটি বিশেষ শর্তে, পরিবেশে প্রাণের আবির্ভাব। পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় এই আবির্ভাব কাহিনী লেখা আছে। আবার অন্য কয়েকটি শর্তে মানুষ দেখা দেয়;—এই আবির্ভাব সৃষ্টির তুঙ্গমুখে ঘটে নি; এই আবির্ভাব ঘটে প্রাকৃতিক পরিবেশের আন্তক্রিয়ায়। হয়তো অন্য কোনো এক পরিবেশে, শর্তে বা অন্তক্রিয়ায় মানুষ লোপ পাবে, সৃষ্টি ধ্বংস হবে। বিশাল মহাবিশ্বের মহাকালের কাছে এই প্রাণের আবির্ভাব তুচ্ছ; প্রাণের ধ্বংসও নগণ্য। তবু মানুষ প্রশ্ন তোলে, খোঁজে, স্বপ্ন দেখে। মানুষের জীবন যেন তাঁতের টানাপোড়েনে গড়ে তোলা বিচিত্র এক নকশা। যে নকশা সে নিজের আনন্দে বোনে অথবা বুনতে বাধ্য হয়। এই নকশার প্রয়োজন নেই, তবু সব কিছু সে আনন্দের জন্য করে থাকে। জীবনের নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, সহজ বা জটিল, ভয়ঙ্কর অথবা সুন্দর নকশা মানুষ গড়ে চলে। নকশার রঙ তুলি কখনো সে বাছাই করে, কখনো সে পারে না। এই সৃষ্টিপ্রবাহ যেন এক

নদী—যার উৎস জানা নেই, জানা নেই মোহনা। তবু মানুষের কাছে এ চির-প্রবহমান। মানুষের তুচ্ছতা মানুষকে শূন্যতার বোধ এনে দেয়। তবু সেই শূন্যতার মুষ্টি থেকে মানুষ সৃষ্টির গোপন রহস্যটি জানার চেষ্টা করে। এই জিজ্ঞাসা, এই প্রয়াস তার নকশাটি পরিপূর্ণ-অলংকৃত করে তোলে।

সাধারণ মানুষের জীবনের নকশা সরল, সহজ। সামান্য কজন জটিল সূক্ষ্ম নকশার কারিগর। সেই নকশার নকল সকলে করতে পারে না। কারণ এর জটিলতা। এখানে প্রয়োজন 'দেখার' ও 'বোঝার' পালটানো ভঙ্গীর, পুরনো ধ্যানধারণার অবলুপ্তির। মানুষের ইতিহাসে বারবার এই পরিবর্তন এসেছে। আর বিংশ শতাব্দী আনে নববিজ্ঞানের নকশা—দৃষ্টিভঙ্গী ও ধ্যানধারণার পরিবর্তন যেখানে প্রবল ও সার্বিক!

কি ঘটেছে তার শেষ নির্দেশটুকু লেবরেটারির পরীক্ষায় নিরীক্ষায় ধরা পড়ে;—তবু সম্পূর্ণ ঘটনা প্রবাহ বা ঘটনা শৃঙ্খল জানা যায় না। সেই জানার যন্ত্রণায় বিদ্ধ বিজ্ঞানীরা কল্পনায়, উপলব্ধিতে পথের ছবি আঁকেন—সে ছবি প্রকাশের ভাষায় থাকে গণিত; অন্ততঃ বর্তমানে। গণিতের শব্দসম্ভার-পদ্ধতি দিয়ে ঘটনার শূন্যতা-টুকু ভরাট করে বিজ্ঞানীরা নিটোল-সুস্পষ্ট-অর্থবহ ছবিটি সৃষ্টি করেন। কল্পনা-চেতনা-বোধি ও ভাষাগণিতের টানেটোনে-রঙে, পরীক্ষায়-দেখা তথ্যটির একটি সুসামঞ্জস্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবু সেই ব্যাখ্যাটিকে পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করা কি যায়? হাইসেনবার্গকে একদা নিয়েল বোর বললেন, 'এটম সম্পর্কে আমরা ব্যাখ্যা দিতে চাই। আর সেই ব্যাখ্যার জন্য দ্বারস্থ হচ্ছি পুরনো স্মৃতি, পুরনো শব্দের কাছে। এ যে কি এক সমস্যা! আমরা যেন দূরপ্রবাসে হঠাৎ আসা একদল নাবিক, যারা সেই দেশটি চেনে না, জানে না সেই দেশের ভাষা। অতএব এখানে মতবিনিময় ঘটে না; কথোপকথন হয় না।·· ক্লাসিক্যাল ধ্যানধারণার উপর ভিত্তি করে শুধু শব্দে-বাক্যে আমরা ইলেকট্রনের গতি-শক্তি-ধর্ম ইত্যাদির কথা জানাতে হয়তো পারি;—শব্দ দিয়ে আঁকা সেই ছবি নিশ্চয় শুদ্ধ—অন্তত আমি তো তা মনে করি। তবু সেই ভাষা আমাদের চিন্তা কতটা পরিপূর্ণ করে প্রকাশ করতে পারে!'

নিজেকে সবার জন্য বিস্তৃত করতে চায় বিজ্ঞান। তার সত্য—সে সকলেরই জন্য; সাধনার ফলটুকুও সর্বসাধারণের। বিজ্ঞানের সত্য ও সাধনাকে জনমানসের কাছে নিয়ে যেতে চান বিজ্ঞানীরা। গণিতকে এড়িয়ে মুখের ভাষায় এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হয় এবং ভবিষ্যতেও হবে। সেদিনের তথ্যের রীতিনীতির ব্যাখ্যা সহজেই দিতে পেরেছিলেন রিলেশনিস্ট স্কুল। কিন্তু যত জটিল তথ্য জানা যায়,—

মহাকাশের বিশাল পটভূমিকায় অথবা এটমের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংসারে যে ঘটনা ঘটে, —তাদের সম্পর্কবোধের জটিল গাণিতিক ছকের বর্ণনাটি মুখের ভাষায় খণ্ডিত হয়ে ধরা পড়ে। ভাষায় জানানো বিজ্ঞানের সত্য ও যাত্রাপথটি অপূর্ণ, খণ্ডিত এবং হয়তো কলঙ্কিত। জানাবার আগ্রহ বিজ্ঞানীদের, জানার আগ্রহ জনসাধারণের। তবু দু' পারের মাঝে থাকে দুর্বার-দুস্তর ভাষার বেড়া। কথোপকথন হয় না; মত বিনিময় ঘটে না! বোর দেখলেন না-বলার বাণীর ঘনযামিনীর মাঝে নব বিজ্ঞান বন্দী! এই অন্ধকার গাঢ়-ঘন; এই নৈশব্দ্য দম বন্ধকরা, দুর্বিষহ!··· নোবেল পুরস্কার বক্তৃতাতে, বোর বললেন, এটমের অভ্যন্তরে ইলেকট্রনদের স্থিতাবস্থার স্থির শক্তিটিকে 'কোয়ান্টার ধারণা জানাতে পারে, রাসায়নিক আর পদার্থবিদ্যা ভিত্তিক গুণধর্মের ব্যাখ্যা দিতে পারে, পারে মেণ্ডেলীভের পর্যায় সারণীর সাজার কারণটি জানাতে। এই যে ব্যাখ্যা, যা মেটারের গুণধর্ম জানাতে পারে, এটি যেন বাস্তবরূপ নিয়ে আসে। ···অতীতে পিথাগোরানরা স্বপ্ন দেখতেন যে, প্রাকৃতিক নিয়মদের শুদ্ধ সংখ্যার ভিত্তিতে জানা যাবে। আর এই যে মেটারকে কোয়ান্টাম জগতে জানার স্বপ্ন—এ যেন আরো মধুর, আরো সুন্দর।'

এই স্বপ্নটিকে জনমানসের কাছে বর্ণনা করার আকাঙ্ক্ষা জাগে; মুখের ভাষায় মুখর করে তুলতে আগ্রহ হয়। কোন ভাষায় সেই বর্ণনা দেওয়া যায়? হাইসেন-বার্গকে বোর বললেন, 'বুঝলে আধুনিক গণিতের ছকে এটম ইত্যাদির যে আচার-ব্যবহার পাওয়া যায়, তাদের বর্ণনা ব্যাখ্যা করতে হলে যে ভাষা ব্যবহার করতে হবে, সেটি কবির ভাষা। কবিরা তাঁদের চিত্রকল্প সৃষ্টি করতে তথ্যের কথ্যরূপ নিয়ে যত ভাবেন, এখানে সেই ভাবনা আরে বেশি।'

সঙ্গীতের শ্রুতিমধুর রূপ মুখের ভাষায় সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। শিল্পভাস্কর্যের দৃষ্টিনন্দন ভঙ্গী মুখের ভাষা প্রকাশ করতে অক্ষম। যা প্রকাশ পায়, তা অনুবাদ নয়; অনুসৃজন। একদা আইনস্টাইনকে প্রশ্ন করা হলো, সব চিন্তাকে শেষ-মেশ বৈজ্ঞানিক রীতিতে কি প্রকাশ করা যায়? —আইনস্টাইন বললেন, 'এটি হয়তো সম্ভব, তবে অর্থহীন। বিটোফেনের নাইন্থ সিমফোনির রূপকে বায়ু-চাপের কার্ভে-রেখায় ফুটিয়ে তোলার মত বাতুলতা।' সঙ্গীতে যে অনুভূতির অনুরণন তা কাব্যে-গাথায় প্রকাশ পেতে পারে, রঙ-তুলির টানে ভরে উঠতে পারে। মন কেমন করার কথা গণিত জানতে অক্ষম। ভাষা কিছুটা হয়তো পারে; কিছু পারে অন্য শিল্প কর্ম! তবু সব কি জানানো যায়!

—বোর পরিপূরকত্বের কথা বললেন।

ছয়

ব্রহ্মনিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে প্রবজ্যা নেবার কালে নিজের ধনসম্পত্তি তাঁর দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে পত্নী মৈত্রেয়ী জিজ্ঞেস করেন, '..াতে কি অমৃত লাভ হবে ?' ঋষির অন্য পত্নী কাত্যায়নী স্বামীর প্রস্তাবে কি বলেছিলেন, উপনিষদে বলা হয় নি। তবে অমৃতত্ব পাওয়া যায় না বলে ধনসম্পত্তি বা বিত্ত যে তুচ্ছ, একথা তিনি মনে করেন নি। যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। এঁদের নিয়েই তাঁর সংসার। একজন তাঁর বাইরের মনের সঙ্গী, তাঁর গৃহিণী সচিব সখী ; তাঁর ধর্ম-সঙ্গী। অন্যজন মৈত্রেয়ী তাঁর অবশেষ মনের সাথী ; তাঁর মর্মসঙ্গী। দুই মিলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। এখানে বিরোধ নেই। আছে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। এককথায় দুই স্ত্রী মিলিয়ে তাঁর মনের সমাজ। দুই স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। —এই যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞ ; তিনি জ্ঞানী, তার্কিক। ধীরে ধীরে জানার পথের সোপান আরোহণে পারঙ্গম। তবু জনকের সভায় স্বর্ণশৃঙ্গ সহস্র গাভী গ্রহণে বিরূপতা দেখা যায় না। সভ্যতার কাত্যায়নী মূর্তিতে গাভী তাঁর প্রয়োজন। আবার সভ্যতার মৈত্রেয়ী মূর্তি তাঁকে বাচক্নবী গার্গীর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত করে। দুটিই সত্য। দুটি মিলিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। এখানে বিরোধ নয় ; আছে পরিপূরকত্ব। এই যাজ্ঞবল্ক্য আলোচনার কালে গার্গীর 'ব্রহ্মলোক সকল কাহাতে ওতপ্রোত ?'—প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'গার্গী, অতি প্রশ্ন করো না।' সাময়িক বিরতির পর গার্গী আবার প্রশ্ন করেন, 'আকাশ কাহাতে ওতপ্রোত ?' —যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বাধা দেন না। প্রশ্নের যন্ত্রণা গার্গীকে সাহসী করে তোলে—সেই সাহসের মর্যাদা দেন তিনি। তিনি জানান সব কিছু এক বিনাশহীন অক্ষরে ওতপ্রোত। যে অক্ষর 'অদৃষ্ট হলেও দ্রষ্টা, অশ্রুত হলেও শ্রোতা, মননের অবিষয় হলেও মন্তা, অবিজ্ঞাত হয়েও বিজ্ঞেতা !' —যাজ্ঞবল্ক্য ভাষায় যে অক্ষরের বর্ণনা দিলেন, তা কোন নির্দিষ্ট মডেলে জানানো হলো না। ভাষায় বর্ণনা দেবার অক্ষমতা থাকে। তবু গার্গী সুখী হলেন। যা শুনলেন, তা তাঁর মনে এক বিমূর্ত ছবির রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। এই ছবিই তাঁর প্রশ্নের উত্তর।

বোর একই কথা বললেন। তিনি বললেন, কণাজগতে কণাতরঙ্গের যে রূপ, তা যাজ্ঞবল্ক্যের সংসার। কণা ও তরঙ্গ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এই পরিপুরকত্ব বিশ্বের সর্বত্র থাকে, আছে। আছে ফলিত বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মধ্যে। থাকে মানব-প্রকৃতি ও জীব-প্রকৃতির সহাবস্থানে। থাকে বিজ্ঞানের

নানা শাখায়। মানুষের চিন্তার যে নানা ধারা আছে,—শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান— এখানেও কি পরিপূরকত্ব থাকে?—বোর এই প্রশ্ন তুললেন। আর জানালেন, একটি সত্যকে অন্য ভাষায় সর্বাঙ্গীন ভাবে প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্মলোককে খাটো করে আকাশে নামিয়ে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যায়। তবু সেই ব্যাখ্যায় ভাষা অক্ষম হলেও, সে যে ছবি আঁকে, যে সুর তোলে, মন তাতে ভরে ওঠে। মনেই সেই উত্তর জাগে। —কিন্তু প্রশ্ন থাকে চিন্তাজগতে পরিপূরকত্বের চিহ্ন কোথায়?

1930 খ্রীস্টাব্দের 14ই জুলাই অপরাহ্নে আইনস্টাইনের বাসভবন কাপুথে কবি ও বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে। আলোচনায় সত্য, শিব ও সুন্দর বিষয় হয়ে ধরা দেয়। কবির দৃষ্টিতে 'বিশ্বজগৎ যখন মানুষের সঙ্গে একসূত্রে চলে, তখন আমরা তাকে সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব করি।' আইনস্টাইন জানেন, এই বক্তব্য বিশ্ব-জগৎ সম্পর্কে মানবভিত্তিক ধারণাই প্রকাশ করে। তবু রবীন্দ্রনাথ মানুষের অস্তিত্ব ও অস্তিত্বের এই উপলব্ধির উপর জোর দেন। তিনি জানেন, পরমসত্যকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না, জানা যায় উপলব্ধির সাহায্যে। এই উপলব্ধি, এটি একের নয়, বহুর সামগ্রিক উপলব্ধি। বিজ্ঞান সেই সমগ্রের সঙ্গে জড়িত। বিজ্ঞানের সহায়ক ধর্ম। বিজ্ঞান যদি জ্ঞান বা সত্য হয়, তার পরিপূরকত্ব, উপলব্ধিসঞ্জাত ধর্ম অথবা গুণ বা Quality'-র পথে পাওয়া যাবে হার্মনি বা সুন্দরকে! আইনস্টাইনের মতে সত্য মানব নিরপেক্ষ। তবু কবি মনে করেন, মানুষকে বাদ দিয়ে সত্যের কোনো অস্তিত্ব নেই। মানুষই খোঁজে, প্রশ্ন তোলে, উত্তর খোঁজে। খোঁজার পথের হাতিয়ার—সেও মানুষের সৃষ্টি। আইনস্টাইন তবু সংশয়ী। অথচ সৌন্দর্যের কল্পনায় দুজনে একমত—সৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ নয়। দুজনের আলাপে সত্যের মীমাংসা হয় না। সত্য আমাদের সচেতনতা নিরপেক্ষ কিনা তা বোঝা গেল না। রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানে থাকে 'ব্যষ্টিমনের সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাটছাঁট করার শৃঙ্খলা' আর এই ভাবেই আমরা বিশ্বমানবের মনে অধিষ্ঠিত সত্যকে উপলব্ধি করি। আইনস্টাইনের বিশ্বাস, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর ক্ষেত্রে মানব-নিরপেক্ষ বাস্তবতা আরোপ না করলে আমাদের চলে না। তবু এই যে মানব নিরপেক্ষ বাস্তব—এর তাৎপর্য আমরা জানি না। কিন্তু সত্যের অস্তীত্ব স্বীকার করতে হলে মানব নিরপেক্ষ এই বাস্তব আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোনো সত্য আদৌ যদি থেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তার কোনো মূল্য নেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"সত্যের চেতনায় বিশ্বজনীন মানব-মনের সঙ্গে ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ঐ একই

চিরন্তন বিরোধ রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে এদের সমন্বয়সাধনের অবিরাম চেষ্টা চলেছে। যাহোক, মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক বিরহিত কোনো সত্য যদি আদৌ থেকে থাকে, তবে আমাদের কাছে তা অর্থহীন। এমন মনের কল্পনা করা দুরূহ নয়, যেখানে ঘটনার অনুক্রম কোনো জায়গায় ঘটে না ; গানের ক্ষেত্রে সুরের মত সেখানে তা ঘটে সময়ের রাজ্যে। এরূপ মনের ক্ষেত্রে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা, তা সঙ্গীত জগতের বাস্তবেরই সগোত্র। ওখানে পিথাগোরাসের জ্যামিতির কোনো মানে নেই।···কাগজের বাস্তবতার সঙ্গে সাহিত্যের বাস্তবতার অনন্ত পার্থক্য। কেননা, কাগজখেকো পোকার যে ধরনের মন আছে সেখানে সাহিত্যের কোনোই অস্তিত্ব নেই। অথচ মানুষের মনের কাছে কাগজের চেয়ে সাহিত্যের সত্য মূল্য আরো অনেক বেশি। একই ভাবে বলা চলে, মানুষের মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গত বা যুক্তিগত কোনো সংযোগ নেই, এমন সত্য যদি থেকে থাকে, তবে যতদিন আমরা মানুষ আছি, ততদিন আমাদের কাছে তা শূন্য।'

বিজ্ঞানের যে সত্য—তা যদি মানব-নিরপেক্ষ হয়, তবে ভাবাগণিতে তাকে বাঁধা গেলেও, মুখের ভাষায় তার প্রকাশে খামতি থাকে। কারণ মুখের ভাষার বর্ণনায় যে সত্য হাজির হয়, তা সর্বজনীন নয়, মানব নিরপেক্ষ নয় ; মানবভিত্তিক ! সত্য প্রকাশের দুটি ধারায় আছে একটি মিল—যেটি সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য মানব নিরপেক্ষ নয়। এই দিক চিহ্নটি মনে রেখে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয় লিখলেন—যেখানে প্রাধান্য পেল সত্যের চেয়ে সুন্দর! ভূমিকায় বললেন, 'চেষ্টা করছি ভাষার দিকে। বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য পারিভাষিকের প্রয়োজন আছে। কিন্তু পারিভাষিক চর্ব্যজাতের জিনিস। দাঁত ওঠার পরে সেটা পথ্য। সেই কথা মনে রেখে যতদূর পারি পরিভাষা এড়িয়ে সহজ ভাষার দিকে মন দিয়েছি।" আরো বললেন, 'এই বইখানিতে একটি কথা লক্ষ্য করবে—এর নৌকাটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব বেশী কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করি নি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্‌ব্যবহার নয়।'

নিজের জীবনে সাহিত্য সাধনায় রবীন্দ্রনাথ জানতেন সমাজ ও সাহিত্যের যোগাযোগ সাহিত্য বিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। ভাবি সমাজের বিজয় দুন্দুভি বাজানো, কি তার তালে তাল দিয়ে পা ফেলা যদি সকলের কর্তব্য হয়, তবে

সেটা সামাজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়। 'যে বিজ্ঞানী রিলেটিভিটি কি কোয়ন্টাম নিয়ে দিনরাত মেতে আছে, সে কেন কৃষির ফলনে ত্রিগুণের চেষ্টা করে না এ দোষারোপ করিনে।'—তবু বিজ্ঞানের বই লেখার বিচারে প্রশ্ন ওঠে, কাদের জন্য এ লেখা। রবীন্দ্রনাথ জানালেন, যারা এর সদ্ব্যবহার করবে, তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে। কোয়াণ্টার লাফ বলতে তিনি উপমায় জানালেন উচ্চিংড়ের লাফ। এই উপমায় বিজ্ঞানের সত্য ধরা পড়ে না—যেমন ধরা পড়ে না হোয়াইটহেড-এর জানানো ক্যাঙারুর লাফ উপমায়। তবু এখানে থাকে সত্যের আংশিক প্রকাশ; সহজ সুন্দর ভাষায় দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে বুঝিয়ে বলার প্রচেষ্টা।

সাত

গণিত আর মুখের ভাষা দুটিই আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষা! একটি সন্ন্যাসীর মত উদাসীন, নিরাসক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে সম্বন্ধ-সম্পর্ক বিচার করে, মিলগরমিল চুকিয়ে বুকিয়ে পরীক্ষায় পাওয়া তথ্যের পটভূমিতে তত্ত্ব খোঁজে। আরেকটির সাহায্যে বিজ্ঞানীরা তাঁদের উপলব্ধিটির প্রকাশ খোঁজেন, নানা তথ্যের ভিড়ে হঠাৎ পাওয়া আইডিয়াটির বর্ণনা করতে চান; এবং চান গণিতের ভাষায় পাওয়া সহজ-সম্পর্কটি রূপে-রসে-বর্ণে সিঞ্চিত করে মানুষের মনের কাছে নিবেদন করতে। বিজ্ঞানের সাধনা হলো সম্পূর্ণতার সাধনা। সেখানে যেমন থাকে চরিতার্থবোধ, তেমনি থাকে বিস্তৃত হবার আকাঙ্ক্ষা। এই চাওয়া, এই আকাঙ্ক্ষা—এও যে শিল্পীর, কবির প্রার্থনা।

আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের গাণিতিক গঠনের দিকে তাকিয়ে একদিন ডিরাক বললেন, 'প্রকৃতি নিজে সুন্দর, তার নিয়মটিও সুন্দর। সেই সুন্দর নিয়মের ভাষাটিকেও যে সুন্দর হতে হবে।' এই আপেক্ষিকতাবাদকে মুখর করে তোলার সময় জর্জ গেমো বললেন, 'সেই সুন্দর তত্ত্বের ব্যাখ্যার ভাষাটিকেও সুন্দর হতে হবে।' বিজ্ঞানের গঠন বর্ণনায় গেমো তোলেন গণিত ও মুখের ভাষার ছন্দগান। সেই সঙ্গীতের সুরধুনীর প্রবাহ রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় আনলেন—যেখানে সুরধুনীর সুরধ্বনী ধারায় অভিষিক্ত হয়ে প্রকাশ পায় বাক্ ও অর্থের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পার্বতী পরমেশ্বরের অর্ধনারীশ্বর রূপ; যায় দুটি অর্ধই মহিমাময় ও বিশেষ, সুন্দর ও আনন্দ স্বরূপ, আকর্ষণীয় এবং পরিপূর্ণ। সেই পরিপূর্ণতায় বিজ্ঞানের মুখে দেখা দেয় ধূর্জটির মুখে ভেসে আসা পার্বতীর হাসির আভা। সেই হাসিটির

দিকে নির্দেশ করে, বাইরের জগতের মানুষদের ডেকে বিজ্ঞানীরা বলবেন, 'দেখ দেখ, এ যে কত আপনজন। এ তোমাদেরই আত্মীয়।'

—বোরের পরিপূরকত্ব তত্ত্ব সৌন্দর্যের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে।

মুখের ভাষায় বিজ্ঞানের সত্য প্রকাশে পঙ্গুত্ব থাকে। তবু সারা মুখ হাসিতে ভরে তুলে জর্জ গেমো বলবেন, 'তা হোক। মেলোর পাওয়া ভেনাসের মূর্তির হাত ভাঙা, সে তো পঙ্গু! তবু সে কি সুন্দর নয়!' বিজ্ঞান সাহিত্যের বিশেষত্ব এখানেই জানা যায়। এই বিভাগের লেখকের থাকবে স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা; উপভোগের আনন্দ সে ছড়িয়ে দেবে অন্যের কাছে। কারণ আনন্দ হলো রসানুভূতি—সে তো শুধু একার নয়। তাকে অনেকের সঙ্গে মিলিয়ে উপভোগ করতে হবে। এই বিলানো-মিলানোটি সুন্দরের স্পর্শ দিয়ে ভরা। সুন্দর আর আনন্দ—এ দুটিই হলো বিজ্ঞান সাহিত্যের মূল কথা।

বিজ্ঞান সব কিছুকে স্পর্শ করতে চলেছে। তবু মানুষের কাছে বিজ্ঞানকে মনের আপনজন হয়ে ধরা দিতে হবে। সর্বগ্রাসী সর্বপ্লাবী বিজ্ঞানের প্রকাশ সাহিত্যগুণরহিত হলে, সে তো সম্পূর্ণ নয়। সে কুৎসিত। মুখের ভাষায় অনূদিত বিজ্ঞান অরুণের মত সূর্যসারথি হতে পারে: পারে না পক্ষীরাজ হতে, ইন্দ্রজয়ী, বিষ্ণুবাহন হতে। —তবু সে তো সূর্যোদয় জানাতে পারে; সে তো সুন্দর!

আট

নোবেল পুরস্কার পাবার পর মাদাম কুরী জনসমাজের কৌতুহলের শিকার হন। তাঁর একান্ত নিভৃতে বারবার রিপোর্টার হানা দেয়। একদিন সমুদ্রের ধারে নিরালায় পদচারণার পর তিনি জুতো মোজা পোশাক থেকে ধুলো ঝাড়ছেন, পাথরের এক ঢিবির উপর বসা—এক আমেরিকান রিপোর্টার সেখানেও হানা দেয়। একথা সেকথা বলার পর তাঁকে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেন রিপোর্টারটি। মাদামকুরী বলেন, 'আমরা নই, আমরা যা দিয়েছি তাই জানতে চেষ্টা করো।' —মাদামকুরী বিজ্ঞানের ঝুলি ভরিয়ে দিলেন। সেই দান নিয়ে মানুষ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। তবু দান, ঐ সুন্দর দানটি যিনি করলেন, সেই দাতাকে জানার ইচ্ছা থাকে গ্রহীতার। দাতাকে বাদ দিয়ে দানটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কাল কাটানো কি যায়? সূর্যের তাপ-আলো বাদ দিয়ে সূর্যকে নিয়েও যে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধিৎসা! —বিজ্ঞান সাহিত্যের সীমারেখাটি কোথায় টানা হবে?

রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হলো? অসীমের মধ্যে একান্ত আদি ও একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই, আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম ভাঙার মত।' শুরু আর শেষ নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। যত কিছু ঝামেলা মাঝের টুকু নিয়ে। নইলে যে গল্প প্রাচ্যের মহাজ্ঞানী রাজাকে শুনিয়েছিল—মানুষের ইতিহাস, সে তো এক লাইনের গল্প। 'মানুষ এল, বাঁচলো এবং মারা গেল।' মানুষ বাঁচলো বলেই তার অন্বেষণ। তার সমন্বয়ের ধারণা। গণিতের মত সব কিছুকে একাঙ্গী করে একত্রিত করার সাধনা।

বিজ্ঞানসাহিত্য সেই সাধনার ফল। এখানে বিজ্ঞানের প্রমাণের উপরি পাওনা হলো সাহিত্যিক আনন্দ—মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ তো সম্ভব নয়।

সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

দ্বিধায় দেখা

কবি-বিজ্ঞানী সংবাদ

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যের আকাঙ্ক্ষার কথা রবীন্দ্রনাথ বললেন। বললেন, 'বনস্পতি হইয়া উঠিবার একমাত্র প্রার্থনা বীজের শস্যাংশের মধ্যে সংহতভাবে, নিগূঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আছে—কিন্তু যতক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আকাশে মাথা না তুলিয়াছে, ততক্ষণ তাহা না থাকারই তুল্য হইয়া আছে ; সত্যের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের আকাঙ্ক্ষা আমাদের সকল আকাঙ্ক্ষার অন্তর্নিহিত ; কিন্তু ততক্ষণ আমরা তাহাকে জানিই না—যতক্ষণ না সে আমাদের ধূলিস্তর বিদীর্ণ করিয়া মুক্ত আকাশে পাতা মেলিতে পারে।'—এই আকাঙ্ক্ষাতে বিজ্ঞানের সাধনা অন্য মাত্রা জুগিয়ে যে তোলে তা রবীন্দ্রনাথের জানা। মানুষের শতাব্দী সঞ্চিত কুসংস্কার আর অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যখন স্বধর্মে আর পরধর্মে ব্যবধান রচনা করেছিল, তখন বিজ্ঞান 'জ্ঞানের বেড়া' ভাঙতে শুরু করে! বিজ্ঞান জানায়, 'জগতের কোন বস্তুই নিজের বিশেষত্বের ঘোরের মধ্যে একেবারে স্বতন্ত্র' হয়ে নেই। 'কতকগুলি গূঢ় নিয়মের ঐক্যজালে ব্রহ্মাণ্ডের দূরতম অণু-পরমাণুর সঙ্গে আমরা নাড়ির বাঁধনে বাঁধা।' বিশ্বের কোনো একটি কিছুর তত্ত্বকে সত্য করে জানতে গেলে সবকটির সঙ্গে তাকে বাজিয়ে দেখতে হয়। বিজ্ঞান এই উপায়ে সত্যের পরখ করতে লেগেছে। অর্থাৎ সত্যকে সম্পূর্ণ করে জানার পথে বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা, তার ঐক্য সাধনা। অথচ এটি শুধু অভিজ্ঞতার মোড়কে মোড়া জ্ঞান নয়। এটি উপলব্ধিরও। 'কারণ সৃষ্টিতো অণু-পরমাণু নয়—দেশকালের বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে, তাই সৃষ্টি।...আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখছি, তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি, তাই সৃষ্টি।'—এই দ্বৈত প্রকৃতি মানুষের কাছে ধরা দেয়। সে কত স্পষ্ট বা কতটা অস্পষ্ট? রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'জগৎ বলিয়া আমরা যাহা জানিতেছি, সেই জানাটাকে আমাদের দেশে মায়া বলে। বস্তুত তাহার মধ্যে যে একটা মায়ার ভাব আছে তাহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান বলে না, আধুনিক বিজ্ঞানও বলিয়া থাকে। কোনো জিনিস বস্তুত স্থির নাই, তাহার সমস্ত অণু-পরমাণু নিয়ত কম্পমান, অথচ জানিবার বেলায় এবং ব্যবহারকালে আমরা তাহাকে স্থির বলিয়া জানিতেছি। নিবিড়তম বস্তুও জালের মত ছিদ্র বিশিষ্ট; অথচ জানিবার বেলায় তাহাকে আমরা অচ্ছিদ্র বলিয়াই জানি।'—হুইলারের জানানো দেখার জগতে অভিজ্ঞতার ছোঁওয়ার অস্পষ্টতার কথা রবীন্দ্রনাথও জানালেন। মাইক্রোজগতের গুণধর্ম প্রকাশিত হয়

আমাদের অভিজ্ঞতায় গড়া জগতের ক্রিয়ার ছাঁদে। যার সাপেক্ষে সেই গুণধর্মকে মনে হয়—অবাস্তব-অনিশ্চিত, ইলিউসারি-মায়া!—স্বাতন্ত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে ঐক্য!

এই ঐক্য রবীন্দ্রনাথ মানব লোকেও দেখলেন। বললেন, ব্যক্তিগত মানুষ কেমন? না ঠিক যেমন একখণ্ড লোহার বিদ্যুৎচঞ্চল এক একটি অণু। একখণ্ড লোহাকে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানী বললেন, এ হলো কতকগুলো বিশেষ প্রকৃতির বিদ্যুৎমণ্ডলীর চিরচাঞ্চল্য। সেই মণ্ডলীর তড়িৎকণাগুলি পরস্পরের থেকে বহু দূরে দূরে অবস্থিত। সাধারণ দৃষ্টিতে যদি এ জিনিষটি ধরা পড়ত তো দেখতাম, মানব সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন পৃথক, এরাও ঠিক তেমনি পৃথক অবস্থায় আছে। কিন্তু তা তো নয়। এই লোহার অণুগুলোর মধ্যে কাজ করছে একটা সংঘ-শক্তি, ঐক্য-শক্তি। আমরা লোহার সংঘরূপকে দেখছি। মানুষের এই সংঘরূপ হলো একটি গূঢ় আত্মা। এই আত্মার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মানবিক আর জাগতিক সত্তার কথা বললেন। মানবিক সত্তা যেন সূর্যলোক—যার সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের পরিচয়। আর নক্ষত্রলোক যেন জাগতিক সত্তা, আমরা যাকে জানি শুধুমাত্র জ্ঞানে।

এই জ্ঞান নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ঘটে। ধর্মমত পরিবর্তনহীন—এমনি মনোভাব যেমন আছে—তেমনি ভাবা হয় বৈজ্ঞানিক মতও নিত্য! বিজ্ঞানের মূলে নিত্য সত্য আছে, তবু বলা চলে না বৈজ্ঞানিক মত মাত্রেই নিত্য। তা যদি হতো তবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হতো না, মানুষের প্রজ্ঞা যুগে যুগে উন্নত হতো না। এই বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির সঙ্গে আত্মার ধর্মোপলব্ধির মিল আছে। বিজ্ঞানী পৃথিবীর বিচিত্র ঘটনার মধ্যে ঐক্যের যোগসূত্র আবিষ্কার করে আনন্দিত হন। তেমনি, রবীন্দ্রনাথের মতে, আত্মার আনন্দ সর্বব্যাপী আত্মিক ঐক্যকে উপলব্ধি করে। কারণ এককে সকল আত্মার মধ্যে ছড়িয়ে জানলে সত্যকে জানা যায়। এই সত্য প্রকাশ পায় মানব-সমাজের দ্বৈতরূপে—যেখানে একদিকে যেমন রয়েছে ক্ষুদ্রতা—অন্যদিকে কাজ করে মানুষের কল্যাণী শক্তি। এই ক্ষুদ্র আমি আর মহত্তর আমির যে সংঘাত—সেই সংঘাতে ব্যক্তিগত সংস্কারকে দূরে সরিয়ে মানুষ যে জ্ঞান পায় তাই হলো বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান সকল মানবের। রবীন্দ্রনাথ মানবধর্মে বিজ্ঞানের স্থিতি পেলেন। এরই স্থিতিকে আলোচনা করলেন মানুষের ধর্ম নিবন্ধে।

১৯৩০ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে কাপুথে আইনস্টাইনের বাসভবনে কবি ও বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটে। তাদের আলোচনাটি রবীন্দ্রনাথের হিবার্ট বক্তৃতা The Religion of Man (1931) নামের গ্রন্থের পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে।

আলোচনার বিষয়বস্তুর দিকে তাকালে দেখি বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ মানবভিত্তিক ধারণায় বিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস, ঈশ্বর পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন নন; মানুষের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই বিশ্বজগৎ বিধৃত। ফলে, ব্যক্তি মানুষের যোগে মানব-সমাজ গড়ে উঠলেও মানুষের এই পৃথিবীতে চিরন্তন এক ঐক্য শক্তি বিরাজ করে। 'এই বিশ্ব মানুষের বিশ্ব—এ সম্বন্ধে যা কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা তা' বৈজ্ঞানিক মানুষেরই। যুক্তি ও আনন্দের কিছু একটা মান একে সত্যের পর্যায়ে উন্নীত করে। চিরকালীন মানুষের অভিজ্ঞতার মান নির্নীত হয় আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে।' —মানুষের যে অস্তিত্ব—আর সেই অস্তিত্বের যে উপলব্ধি—সেখানে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন। পরমসত্যকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানা যায় না, জানা যায় উপলব্ধির সাহায্যে। তাঁর কথায়, 'চিরন্তন অস্তিত্বকে আমাদের আবেগ আর কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে।'

আইনস্টাইনের মতে সত্য মানব নিরপেক্ষ। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃতি সম্বন্ধে দুটো ভিন্ন মত আছে। প্রথম মতে, ঐক্যবদ্ধ বিশ্ব মানুষের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয় মত জানায় প্রত্যক্ষ জগৎ মানব নিরপেক্ষ।'—রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট বললেন, 'আমাদের বিশ্বজগৎ যখন মানুষের সঙ্গে একসূত্রে চলে, আমরা তাকে সত্য বলে জানি, সুন্দর বলে অনুভব করি।' 'এই বিশ্ব মানুষের বিশ্ব,—এ সম্বন্ধে যা কিছু বৈজ্ঞানিক ধারণা তা বৈজ্ঞানিক মানুষেরই! এবং 'সত্য যার অস্তিত্ব বিশ্বজনীন, তাকে অবশ্যই মনুষ্যোচিত হতে হবে। তা না হলে আমরা ব্যক্তি মানুষ সত্য বলে যা কিছু উপলব্ধি করি তাদের সত্য বলা যায় না। অন্তত যে সত্যকে বিজ্ঞান-সম্মত বলে বর্ণনা করা হয়, তাকে শুধুমাত্র যুক্তির সাহায্যেই বোঝা যায়। অন্যভাবে বললে, তাকে বোঝা যায় মনুষ্যোচিত কতগুলো যুক্তির পরম্পরায়।...যে ধরণের সত্য নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তা আকৃতি বিশিষ্ট। অর্থাৎ মানুষের কাছে যা সত্য বলে মনে হয় এবং এ জন্যেই যা মনুষ্যোচিত। একে বলা যেতে পারে মায়া বা অলীক।'

রবীন্দ্রনাথের সত্য আর বিজ্ঞানের সত্যে বিভিন্নতা বুঝি আছে। বিজ্ঞানের সত্যকে পরীক্ষার জগতে প্রমাণিত করে চেনা যায়। এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানেন; তাই বললেন, 'ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী ব্রহ্ম হলেন পূর্ণসত্য। ব্যক্তি মানুষের মনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এই সত্যকে বোঝা যায় না। একে ভাষায়ও বর্ণনা করা যায় না। ব্যক্তিকে অসীমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই একে উপলব্ধি করা চলে। কিন্তু এমন ধরনের একটা সত্য বিজ্ঞানে থাকতে পারে না।'

রবীন্দ্রনাথের মতে বিজ্ঞানে আমরা ব্যষ্টি মনের সীমিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে কাটছাঁট করার শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এগোই, এইভাবে আমরা বিশ্বমানবের মনে অধিষ্ঠিত সত্যকে উপলব্ধি করি।—রবীন্দ্রনাথ সব মানুষের ঐক্যের কথা ভাবলেন। তা বাস্তব বা অবাস্তব কিনা সে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে না ;—শুধু জানা যায়, The Religion of Man বক্তৃতাটি তিনি ভেবেছিলেন The poet's religion হিসেবে। এটি শুধু মানুষের ধর্ম নয়—কবির ধর্ম। তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি এই মহাবিশ্ব সৃষ্টির অংশ মাত্র। সুতরাং তাঁর নিজস্ব ধর্মটিকে তাঁর মৌলিক ধারণার প্রায়োগিক পরিকল্পনা থেকে আলাদা করা যায় না। এই বিচিত্র মহাবিশ্ব সৃষ্টি আর তার স্রষ্টার মধ্যে যে ঐক্য—সেই একই ঐক্য রয়েছে শিল্প, শিল্পভাবনা আর জীবন-দেবতার সঙ্গতিতে। এই দ্বৈতবোধে জাগে হার্মনি—এই দ্বৈধ জানায় ধর্ম! অন্যদিকে আইনস্টাইনের ধারণা—'আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে জিনিসগুলো ব্যবহার করি তাদের ক্ষেত্রে মানব নিরপেক্ষ বাস্তবতা আরোপ করতে বাধ্য হই। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে যুক্তিযুক্ত উপায়ে গ্রন্থনের জন্য এ রকমটা করে থাকি।' 'মানব জগৎ ছাড়া সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবজাত দৃষ্টি-ভঙ্গীর ব্যাখ্যা-প্রমাণ দেওয়া যায় না। এ হলো এক বিশ্বাস! সত্যের ক্ষেত্রে আমরা অতিমানবিক বাস্তবতা আরোপ করি। এই যে সত্য যা আমাদের অস্তিত্ব অভিজ্ঞতা ও মন নিরপেক্ষ—এর তাৎপর্য না জানলেও এটি আমাদের অপরিহার্য।' বিজ্ঞানের সত্য সর্বজনীন হয়তো বা সর্বকালীন—অন্যদিকে সে নিরপেক্ষ, উদাসীন। ঠিক সেকারণেই এই সত্য খোঁজা ও বোঝার ভাষাটিও নিরপেক্ষ উদাসীন গণিত। এই সত্য মানুষের অভিজ্ঞতার জগতের বাইরেও থাকে, আছে! তার রেশ অভিজ্ঞতার জগতে টেনে এনে তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয়। এই সত্য নিশ্চয় উপলব্ধির ; এবং সম্পূর্ণ সত্য—অভিজ্ঞতা আর উপলব্ধির জগতেরও বাইরে থাকে। সেই সত্য মানুষের কাছে ধরা পড়ে না। এই সীমাটির কথা বিজ্ঞান জানে বলে সীমাটিকে কোথায় টানা হবে সেই খোঁজে তার যাত্রা। সেই যাত্রী নিশ্চয় বিজ্ঞানী মানুষ। তবু সত্য খোঁজার পথে আর্বিটারি সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে হয়। তারা নিজের পরিবেশে অপ্রমাণিত থাকে। তারা সত্যকে প্রকাশ করতে আছে। এইখানে, বিজ্ঞানের এই সাম্রাজ্যে, সত্য আর কল্পনার সীমা রেখাটি স্থূল থেকে সূক্ষ্ম হয়ে দাঁড়ায়। আইনস্টাইন এটি জানেন।

এই সাক্ষাতের জের টেনে ১৩৬২ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন বিশ্বভারতী পত্রিকায় রবিন্দ্রনাথ একটি মন্তব্য লেখেন। তাঁর ধারণায় নিরাবরণ নিরাভরণ অস্তি নিয়ে

বিজ্ঞানের কারবার। এই বিজ্ঞানের সাধক আইনস্টাইন নিঃসঙ্গ মানুষ। "তাঁর জড়বাদকে তূরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান ধারণার সীমান্তচুম্বী সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে বিজ্ঞান আর আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।'—এই সমন্বয়ের বোধটি তাঁদের আলোচনায় ইশারা ইঙ্গিতে হাজির হলেও, এটি নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না!

বিজ্ঞানী আর কবির জীবনজিজ্ঞাসার নিরীক্ষায় সমাধান পাওয়া যায় না। আইনস্টাইন শেষ জীবনে জানলেন, নিয়ম আছে—তবে তার ঘটা পটা নেই। নেই সর্বত্র নির্দেশনা। এই নিয়ম অনিশ্চয়তার পথে পাওয়া, সম্ভাবনার ছকে আঁকা। সর্বত্র আছে বিরোধ, আছে বিকল্পতা—এরই মধ্যে প্রকৃতির ঝাড়াই বাছাই চলে। বড় স্বাধীন সার্বভৌম এই প্রকৃতি। চারদিকে নিয়মের জালের বুনটে বিশ্বসংসার ঢেকে এগিয়ে চলেছে। জালের ঘেরাটপটিকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। বোঝাও কি যায়? বাস্তবের গঠনের মধ্যে যত গভীরে প্রবেশ করা যায়—দেখা যায় যুক্তিবাদী মনের ভগ্নদশা; নির্দেশনার মুক্তি; সহসার হাসির ঝলকানি। মনে হয়, এই বিশ্বলোকের অর্থ খোঁজা দুষ্কর, কেন যে সে আছে তাও বোঝা যায় না। এদিকে ওদিকে, চারদিকে নিয়মের ছড়াছড়ি; তবু সব নিয়ম নিয়ে প্রকৃতি যেন খেলাঘরে খেলতে বসেছে—যে খেলাতেও আইন আছে, নিয়ম আছে—তবে তা খেলারই নিয়ম; মনগড়া, ধরে নেওয়া। প্রকৃতির কাঠামো যেন এই খেলার ছলনার ভিতে দাঁড়িয়ে আছে। একদিন আইনস্টাইন বলেছিলেন, প্রকৃতি বা ঈশ্বর বড়ই সূক্ষ্ম, তবু বিদ্বেষপরায়ণ নন।—তার রসিকতার, হাসির মধ্য দিয়ে তাকে চিনতে হবে। এই হাসি, এই রস রসিকতা কি ছলনার? উদাসীন নিরপেক্ষ হয়ে এই রসের বৈঠকে হাজির হওয়া যায় কি?—এই রোমাঞ্চনার দোলা নব বিজ্ঞানে; আবার সংশয়ও সেখানে। রোমাঞ্চিত হলে সঠিক কি জানা যায়? জানতে যে হবে উদাসীন নিরপেক্ষতায়। অথচ—

রবীন্দ্রনাথও এই খেলা দেখলেন তাঁর নিজের দেখার জগতে। তাঁর জীবনদেবতা বড় উদাসীন। শেষ বয়সে দেখেন প্রকৃতিও উদাসীন। এত সুন্দর, এত মধুর,—তবু কত অ-মানবিক! আর এই বিশ্বের খেলা—জীবনের তুচ্ছতা, অর্থহীনতা—যেন প্রকৃতির যাত্রাপথে ঈশ্বরের স্পর্শ সর্বত্র নেই। বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিতে ঈশ্বর কি আছেন? আছেন কি তাঁর শিবত্ব, সুন্দরতা ও সংঘবোধ নিয়ে? ঐক্যের স্বপ্ন কি

উপন্যাস মাত্র? 'বুদ্ধি অন্যমনা / করে সেই শিল্পের রচনা / সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল / বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল। /'—অসংলগ্ন স্খলিত শৃঙ্খলারবোধে গড়ে ওঠা অন্য এক সৃষ্টি। যা প্রচলিত শর্তের বিপরীত; তবু শিল্পকর্ম। কঠিন শর্তে গড়া শিল্পসৃষ্টির বিপরীতেও শিল্পশর্ত থাকে। কঠিন সত্যের বিপরীতেও থাকে এক সত্য। এইতো বিরোধ! তিনিও বললেন, তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি / বিচিত্র ছলনা জালে / হে ছলনাময়ী / । সৃষ্টির পথে ছলনার ভিত্তিভূমি বুঝি থাকে!

1926 সালে দুজনের প্রথম সাক্ষাতের সময় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কার্য-কারণবাদকে ঘিরে। তাঁরা জানতেন সৃষ্টির মূল উপাদানগুলির মধ্যে নেই কার্যকারণতত্ত্ব। যা কিছু আছে তার আবির্ভাব অথবা তিরোভাব পুরোপুরি পূর্ব নির্ধারিত নয়। অস্তিত্বের গভীরতম তলে এক দ্বৈত আছে—একদিকে অসংযত আবেগ, অন্যদিকে সেই আবেগকে পরিচালনা করে সমস্ত জিনিসের মধ্যে একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে যে ইচ্ছাশক্তি—এই দুইয়ের বিরোধ। যা আপাতদৃষ্টিতে বিরোধ। তবু সব মিলেজুলে তৈরি করে একটি প্যাটার্নে দেখা দেয় সুসঙ্গতি, সমগ্রতা। আকস্মিকতা আর পূর্ব বিধান—এই দুইয়ের চিরন্তন সঙ্গতির মধ্য দিয়ে প্রকৃতির লীলাখেলা ঘটে চলেছে।

সর্বত্র কার্যকারণতত্ত্ব ধরা যায় না। সর্বত্র বুঝি নেই পূর্ব বিধান—নির্দেশনা। থাকে আকস্মিকতা; ধরা দেয় স্বৈরাচারীতা। তবু সবকিছুকে শাসন করতে কোথাও সুনিয়ন্ত্রিত বিধি থাকে। এই বিধিটি, রীতিটি বিরোধকে মেনে নিয়ে গড়ে ওঠে। এই বিরোধ নিয়েই প্রকৃতি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টাইনের সাক্ষাৎ ঘটে চারবার। কাপুথে দেখা হবার পর রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ায় যান—তাঁর সঙ্গীদের একজন মার্গট আইনস্টাইন —যিনি আইনস্টাইনের সৎকন্যা—যাকে পরে বিজ্ঞানী! দত্তক নিয়েছিলেন। রাশিয়া থেকে বার্লিনে ফিরে এলে মেণ্ডেলের (Mendel) বাড়িতে আইনস্টাইন কবির সঙ্গে দেখা করেন 1930 সালের সেপ্টেম্বরে। সেই বছরের ডিসেম্বর মাসে কবি নিউইয়র্কে এলে ক্যালটেকের ভিজিটিং প্রফেসার আইনস্টাইন কবির সঙ্গে দেখা করেন। এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের কথা জানা যায় ডঃ বশী সেনের স্ত্রী শ্রীমতী গার্ট উড এমার্সনের লেখা প্রবন্ধ থেকে—যা The Golden Book of Tagore এ প্রকাশিত হয়। চারবার সাক্ষাৎ হয়; তবে—

দুজনের তৃতীয়বার আলোচনা হয়নি। যদি হতো, তবে দুটি মহৎ আদর্শে বিশ্বাসী

মানুষ জীবনের শেষ পর্যায়ে বিশ্বাসকে বিক্ষত হতে দেখে, বিরোধের সর্বগ্রাসী আবির্ভাবে কি আলোচনা করতেন, জানতে ইচ্ছা করে।

হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমাদের পরমসত্য ব্রহ্ম—সেও বিরোধে ভরা। তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। এ সক্রীয়, আবার এ নিষ্ক্রিয়। এ আছে দূরে, আছে কাছে। সবার মধ্যে এ আছে আবার সবার বাইরেও তো এ।

শুনে আইনস্টাইন বলতেন, এইতো বিজ্ঞান! দূর আর নিকটের ক্রিড়াভূমিতে যার বিচরণ, যে চলেছে গতির জগতে, আবার যাকে খুঁজি গতিহীন পটে; সব বস্তুর অন্তরে সে আছে --আছে সবকিছু যে পরিব্যপ্ত করে সেই দেশকালে। সর্বপ্লাবী, সর্বগ্রাসী এই বিজ্ঞান।···

···আর তার সত্য! তা মানুষের জন্য। কারণ সে সত্য খোঁজে মানুষ!

শুনে রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন, জানতাম, এই সত্য মানুষের।

হেসে আইনস্টাইন হয়তো বলতেন—তবু!

রবীন্দ্রনাথও হয়তো হাসতেন; বলতেন, এই বিশ্ব আর এই জীবন যেন এক তৃষ্ণা, এক পিপাসার রঙ্গভূমি। এখানে সব কিছু চলেছে একটি দ্বৈতের দ্বন্দ্বের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে। সমস্ত গুণ-লক্ষণ নিয়ে তীব্র স্রোতের মত জটিল-কুটিল মিশ্র গতি নিয়ে চলেছে। নিঃসংশয়ে বলতে পারিনে কী ভাল, আর কী মন্দ; কী সত্য আর কী মিথ্যা। বলতে পারলেও একটা থেকে একটা যেন পৃথক করা যায় না। বড় হেঁয়ালি ভরা। স্থান কাল নিরপেক্ষ কোনো অবিসংবাদী তত্ত্ব দিয়ে এই জটিল জট ছাড়ানো যায় না—না জীবনে, না বিশ্বলোকে। জীবনের ধর্ম বা বিশ্বলোকের বিজ্ঞান—তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ, লোকসিদ্ধি সবই যেন আপেক্ষিক; দেশকাল পাত্রভেদে এখানে প্রভেদ দেখা দেয়।

আইনস্টাইন বলতেন, ঠিক। যতবড় সত্যই হোক, আসলে অনেক কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে তা আপেক্ষিক। প্রাসঙ্গিক সেইসব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে সত্য আর সত্য থাকে না। এই জীবন, এই জগৎ জটিল মিশ্র উপাদানে গড়া। তবু বাইরে যাকে দেখি জটিল, অন্তরে সে হয়তো স্বচ্ছ, ঋজু! সেই সরলতাই খুঁজে বেড়ায় বিজ্ঞান।

রবীন্দ্রনাথ আবার হাসতেন; বলতেন—এ বিশ্বাস আমারও ছিল; তাই বলতে পেরেছিলাম, "বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু"। বলেছিলাম, 'সত্যেরে সে পায় / আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।' মনে আছে কাপুথে বিজ্ঞান

আর ধর্ম নিয়ে কথা বলেছিলাম? বলেছিলাম, বিজ্ঞানের সহায়ক যেন ধর্ম। বলেছিলাম, আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরম মানুষের ব্যক্তিগত সীমানা যে নির্ধারিত হয় না, তা আমরা উপলব্ধি করি। বিজ্ঞান এমন কিছু নিয়ে আছে যা ব্যষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এ হলো নৈর্ব্যক্তিক মানুষোচিত সত্যের জগৎ। ধর্ম এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে, পারে আমাদের ব্যক্তিগত সচেতনতা বিশ্বজনীন গুরুত্ব লাভ করে! সত্যের ক্ষেত্রে ধর্ম মূল্য আরোপ করে আর আমাদের সম্পত্তির মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে আমরা চিনি, জানি।

আইনস্টাইন আবার বলতেন, এ সত্য মানুষের সত্য। তবু কাকে বলব ধর্ম?

হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলতেন, আমাদের শাস্ত্রে বলে লোকস্থিতিকে যা ধারণ করে তাই ধর্ম। আবার যা থেকে সব সম্পদের প্রাপ্তি, তাও ধর্ম। লোকস্থিতি যেমন, তেমনি ঐহিক আধ্যাত্মিক সব সম্পদই ধর্ম। ইহলোকে স্থিতির অনুকূলে যে আচরণ তাই ধর্ম। আবার ধর্ম হলো গুণ বা Virtue; আবার এটিই শিব বা Quality; আর আমার ধর্ম হলো, পরমপুরুষের বিশ্বজনীন মানবসত্তাকে নিজের সত্তার সঙ্গে সংযোগ বিধান করা।

একটু নীরব থেকে হয় তো বা আইনস্টাইন বলতেন, আমরাও ভাবি সব লোকস্থিতিকে ধারণ করে থাকে বিজ্ঞান, যা উপলব্ধিকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে না। আমাদের বোধিমননকে অমোঘ তেজে ধরেছে, তবু তাকে সম্পূর্ণ করে ধরতে কি পেরেছে? এ যেন জীবনের এক Orthogenesis—যেখানে ইভোলিউশনের ধারা যেন নির্ধারিত পথে চলে; তবু সন্দেহ থাকে আকস্মিকতায়। সন্দেহ অনিশ্চয়তায়!

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, তবু মানুষ এগিয়ে চলে। এক আলোক স্তম্ভের মত ঊর্ধ্ব সোপান ধরে মানুষ উঠে চলেছে; ঊর্ধ্ব থেকে আরো ঊর্ধ্বতর ক্ষেত্রে যতই সে আরোহণ করে, ততই দেখে তার সামনে প্রকাশিত হতে রয়েছে বহুতর করণীয় কর্ম…

উদ্বং শমিব যেমিরে। যৎসানো সানুমারুহদ্ভূর্যস্পষ্ট কর্ত্বং…

আর সামনে, অনেক দূরে আছে স্থানহীন কালহীন পরিণাম—যেখানে আজও নেই, কালও নেই—যেখানে আজও যা কালও তা। ন নূনমস্তি নো শ্বঃ। স এবাদ্য স উশ্বঃ।

আইনস্টাইন বলতেন, আমার তত্ত্বে সেই বিন্দুকে পাই—যেখানে কালস্রোত স্তব্ধ। যেখানে সব কিছু শুধু এখন, এক চিরন্তন নাউ। পাই সেই সিঙ্গুলারিটির জগৎকে—এক মৌন অটল স্থিতিকে।

রবীন্দ্রনাথ হয়তো বলতেন, 'আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী—কো বেদঃ অর্থাৎ কে জানে ; যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন ; কিংবা জানেন না। সন্দেহ হয়, যার সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে হয়তো জানেন না। সৃষ্টি তাকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

শুনে আইনস্টাইন বলতেন, 'আমাদের আজকের বিজ্ঞান বলে সৃষ্টির পর নিয়ম নিয়ে বিশ্বলোকের যাত্রা। এখানে সৃষ্টির কারণ খুঁজে পাই না। সৃষ্টিমুহূর্ত বা বিন্দুকে ধরা যায় না। এই জগতে দাঁড়িয়ে চরম বা পরমকে মানুষ চিনতে পারে না। আমরাও যেন বলি, কো বেদঃ। কে জানে। তবু জানার আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে তো পারিনে।'

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, পথ যে একটাই। এপার ওপার দূর নিকট উভয় লোকের ভিতর দিয়ে চলে গেছে—তদ্ যদা মহাপথ আতত উভৌ-গ্রামৌ···আমরা একই পথের পথিক—শুধু দেখার চোখ বুঝি আলাদা! চলার ভঙ্গীতে বুঝি আলাদা!

আইনস্টাইন বলতেন, মনে হয় কোনো তত্ত্ব স্থায়ী হবে না। আমি ঠিক রাস্তায় চলেছি কিনা জানি না—সেখানেও আমার সংশয়। আমি সঠিক হতে চাইনি, শুধু জানতে চেয়েছি যে আমি সঠিক পথের যাত্রী।

রবীন্দ্রনাথ আবার বলতেন, পথ একটাই। ত্রুটি শুধু ঘটে দেখায় বা চলায়! নিঃশ্বাস ফেলে আইনস্টাইন বলতেন, এই মহাবিশ্ব—মানব সম্পর্ক স্বাধীন এক বিরাট প্রহেলিকার মত। আর সবচেয়ে অবোধ্য বিষয় হলো যে, এই জগৎ বোঝার আর জানার। এই জগৎকে বুঝতে চেয়ে জানতে চেয়েই মানুষ কত বিরাট, কত মহান।

মৃদু হেসে রবীন্দ্রনাথ বলতেন, অপ্রমেয়, অফুরন্ত এই অজানা। তাকে খুঁজতে চেয়ে, জানতে চেয়ে মানুষ এত সুন্দর!

দুজনে দুজনের চোখে চোখ রেখে হেসে উঠতেন।

বলতেন, সত্যি!···

বলতেন, এ বড় বিস্ময়ের!···

———